P 36,145

বিষয়।	লেখক।	
সচেতন ও অচেতন আত্মা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জাপানী সভ্যতা	শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
সার লেপেল্ গ্রিফিন্	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
সম্মোহনতত্ত্ব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ভাষা শিখিবার হদিশ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
দন্ত-রক্ষা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
কিরূপে গল্প তৈরি হয়	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বাল্যবিবাহ	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
মধ্য আসিয়ায় রুষ	শ্রীনীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০১, ২	
টিং ছট্	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	

গুলি আসিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সা[illegible] ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য্য [illegible] হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যগণও [illegible] অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাচলের কাছেও দুই এক[illegible] জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হৌক তাহাকে যুক্তি বলি[illegible] করা যায় না। আজকাল ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্ম্মানিতে পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন য়ুরোপই আর্য্যদের বাসস্থান, কেবল একদল কোন বিশেষ কারণে এসিয়ায় পড়িয়াছিল।

ইহাঁদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে বেশ মনে হইতেছে আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন [illegible] সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং [illegible] ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবে।

আর্য্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ল্যাথাম্ সাহেব প্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্য্যজাতির বাসস্থান যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয় য়ুরোপেই মোট জ[illegible] উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন্ ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইট্‌নি সাহেব বলেন—আর্য্য[illegible] আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস [illegible] ভাষা আলোচনা দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার

উৎপন্ন হইয়াছে সে ধাতু য়ুরোপীয় কোন ভাষায় নাই। পক্ষে গ্রীক্‌গণ সিংহের নাম হিব্রু ভাষা হইতে ধার করিয়া ছেন (গ্রীক লিস্, হিব্রু লাইশ্)। অতএব এ কথা বলা পারে যে আর্য্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরি নাই। সম্ভবতঃ গ্রীক্ লিস্ ও লিওন্ শব্দের ন্যায় সংস্কৃ শব্দও তৎকালীন কোন অনার্য্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। পশুরাজের গর্জ্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভ যাহাই হৌক্ এসিয়াই যদি আর্য্যদিগের আদিম নিবা তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্য্য ভাষাতেও পাওয়া উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এদিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মানবেরা একটি বিশেষ জাতীয় এবং এই জাতীয় মানব পেই দেখা যায়, এসিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্ত্তমান দ্বারা জানা যায় যে আদিম আর্য্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং আর্য্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই জাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা

লিণ্ডেন্‌শ্মিট্ বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে সমস্ত জা আর্য্য নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও রিক পরিণতি অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ বু দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন দুর্দ্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা আর্য্যজাতির প্রবলতম, প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে ও এসিয়া আর্য্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক-

বাড়ে ততই ভাল। এই এক আর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও য়িহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি ভ্রাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে ত সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন "ধর্থন আমার সেই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে সুদ্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না।" আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরাজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা ত আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয় গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্য্যমাতার প্রথমজাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

একরাত্রি।

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন "আহা, দুটিতে বেশ মানায়!" ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন

নির্ভর চের বেশি, সুতরাং পূর্ব্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার নিকট বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে, আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোন ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইঁচড়েপাকা কলিকাতার মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টোঁটো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ফিরিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। নহিলে ছেলেরা এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙ্গাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সাউথ সাবারিবান্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনের

না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লক্ষ্ণে ঝঞ্ঝে থাকে না।

ব আশ্চর্য্য একজন কবিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘরে বিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সে ছিল। স্কুলের বড় আটচালার সংলগ্ন একটি চালা বিতাম। স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে ক্ষেরিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল ার গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই দুই প্রকাণ্ড গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

থা এতদিন উল্লেখ করি নাই, এবং এতদি উল্লেখ যোগ্য মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকীল যের বাসা আমাদের স্কুল ঘরের অনতিদূরে। এবং যে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল জানা ছিল।

ভন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার কালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচন ভন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা, কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত ছিল আমার ভাল করিয়া মনে উদয় হইত না।

ছুটির দিনে রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত তে গিয়াছি। মনে নাই কি বিষয়ে আলোচনা হই- ধ করি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, । এমন যে, তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘটা-

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কি না হইতে পারিত আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, আ জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, সে আজ দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে ক কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ! আর, এ রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কে গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সক নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি ন সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। অ আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আ মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচ সঙ্গত! রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায়—তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুর বেলায় ক্লাশে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত— কি ইচ্ছা করিত জানি না এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ভারতবর্ষে এই সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশো করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকি

মাষ্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগো করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন সকালের দি মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত র হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে লিল। প্র পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিতেছিল ক্রমে উত্তর এবং উত্তর দিয়া বহিতে লাগিল। এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃ- মনে পড়িল এই দুর্য্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। অ দের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কত মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি রিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শে গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বা হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমা পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটু হইল। পাড়ের উপরে যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বি আর একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকু পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হ আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার ন অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। ে সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ না

আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ ছয় ব্যা উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন প্র

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদা
গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙ্গা স্কুলের সে
আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য
রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দি
সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের
সার্থকতা।

পাখী-ছাড়া।

(খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ? খো
পথে আসিলে খোকাকে ছাড়িয়া দিও। অব
ঝাঁপাইয়া জননীর উৎসঙ্গে আরোহণ করিবেন।
ও সোয়াস্তি নাই" ইত্যাদি বাক্যে যখন সুন্দরী
হইবে তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি

১

তুমি কি গো হর, সখি, আমি কি অনঙ্গ?
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পিঞ্জর খুলিয়া দিনু,
শিকলি কাটিয়া দিনু,
বনেতে উড়িয়া গেল বনের বিহঙ্গ—
সুন্দরি, শ্রী-অঙ্গে কেন ভ্রূকুটির ভঙ্গ?
পুষ্পিত-হরিত-পাতা
কোমল শ্যামল লতা
পুনঃ পেয়ে, বন-পাখী করে কত রঙ্গ!

কোনো শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, "কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে!" বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে! বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর, অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে, কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিস ঘণ্টা সংসার-কার্য্যে চব্বিস আনা লিপ্ত থাকিলে, যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরাণিগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে-দল বি-এ এম্-এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে পতায়াত করিতে থাকে! ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারের কোনো কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য-অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে; তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না; বৈরাগ্যের অভ্যুদয়ে মন প্রশান্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যে হাত পা আপনা হইতেই অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; আর, যে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য-সাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, সে বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নহে—তাহা বৈরাগ্যের ভান মাত্র। তবে যদি তোমার বন্ধনের

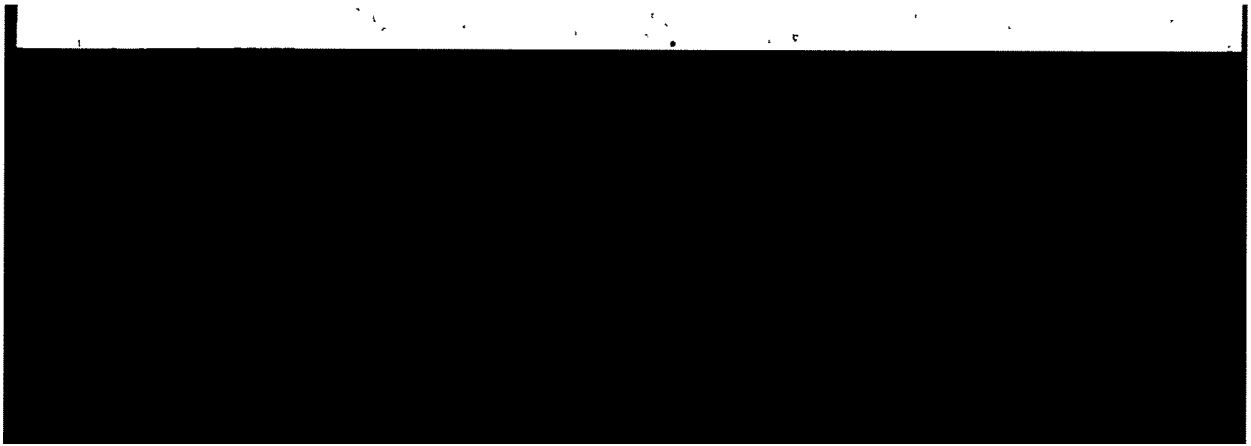

হতভাগ্য দেশের নিদ্রা ভাঙিয়াও ভাঙিতেছে না! আমাদের দেশের চক্ষে বিজ্ঞানের আলোক পতিত হইয়া একবার যেই তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে—পরক্ষণেই আমাদের দেশ যেমন-কে-তেমনি শয্যায় অচেতন। কথাটি আর কিছু না—যেখানেই অন্ধ-ভক্তি অতিমাত্র প্রবল এবং জ্ঞানালোক অতিমাত্র ক্ষীণ, সেই-খানেই পেঁচা বাদুড় সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি তামসিক জন্তুদিগের পরা-ক্রম দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সার ওয়াল্টর স্কটের আইভান্‌হো উপন্যাসের Friar Tuck একজন পেচক শ্রেণীর বৈরাগী ছিলেন—দিবালোকে তিনি কোটরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। আমাদের দেশে পানিহাটি গ্রামে আজিও গঙ্গা-তীরে বটচ্ছায়া-পরিবৃত অতীব একটি রমণীয় কোটর দেখিতে পাওয়া যায়—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাহা কাঙ্গালদাস বাবাজির আকড়া বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; গ্রাম-বৃদ্ধদিগের মুখে কাঙ্গালদাস বাবাজির কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে, পেচক শ্রেণীর বৈরাগীদিগের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন, সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গেল পেচক তপস্বী; বাদুড় তপস্বী কি? না মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে-ঝোলা যোগী তপস্বী। সাপ-ব্যাঙ তপস্বী কি? না মাটির নীচে কবর দেওয়া সিদ্ধপুরুষ। এখনকার বাজারে এই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অনটন দেখিয়া নব্য-মণ্ডলের কথকেরা কত না ললাটে করাঘাত করেন, কত না হাহুতাশ করিয়া ক্রন্দন করেন! ইহাঁদের এই ক্রন্দন কোলাহলের মাঝখানে কে যেন আমাদের কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে বলিতেছে যে, যেখানে দেখিবে—চিড়িয়াখানার যোগী তপস্বীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজ্য

ব্যবসায়ের প্রতি লোকের ধিক্কার জন্মিতেছে সেইখানেই জানিবে জ্ঞানের দিবাকর অস্তমিত এবং অবিদ্যার ঘোরা তামসী বিভাবরী সমাগত।

পেঁচা বাদুড়, সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তু-তপস্বীদিগকে আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া প্রকৃত মানুষ-তপস্বী কিরূপ তাহার প্রতি একবার চক্ষুরুন্মীলন কর;—আফ্রিকা দেশের অন্তর্বিভাগের আবিষ্কর্ত্তাদিগের যাহার কাহারো অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ কর—দেখিতে পাইবে যে, মনুষ্য ভোগ-স্পৃহাকে কতদূর পশ্চাতে রাখিয়া, সম্মুখের বিভীষিকাকে কতদূর তুচ্ছ করিয়া, সংকল্প সাধনের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে। ইহাঁদের এক একজনের এক এক কার্য্য দেখিলে মনে হয় যে, মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্যই নাই, মনুষ্যের অগম্য স্থানই নাই। ইহাঁদের তপঃসাধনের প্রণালীই স্বতন্ত্র! সম্মুখে বিপদ্ বলিয়া বিপদ নহে—বিপদের পর্ব্বত-পরম্পরা উপর্য্যুপরি মাথা তুলিয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সমস্ত প্রদেশই অজ্ঞাত অপরিচিত; সকলই প্রহেলিকা—সকলই গোলোক-ধাঁদা; উপস্থিত মতে বুদ্ধি খাটাইয়া এক এক পদ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, আর, চারিদিকের কোথায় কি আছে না আছে তাহার সন্ধান লওয়া হইতেছে; সঙ্গে লোক একে তো পঞ্চাশের অধিক নহে, তাহাতে আবার তাহারা সকলেই কাফ্রী; ব্যথার ব্যথী কেবল একজন মাত্র স্বদেশীয় ভ্রাতা—তিনি পীড়ায় মরণাপন্ন; তাঁহার সেবার ত্রুটি না হয় এটা খুব সতর্কতার সহিত ঘড়ি ঘড়ি দেখিতে হইতেছে; মরুভূমির মধ্যে দুই তিন দিন জলাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের মধ্যে তিন চারিদিন অন্নাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত; মাথার উপরে প্রচণ্ড দিবাকর এবং বায় যেন কালের নিশ্বাসাগ্নি। তাহাতে আবার

ঘটনাক্রমে বোল্‌তার চাকে ঘা দেওয়া হইয়াছে—একজন দেশীয় রাজাকে নজর দিয়া তুষ্ট করা হয় নাই; সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য চারিদিকে সহস্রাধিক শত্রু ঘাটি মারিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সকল ভয়ঙ্কর বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য-স্থলে আবিষ্কর্ত্তা এক দিনের জন্যও ভগ্নোদ্যম হ'ন নাই; ক্ষণকালের জন্যও তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন নাই—বিছানায় শুইয়া পড়েন নাই; ক্রমাগতই তিনি সাহসে ভর করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যখন যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য তিনি প্রস্তুত! সুবিশাল মরুভূমি পার হইতে হইবে তাহারই জন্য প্রস্তুত! দুস্তর নদীতে নৌ-সেতু বাঁধিয়া ওপারে যাইবার পথ খুলিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! প্রাণ হস্তে করিয়া শত্রুদলের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত! ইহা কি তপস্যা নহে! পৃথিবীর মেরুপ্রান্তের আবিশ্চিকীর্ষু মহাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়ী। এক দিন নয়—দুই দিন নয়—ছয় ছয় মাস ধরিয়া, কখনো বা বৎসরেক ধরিয়া, প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহারা শব-সাধনের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত! এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসর! কখন্ কোথা হইতে এবং কতদিক্ হইতে বরফের চাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে পিশিয়া ফেলিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই; কিয়ৎপরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাপ চৌদিক্ ঘিরিয়া জাহাজকে আটক করিয়া ফেলিয়াছে—আর জাহাজ-শুদ্ধ সমস্ত লোক কুঠার হস্তে করিয়া কেবলি বরফ কাটিতেছে—কেবলি বরফ কাটিতেছে! বরফ কাটিয়া বরফ কাটিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতেছে; পশ্চাতের পথ নহে—সম্মুখের পথ! এইরূপে দিন যাইতেছে রাত্রি যাইতেছে, শুভ-

পক্ষ যাইতেছে কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে—চক্ষে নিদ্রা নাই—হস্তপদে বিরাম নাই; শীত এমনি যে, তাহার প্রবল পরাক্রমে কাহারো কাহারো অঙ্গুলি খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! এ কি তপস্যা নহে! তপস্যা শুধু কি মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে ঝোলা আর পাতা ভক্ষণ করা! আফ্রিকার অন্তর্ভাগের জর্ম্মান আবিষ্কর্ত্তা যাঁহার কথা আমি একটু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তিনি তাঁহার দৈনিক পুস্তকে এক স্থানে এটাও লিখিয়াছেন যে, "এত শত বিঘ্ন বিপত্তির মাঝখানে আমি ভগোদ্যম হইতেছি না কেবল এই ভরসায় যে, সিদ্ধিদাতা বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি—এ কার্য্যে আমার জয়-লাভ হইবেই হইবে।" সমস্ত পথে ঈশ্বরের হস্ত ইঁহার নেতা—ঈশ্বরের মুখ-জ্যোতি ইঁহার ধ্রুবতারা—ইনি কি তপস্বী নহেন!

এই সকল মানুষ-তপস্বীদিগের অনুরাগ রাখিবার স্থান সর্ব্বোপরি ঈশ্বর এবং তাহার নীচেই স্বদেশ। ইহাঁরা স্বদেশের মুখ চাহিয়া ভীষণ তরঙ্গ-সংকুল দুস্তর মহাসাগর ভেলায় পার হ'ন; দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে মনুষ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন; দেশের নামের দিগ্বিজয়ী মন্ত্রে ইহাঁদের দুই বাহু সহস্র বাহু হইয়া উঠে; দেশের নামে ইহাঁদের আক্রমণ-বেগ বিদ্যুৎকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই নামের সিংহনাদে ইহাঁদের প্রচণ্ড প্রতাপ উদ্যত বজ্রকে ভস্ম করিয়া ফেলে!

প্রতীচ্য প্রদেশে ঈশ্বরানুরাগের এক ধাপ নীচেই স্বদেশানুরাগ পূজ্য; তার সাক্ষী—মহাকবি শেক্সপীয়র তাঁহার অষ্টম হেনরি নাম নাটকে কার্ডিনাল উল্‌সীকে দিয়া বলাইয়াছেন—"Be just and fear not. Let all the ends thou aimest

at be thy country's, thy God's and truth's; স্থায় পথে থাক, ভয় করিও না; তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয় তোমার স্বদেশ তোমার ঈশ্বর এবং সত্য। কার্ডিনাল উল্‌সী যদি আমাদের দেশে জন্ম-গ্রহণ করিতেন তবে খুব সম্ভব যে, ঐ স্থায়গাটিতে তাঁহার মুখে দেশ-শব্দের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শব্দ বাহির হইত; তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয়—তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভগবান্ এবং সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ এখানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম তত নয় যত জাতীয় ধর্ম্ম অথবা যাহা একই কথা কুলধর্ম্ম; যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশ্যের ধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য। জাতি-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, গৃহভেদ, এইরূপ ভেদ-বাহুল্য আমাদের দেশের এমনি একটা অস্থিমজ্জাগত রোগ যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছে; তাহা এইরূপ যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন তাহা বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি। যেমন, শমদমাদি-সাধন মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞানীর ধর্ম্ম; যমনিয়মাদি সাধন যোগীর ধর্ম্ম; যেন এ দুই প্রকার সাধনাঙ্গের কোনোটিই সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম নহে! কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে—কি শমদমাদি সাধন, কি যম-নিয়মাদি সাধন, দুইই, বস্তু যা—তা এক বই দুই নহে;—কি? না সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। এরূপ যখন—তখন তাহা সর্ব্বসাধারণের সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত; তাহা না হইয়া, মনুষ্য মাত্রেরই অনুষ্ঠেয় সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আমা-

দের দেশে যোগী তপস্বীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তা বই, জন-সাধারণের ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে; যেমন, ব্রাহ্মণ জাতির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়জাতির ক্ষাত্র ধর্ম্ম, বৈশ্যজাতির বাণিজ্য ধর্ম্ম, শূদ্রজাতির দাস্য ধর্ম্ম ইত্যাদি। আমাদের দেশে জাতি এবং ধর্ম্ম দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, জাতি-রক্ষার নামই ধর্ম্মরক্ষা এবং ধর্ম্মরক্ষার নামই জাতি-রক্ষা। ইহার কারণ আর কিছু না—ইউরোপাদি প্রতীচ্য ভূমি-খণ্ডে মনুষ্যের প্রধান একটি গৌরব স্থল যেমন—স্বদেশ, আমাদের দেশে তেমনি—স্বজাতি। ইংরাজের মুখে "আমি ইংরাজ" এটা যেমন একটা জোরালো কথা, ক্ষত্রিয়ের মুখে "আমি ক্ষত্রিয়সন্তান" এটাও তেমনি একটা জোরালো কথা বটে—কিন্তু আর এক হিসাবে। "আমি ইংরাজ" এটা দেশীয় গৌরবের উচ্ছ্বাসবাণী; "আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান" এটা জাতীয় গৌরবের অথবা বংশগৌরবের উচ্ছ্বাস-বাণী। ইউরোপীয়েরা যেমন দেশ রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি জাতি-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তাহার সাক্ষী—এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার রাজ-বিদ্রোহ দেশ-রক্ষার সংকল্প হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল—সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ জাতি-রক্ষার সংকল্প হইতে, টোটা-কাটার বিভীষিকা হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ বলিয়া নয়—মান্ধাতার আমল হইতে চিরকালই আমাদের দেশে দেশীয় মর্য্যাদা জাতীয় মর্য্যাদার নিকটে নতশির। আমাদের দেশে স্বজাতি বিজাতির মধ্যে যেমন কড়াকড় প্রভেদের সীমা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—স্বদেশ বিদেশের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও নাই;—এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মনকে এই বলিয়া

প্রবোধ দিতেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ দেশই নহে; তাহার সাক্ষী—কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য-স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ" হিমালয় পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যেন পৃথিবী মাপিতেছে—অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত পৃথিবী জুড়িয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহারা যে, আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না; আমি কেবল বলিতেছি যে, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ ছিল—যেন ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবী—আর কোন দেশ দেশই নহে। আর আর দেশকে তাঁহারা যদি বিদেশ বলিয়াও গণ্য করিতেন তাহা হইলে সেই বিদেশের প্রতিযোগে ভারতবর্ষ তাঁহাদের স্বদেশ পদবীতে উত্থান করিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আর আর দেশকে একেবারেই ন-স্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকটে সমগ্র পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইল—স্বদেশ আর হইতে পারিল না। এই কারণ গতিকে—ভারতবর্ষীয় সমস্ত খণ্ড জড়াইয়া একটি ব্যাপক স্বদেশীয় ভাব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে জন্মিবারই অবকাশ পাইল না।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে স্বদেশের গাত্রে অপমানের একটু আঁচ লাগিলে দেশের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত সমস্ত নগর গ্রাম পল্লী অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে; ভারতবর্ষে বাঙ্গালির দুর্দ্দশা দেখিয়া খোট্টা হাসে—খোট্টার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালি হাসে; হিন্দুর দুর্দ্দশা দেখিয়া মুসলমান হাসে, মুসলমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দু হাসে; সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া 'হুতোম পেঁচা' হাসে আর বলে—"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা"। এই গেল মনের ঐক্য; তা বই আমা-

বেদের শরীর অনেকদি
তাহার আত্মা আজিও সজীব
মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে—
হইতে নবতর জীবনে দিন দি
বৈরতন্ত্র (Feudal system) ব
তাহার Magna charta অ
তন্ত্রাদিকেই আমরা সেকালের
শব্দের অর্থই হ'চ্চে পুরাতন ত
কিন্তু উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা
আমরা সেকেলে বলিয়া উড়
উৎপত্তি সেকালে হইলেও
সব-ফেলে; এগুলি পুরাতন ন
হিন্দু-ধর্ম্ম কি? না—বৈদিক
পূজাদি, তান্ত্রিক প্রতিমা
না—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান; ভ
কর্ম্ম; এবং ঐরূপ আর ত
মহাবাক্য সর্ব্বকালেই এবং
র্ষণ করে, সেই সকল অমূল্য
হইতে সেই সকল মহাবাক্য উ
আমাদের দেশে কয় জন?
তাহা চিনিতে পারে এমন জহরী

* আমাদের দেশের জনসাধারণ
পরিচয় আমি অনেকবার অনেক রক
দিতেছি; ব্রাহ্মসমাজের কোনো উৎ
দেশীয় রাগিণীর একটি গীত ভাঙিয়া

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ; তার সারথী হ'চ্চে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হ'চ্চে লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি

সভাস্থলে গান করা হইয়াছিল; তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, সে গীতের সুর নিশ্চয়ই ইংরাজি সুর। বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী গীত যাহা আমাদের দেশের কাণে চিরাভ্যস্ত—এ দেশীয় লোকের ধ্রুব সংস্কার যে, তাহাই বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী; তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে—আমাদের দেশের লোক তাহাকে একেবারেই বিলাতের আমদানি বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া থাকেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে হয় তো বা কৃপার্দ্রচিত্তে আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতেন যে, "এরা খোট্টা মানুষ এদের সংস্কৃত উচ্চারণ কত আর ভাল হইবে।" আমাদের দেশের লোকের এটা জানা উচিত যে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ মুসলমানদিগের পরাক্রমের সংস্পর্শ হইতে অনেক পরিমাণে নির্লিপ্ত ছিল, এই জন্য যদি বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী কোথাও থাকে তবে সেই সব অঞ্চলের গলিঘুজিতে লুকাইয়া থাকিবারই কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৃত্যগীত মুসলমান রাজাদের বৈঠকী নৃত্যগীত হইতে—খেয়াল ধ্রুপদ টপ্পা এবং বাইনাচ প্রভৃতি হইতে—অনেক বিভিন্ন ছিল—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; তাহার সাক্ষী—কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গীতাংশের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই এমনি সব নূতন-তরো নাম যে—তাহাদের বাহার যে কি অর্থ তাহা এক্ষণকার গীতের বড় বড় ওস্তাদেরাও বলিতে পারেন না। এদেশের পুরাতন-প্রণালীর নৃত্যগীতকে লোকে যে ইউরোপীয় ঢঙের নৃত্য গীত বলিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই; কেননা আর্য্য জাতিগণের গোড়ার একতা বিদ্যমান ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার অস্ফুট আভাস কালের পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে চম্‌কানি দিবে—ইহা তো হইতেই পারে। আমাদের দেশের বিশুদ্ধ ভারতবর্ষীয় (অর্থাৎ অযাবনিক) গানের সুর শুনিলে লোকে তাহা ধরিতে পারে না—ধরিতে না পারিলেই তাহাকে ইংরাজি সুর বলিয়া খোঁটা দেয়; তেমনি আমাদের দেশের লোক আদিম কালের উপনিষদাদির পরিষ্কার ব্যাখ্যান শুনিলে তাহাকে আধ-খ্রীষ্টানি বলিয়া খোঁটা দেয়। আমরা এমনি অসাধারণ সনাতনদার লোক যে, আমাদের নিকটে পুরাণ-তন্ত্রাদির ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম; বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম যে উপনিষদাদির মথিত সারাংশ তাহা আমাদের নিকটে খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরই সামিল।

অমুক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে; অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত অমুক দণ্ডে দেবারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অমুক দণ্ডে অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে, অমুক দণ্ডে অতিথিসৎকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে—বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিবে—এইরূপ শক্তাশক্তি কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে;—কি? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী—বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে তিন দিনে সাঙ্গ হইয়া যায়; সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা পিতৃতর্পণাদি কতক-গুলি মুখস্থ শব্দ উচ্চারণ মাত্র; এবং পূজা উৎসবাদি আর কিছু নয়—পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া লওয়া,—এক প্রকার রোঝাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো!

যেমন বলিলাম—বৈদিক কালে—ঋষিদিগের দেবতাস্তব তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিল; তাহা মুখস্থ চর্ব্বিত-চর্ব্বন ছিল না; তাঁহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত না। ক্রমে হইল অমুক সময়ে অমুক যজ্ঞে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে অমুক প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে—অমুক যজ্ঞে এইরূপ পশু এবং এতগুলা পশু এইরূপে হত্যা করিতে হইবে,—এইরূপ কত রে বাল্যক্রীড়া তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদের কারণ আর কিছুই না—তিনি যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তা বই—তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মো-পদেশ পাঠ করিলে কখনই এ কথা কাহারো মনে তিলার্দ্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকালের লৌকিক প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সেইদিকে

আর একটু বেশী মাত্রা ঝোঁক দিয়াছিলেন, সেই গতিকে চারিদিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক। বুদ্ধদেবের তপস্যার প্রভাবে সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার চকিতের ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল—দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-ব্যাপী দেশীয় ঐক্য-বন্ধন অভিব্যক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার দেখা দিয়াছিল! কিন্তু হইলে হইবে কি—তখনকার সেই সৌভাগ্যের কাল আমাদের দেশের ভাবি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানির মুখ্য সময়—সাময়িক কার্য্য সময়ে হওয়া চাই—সেই মুখ্য সময়টিতে যদি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন্ হইবে;—অতএব দেও বুদ্ধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া—বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্ম্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের কীর্ত্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও। যাগযজ্ঞের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হউক। অনেক বৎসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধূম লাগিয়া যা'ক্! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের শুষ্ক মুখ হর্ষ-কিরণে সমুজ্জ্বল হউক্! এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিব্যথা নির্ব্যথা হইয়া গেল—সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্রও রহিল না—জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ব হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল। আবার আমাদের দেশ যে-কে-সেই! পুরাবৃত্তের অঙ্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই শুখাইয়া মরিল। এক দিকে "আমি ব্রাহ্মণ আমি মস্ত লোক" "আমি ক্ষত্রিয়

আমি মস্ত লোক” এইরূপ কৌলিক বড়ত্ব, আর-এক দিকে “আমি শূদ্র আমি ক্ষুদ্র লোক” এইরূপ কৌলিক ছোটত্ব, এক দিকে প্রভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—আর-এক দিকে অভাব-পক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—দুয়ের বেগাতিশয্যের মাঝখানে পড়িয়া জন-সমাজের হস্তপদ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। এই-গতিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া একটা যে বিজ্ঞান-সামগ্রী তাহা আমাদের দেশে জন্মিতেই অবসর পাইল না। কৃত্রিম বাঁচার ধর্ম্ম-বন্ধনে লোকের হাত পা বাঁধা থাকিলে কেহই স্বাধীন-ভাবে কোনো কার্য্য করিতে পারে না;—আর, যে কার্য্য স্বাধীন-ভাবে কৃত না হয়—পুরাবৃত্তের বাজারে সে কার্য্যের বিশেষ কোনো মূল্য থাকিতে পারে না। রাজারা প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত কোন্ মুহূর্ত্তে কি কাজ করিবেন তাহা শাস্ত্রে সবিস্তরে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে,—যে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা মানিয়া চলিলেন, সেই রাজা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন, আর, যিনি তাহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ করিলেন তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন! এইরূপ যেখানে কৌলিক প্রথা মানিয়া চলা-না-চলার উপরে রাজাদের সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতি যশ-অপযশ নির্ভর করে, সেখানে কাজেই জাতির গুণাগুণই ব্যক্তির গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এবং পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজের কোনো স্বাধীন কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গুণ-বর্ণনায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়—“যথা-বিধিহুতাগ্নীনাং যথাকালার্চ্চিতার্থিনাং যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাং রঘূনামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্” এই-রূপ শাস্ত্রীয় বন্ধনে বাঁধাসাঁধা কার্য্য ছাড়া, স্বাধীন-ভাবে কোনো

দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, "কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—(১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, যেমন যাগযজ্ঞাদি; (২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন—চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে;—কি? না নিষ্কাম কর্ম্ম; শাস্ত্রে বলে—আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়—যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই—তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইঁহারা বলেন—এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; তা ছাড়া—নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর এক কথা বলে—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়-বিধ ধর্ম্মেরই—ধর্ম্মমাত্রেরই—একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; তা বই—মুখে এক, মনে আর অথবা কাজে আর—এ-ভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে;—না তাহা কাম্য কর্ম্ম—না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণী-ভুক্ত। চতুর পরামর্শদাতাকে একজন খাঁটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেন যে, "তুমি বলিতেছ—মুখে পুত্রং দেহি ধনং দেহি এবং মনে 'কিছু দিতে হবে না মা—ছেড়ে দেহি' ইহারই [illegible] কর্ম্ম। আমিও যে কোরান স্মরণের মাধ্য ধনের

কামনা নাই—পুত্রের কামনা নাই, যশের কামনা নাই; কিন্তু মায়া-ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইবার কামনা আছে তো? এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না।" আমরা তাই বলি যে, নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয়-শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে ভিন্ন—তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—সংসারাসক্তি; নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক—বৈরাগ্য, অথবা যাহা একই কথা—ভগবদ্‌ভক্তি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্ম—ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা;—ভগবদ্‌গীতা বলেন "কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ।" "কর্ত্তব্য" এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য—কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেকে মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাঠ পাষাণে গঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হ'চ্চে অনুরাগের ঠিক্ উল্টো—মুখ-শিট্‌কোনো বিরাগ। কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ সোপানের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ; তাঁহাদের কাছে—বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ—বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে,

বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা, আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া, একই কথা; এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয়; কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না—সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ স্বীকার করেও না—করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন একটা বিষয়ের ভালবাসা সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করেন; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে ত্যাগ স্বীকার করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে, কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ—অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা-ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; এই জন্য আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ, এবং তাহার উপরে কোন্‌টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহার পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্য-মঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পঁইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে;—(১)

প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার একপ্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য); (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ; (৪) দেশানুরাগ; (৫) সর্ব্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগ সোপানে—যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, কেহবা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; আবার, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারে; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের—ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক—ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকালে স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত না সদুপদেশ প্রদান করিলেন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। একই অভিন্ন কারণে ঈসাকে ইহুদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারত-বাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল; সে কারণ আর কিছু না—নীচের পংক্তির লোক দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পারে না—ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধ-দেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়াই দিল—তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটি প্রচ্ছন্ন উপ-

শাখা; সে যাহাই হৌক্—দোঁহার প্রবর্ত্তিত দুই সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম পৃথিবীর দুই মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্ত-স্থানে ছট্‌কিয়া পড়িল—বুদ্ধের ধর্ম্ম পূর্ব্ব প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল—ঈসার ধর্ম্ম পশ্চিম প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল।

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কি হইবে—ইতিহাসের রহস্যটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো;—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা ক্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ সশরীরে না হউক্ সদলে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না—লোকদিগকে কৃত্রিম ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া। যাগ-যজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবাসী লোকদিগকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধের হৃদ্‌গত সংকল্প ছিল, এবং ফারিসীয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহুদী জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার হৃদ্‌গত সংকল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল—ঈসার ধর্ম্ম ঘূর্ণাবায়ুর ন্যায় ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

যে দিন বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতী মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পূর্ব্ব-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল, সেই দিন মাতা ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণকে বলি-

সেন—"বুদ্ধ-দেব তোমাদিগকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্ত পদ হইতে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—তাই তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে!—বুঝিয়াছি—তোমরা মুক্তি চাও না—তোমরা চাও বন্ধন! তথাস্তু! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক্! স্বাধীনতা তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া বাঁচিয়া অস্পর্শীয় ম্লেচ্ছদিগের গৃহ উজ্জ্বল করুক্! যেমন তোমরা বন্ধন-প্রিয়—তেমনিই তোমাদের দশা হউক্—সেই ম্লেচ্ছদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক্!" দেখিতে না দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেঘ মুসলমান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্যুৎক্রীড়া এবং মস্তকের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল—সেই এক দিন! এবং তাহার পরে গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশদিক্ ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন—এই একদিন; এইরূপে (দেশের অন্ধীভূত নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উল্টিয়া পাল্টিয়া ভয়-আশা এবং আশা-ভয় সঞ্চার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন-হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না; আমরা আরো বন্ধন চাই—আরো বন্ধন চাই! আবার আমরা গাঁয়ে মানুক না মানুক্ আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন যেখানে একটু আধটু আল্‌গা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার গিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিতেছি। যদি আমাদিগকে কার্য্য-গতিকে সমুদ্র যাত্রা করিতে হয়, তবে মৃত শাস্ত্রকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা

লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদরেরা যাঁহারা সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার শাঁস কোনো কাজের হইল না—জল কোনো কাজের হইল না—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন; এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার-সাধন হইতেছে— টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে—কোঁটাহীন ললাটে কোঁটা আবির্ভূত হইতেছে—বিলাত-ফের্তারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন—দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ইঁহারা এই এতগুলা ব্যক্তি—আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন—দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক লাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না—ইহুদীরা ঈসাকে চিনিল না—সেই কারণেই বা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী মহান্ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যা-দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সংকীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন "ওটা বিধর্ম্মী—ওকে দূর করিয়া দেও!" এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাথাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ধূলা কাদা ইঁট পাট্‌কেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ সোপানের যিনিই যত উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করুন্ না কেন—একটি নিয়ম কিন্তু সকলেকেই মানিয়া চলিতে হয়; সেটি এই যে, নীচের পঁইটা না মাড়াইয়া উপরের পঁইটায় পদ-নিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে—আর এক জন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তা বই—এরূপ কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঁইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্ত্তে চতুর্থ পঁইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারা-বাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে—তাহা এই;—

যে কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না—কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে

তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুখাইয়া মরে না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা বীর যখন যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন তাহার গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পর দিন প্রত্যূষে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে;—কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকসিত হয়;—নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকসিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে; তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশ-প্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রসপান করিয়া বৃক্ষের মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রসপান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রস পান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদৈশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ; ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ

করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর একদিকে যেমন পল্লব-পুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে; তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে; উপর-ধাপের অনুরাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরিশোধন করে; গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে; কুলানুরাগ দেশানুরাগকে পরিপোষণ করে, দেশানুরাগ কুলানুরাগকে পরিশোধন করে; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুরাগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; আর, এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াসক্তি অথবা কাম; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে শ্বেতাংশের পরিমার্জ্জন—রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন—অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ;—গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব-চেয়ে বেশী; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয়; এইরূপে, এ বাড়ির

প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক;—হইতে পারে তাহা কি উপায়ে? উপায় আর কিছু না—গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া। এ বাড়ি এবং ও বাড়ির মাঝ-খানে মনোমালিন্যের যত কিছু অন্ধকার—সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায়; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক ইতিবৃত্ত এই;—প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয়; তৃতীয়তঃ, কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈটায় এ যেমন দেখা গেল—কুলানুরাগের পৈটাতেও তাই; আমাদের দেশে হিঁদু মুসলমানের মধ্যে যত কিছু মনোমালিন্যের জ্বর-জ্বালা—দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিই তাহার একমাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক-রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোকরশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়—অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পৈটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে—তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের বাড়াবাড়ি, অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি; যেখানে আমি-টি এবং আমারটিই সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটির আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের খনি। অনুরাগের নীচের নীচের পঁইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—উচ্চ উচ্চ পঁইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষ-দাঁতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে। বিষ-দাঁতের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয়;—গৃহানুরাগ বিষ-দাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবল-মাত্র যদি বলে "এরা আমার বাড়ির ছেলে মেবে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে তাহার অর্থই এই যে, আর-কারো বাড়ি বাড়িই নহে! কুলানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন—অমুকের সন্তান!" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ইংরাজ" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর—তা তুমি লোহার আফ্রিকা-দেশেই থাকো আর সোণার ভারতবর্ষেই থাকো তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ

আবার কিরূপ অনুরাগ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা; সকলকে ভালবাসা আবার কিরূপ ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান; এ তো অনুরাগ নহে এ একপ্রকার বিরাগ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি—অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না!" বাস্তবিক, এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের আর এক নাম হইয়াছে—বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা—আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না; তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন "ও মা! সোণার স্ত্রী-পুত্র নাতি নাত্নী ফেলিয়া যে লোক যুদ্ধে যাইতে পারে—সে সবই পারে; তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—তাহার আবার অনুরাগ!" এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোক-বিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র—সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন—কেননা, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগ্য এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরমসীমা তাহা এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে;—শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমার-টি লইয়া অনুরাগের যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ—এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ, এবং আনুষঙ্গিক-ভাবে আমিটি-আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেননা আমিটি

আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে);—এই অর্থে তাহা [illegible] সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে—সমস্ত জগতের [illegible]-টি এবং আমারটির সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি—টি-ধ্বনিটি—পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি-ধ্বনিটি আর কিছু না—বিষয়াসক্তি। বিষয়-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে—মনের একপ্রকার বালিশ; সাধু-ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায়; কাজেই, সেই বিষয়-টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত, অনুরাগ; তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম;—এই জন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ; অথবা যাহা একই কথা—বিশুদ্ধ প্রেম।

অনুরাগ-সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া আসে; তাহার প্রমাণ এই যে, আদুরে ছেলের মায়ের বিষ অপেক্ষা, পাড়াগেঁয়ে কুলীন-সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম; কুলীনের কুলোপানা চক্রের কোঁস-কোঁসানি অপেক্ষা মানোয়ারি গোরার মুখের বিষ অনেক কম; হদ্দ ভ্যাম্ নিগর-টা আস্‌টা—তার বেশী নয়! তাও আবার—অর্দ্ধেক মুখে, অর্দ্ধেক পেটে! পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পাড়া সরগরম করা কুলীনসন্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি। এটা সত্য যে, কুলীনের মুখের অস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ বই নয়—

গোরা-লোকের বাল্যক্রীড়া কালা-লোকের মৃত্যু! কিন্তু হইলে হইবে কি—এটাও তেমনি দেখিতেছি যে, ষাঁড়ের শৃঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিঁপড়ের কামড়ে কাহারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না; অথচ বিষাক্ত বলিতে আমরা কেটো পিঁপড়ের কামড়কেই বিষাক্ত বলি—শৃঙ্গের আঘাতকে নহে। অধিক কি আর বলিব, দেশানুরাগের গালাগালিও দেশ-ঘটিত, কুলানুরাগের গালাগালিও কুল-ঘটিত! কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে বাপান্ত—দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে দেশান্ত—যেমন ড্যাম্ নিগর প্রভৃতি সাদরসম্ভাষণ। এখন জিজ্ঞাসা করি—বিষ বেশী কার? বাপান্তের না দেশান্তের? অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পণ করে, ততই তার বিষ-নরম পড়িয়া আসিতে থাকে; আর, যতই তাহা সংকীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণ-কোটরে প্রবেশ করিতে থাকে ততই তার বিষ-দাঁত গজাইয়া উঠিতে থাকে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না—নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম; আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পৈঁটায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে

নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে-কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

অতঃপর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাধনের মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা;—

কুলানুরাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তিদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, প্রতীচ্য দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। সংক্ষেপে,—প্রতীচ্য ভূখণ্ডে দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে কুলানুরাগ, হিতানুষ্ঠানের মূল প্রবর্ত্তক।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক্ হইতে মুহুর্মুহু একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে যে "সব গেল, সব গেল আর থাকে না!" কাঁদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, রাজার মৃত্যু হইলে আর-এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততক্ষণ দেশের অরাজক অবস্থা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক অবস্থার প্রতিনিধান-মানসে মৃতরাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে

অবাজকতার মূলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে [illegible] বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যা [illegible] নীচের পইটা হইতে তাহা হইলেই উপদেশ [illegible] পাই—

"হে ভ্রাতৃগণ দেশ[illegible]র [illegible] সঙ্গে উত্থান কর।"

কুলানুরাগ তো দেশা[illegible]—এই [illegible] রাগই কুলানুরাগের উপরে [illegible]। আর উল্টা আরো এই কথাই [illegible] স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের [illegible] কিন্তু [illegible] দেশে [illegible] অব[illegible]র [illegible] [illegible] [illegible]

কূল সে অতি ভয়ানক স্থান—নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছে—তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকেলে আশ্রয়-দুর্গ।

বাস্তবিক, কুলানুরাগ দেশানুরাগের নীচের পইটা বই উপরের পইটা নহে।

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব-অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলা-ক্রমে তাহা করে—তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি; কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে করি কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি-মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার, অথবা যাহা একই কথা—হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ! কখনো বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই—তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে?—এ'কে জাতে তুলিতেছি—ও'কে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি—এ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি—ওকে সমাজে চালাইয়া লইতেছি—এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া (মহাবীর ডন্‌কুইক্‌সোট্ আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড় জোর এই যা সম্ভবে—এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল "দেশানুরাগ!" তবে তাহার এখনো ঢের বাকি—আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব—আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে! বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা

সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে;—টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামুণ-কায়েতের কুল-মর্য্যাদা—যাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে-সে লোক মনে করিলেই "পেট্রিয়ট" নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস্ খুব সস্তা বটে কিন্তু তাহার বিস্ফোরণ গলদ্! বিদেশীয় চণ্ডের স্বদেশানুরাগ, আর, সোণার পাথরবাটি, দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে—সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ! এইস্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা চাই—যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর, তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও—তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম্ম, কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক; তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া নিশ্চেষ্টতার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের বাগ্ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের

এবং কণ্ঠে স্বজাতীয় উপবীত, দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হ'ন নাই—স্বজাতিকেও বিস্মৃত হ'ন নাই; অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাশ-শিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষী—সমুদ্রের মাঝখানে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি; দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্যদেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।" এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল*। ব্রাহ্মণ জাতির প্রধানধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে

* যাঁহারা পালিসী-সূত্রে উপবীত ধারণ করেন তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক; রামমোহন রায় সে দরের লোক ছিলেন না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামমোহন রায় অবশ্য এটা জানিতেন যে, উপবীত রাখিলেও স্বর্গ-লাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না। বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো একটি গতিশীল ব্যাপার নীচের পঁইটা ছাড়াইয়া উপরের পৈঁটায় উঠিলে নীচের পঁইটার কতক-গুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ বর্ত্তমান পৈঁটায় তাহা আদবেই কোনো কাজে লাগে না; বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইহাকে বলে atavism। সর্প—টিকটিকির জাত; তাহার আদিম পূর্ব্ব পুরুষদিগের পা ছিল এরূপ অনুমান হয়; কিন্তু এখন সর্প বিনা পায়ে চলিতে পারে—সুতরাং এখন তাহার পা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা; না থাকিলে বরং তাহার শরীর হাল্কা হয়; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বকালের স্মারক চিহ্ন-রূপে সর্প-শরীরের যথাস্থানে পদ-দ্বয়ের অঙ্কুর এখনো পর্য্যন্ত খোলস-ঢাকা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যদিচ কুলানুরাগের পৈঁইটা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার কুল-মাহাত্ম্যের একটি স্মারক-চিহ্ন তাঁহাকে দংশিয়া ধরিয়াছিল—কেবল স্বভাবের প্রভাবে; তা বই—তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা কিছুই ছিলনা—পালিসী কিছুই ছিল না।

চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন—দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাব-সুলভ কার্য্য-নৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা—প্রত্যুৎপন্ন-মতি! দুর্বুদ্ধির কন্যা আত্মঘাতিনী পালিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধুলা দিতে পারে—কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পালিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা-বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে দলাদলির হাঙ্গামা কোনো মতে চুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিক প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে; মাতা—ভারতভূমি! পিতা স্বয়ম্ভূ ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের যত কিছু মহত্তর সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন! তাঁহার কাজ ফুরাইল—আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্ম-

নদীতীরে আম্রবন, তারি এক পাশে
সূর্য্য অস্ত যায়, কনক কিরণোচ্ছ্বাসে
চমক লাগায়ে দিয়ে আঁধারের চোখে।
শান্ত স্থির নদীজল, সন্ধ্যার আলোকে।
পড়ে' আছে যেন এক সোনার মুকুর।
পরপারে বালুচর বহু—বহু দূর।

শরিষার ক্ষেতভরা ফুটিয়াছে ফুল
পুকুরের এক পাড়ে; বাতাস আকুল
থেকে থেকে গন্ধ তার উড়াইয়া আনে
বহু বরষের কথা জাগায়ে পরাণে।

কোন খানে শব্দ নাই, শুধু নদীপারে
মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধশ্বাসে কে ডাকিছে কারে
পরপার লক্ষ্য করি,'—বালুচর ঘুরে'
স্তব্ধ নদী পার হয়ে, ম্রিয়মান সুরে
হতাশ্বাস প্রতিধ্বনি একা ফিরে আসে;
শুনি' সকরুণ ডাক পরাণ উদাসে।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'

জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকার ঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম সুরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।

দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলি সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা
শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,

এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন ;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন !
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায়নি সংসার !
ভোলে নাহি খেলাধূলা নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান ! দাঁড়ায়ে হেথায়

নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্র প্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,

অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

আকাশ-তরঙ্গ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আকাশতরঙ্গ ঘটিত কয়েকটি নূতন আবিষ্কার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। বিশ বৎসর হইল

মহামতি ক্লার্ক্ ম্যাক্সবেল জ্ঞানচক্ষে জড়জগতের এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া যান। তিন বৎসর হইল জর্ম্মনি দেশের হার্টজ সাহেব তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাগতিক ক্রিয়াপ্রণালীর অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে; কিন্তু এত বড় তথ্য বুঝি আর বাহির হয় নাই। পরিতাপ যে, মাক্সবেল আজ বাঁচিয়া নাই!

আলোক বুঝিতে গিয়া ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতের 'আকাশ' নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের বাঙ্গলায় আমরা আকাশ বসাইতে পারি। তবে সেকালের আকাশ একটা কল্পনাপ্রসূত দ্রব্য; আর একালের আকাশের অস্তিত্বে বড় একটা সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘর বাড়ী হাতী ঘোড়া গাছ পালা যে অর্থে অস্তি, এই আকাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও সেই অর্থে অস্তি। নাস্তি বলিবার বড় উপায় নাই। তবে আকাশের সকল গুণাগুণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু কোন্ পদার্থেরই বা সকল গুণাগুণ আমরা অবগত আছি?

এই আকাশের এ কটা গুণ এই যে, ইহা নাই এমন জায়গা নাই। শূন্য স্থলে ত আছেই—তা ছাড়া জল বায়ু সোণা রূপা মাটী পাথর সকল জড় পদার্থেরই অভ্যন্তরে 'ওতপ্রোত ভাবে' জড়িত আছে। ইহার আর একটা গুণ এই যে, ইহার কোন অংশ কোন রকমে একটু নাড়িয়া দিতে পারিলে তখনি চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়। জল নাড়িয়া দিলে যেমন জলাশয়ের পৃষ্ঠে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয়, তার নাড়িয়া দিলে যেমন চারিদিকের

বাতাসে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয় ও শ্রুতিমধ্যে উপনীত হইলে শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করে, তেমনি এই আকাশকে কোন রকমে নাড়িয়া দিলে ঢেউএর পর ঢেউ উঠিয়া সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে। তার বেগই বা আবার কত! এখানে ঢেউ আরম্ভ হইলে সেকণ্ড মধ্যে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরে যাইয়া সেই ঢেউগুলির ধাক্কা লাগিবে। সূর্য্যমণ্ডল যে এতদূরে আছে—প্রায় সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরে আছে—সেখানে সেই ঢেউ উঠিবা মাত্র আটমিনিট মধ্যে আমাদের চোখে আসিয়া তাহার ধাক্কা লাগে। চোখে আসিয়া সেই ধাক্কা লাগিয়া আমাদের মস্তিষ্ককে নাড়া দেয়; তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, ওখানে একটা কি পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটার নাম রাখিয়া দিই সূর্য্য। ঈথর বা আকাশ আছে বলিয়াই আমরা অতবড় পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান পাইতেছি।

আকাশ-সাগরের এই ঢেউগুলি বেগে বড় প্রবল, কিন্তু আকারে বড় ছোট, এক একটি ঢেউ লম্বে বড় কম। সাগরপৃষ্ঠে বাত্যাযোগে শতাধিক হাত দীর্ঘ এক এক বিশাল তরঙ্গ উঠে, পুকুরের জল নাড়িলে আধ হাত এক হাত দীর্ঘ এক একটি ঢেউ উঠিয়া থাকে; আবার অগভীর জলের উপর মৃদু বায়ু হিল্লোলে হয়ত এক আধ ইঞ্চি লম্বা, কি আরও ছোট ঢেউ উঠে। কিন্তু আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোকজ্ঞান জন্মায়, তাহারা এক একটি এত ছোট যে, জলের ঢেউয়ের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আর ইঞ্চিতে চলে না। ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ করিতে হয়। এই সকল আলোক-জনক ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য কত, তাহা একরকম মাপিয়া ঠিক্ করা হইয়াছে। গজকাঠি দিয়া কাপড় মাপিলে তাহাতেও যেমন বড় ভুল হয়

না, এ মাপেও তেমনি বড় ভুল নাই; বরং এ মাপ তার চেয়েও সূক্ষ্ম। কারণ, ঢেউগুলি এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে সাধারণ ইঞ্চির মাপ এখানে খাটে না—ইঞ্চির লক্ষাংশ লইয়া কারবার। ইহারই মধ্যে যে ঢেউগুলি একটু লম্বা, তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখে ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হল্‌দে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল্ আলো দেয়। আরও ছোট হইলে আমরা বেগুনি রঙ্ দেখি। তার ছোট হইলে আবার চোখে গ্রহণ করিতে পারি না।

আকাশের ঢেউ আসিয়া চোখে লাগিয়া মস্তিষ্কে নাড়া দিলে আলোর অনুভব হওয়া, আর সেই ঢেউগুলি যে অতি ক্ষুদ্র, এই ত গেল জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পুরাণো কথা। এগুলি অনেকের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আকাশেই যে আবার দুই হাত দশ হাত লম্বা, এমন কি দু' ক্রোশ দশ ক্রোশ লম্বা ঢেউ উঠিতে পারে, এবং সেরূপ বড় বড় ঢেউ অনবরত উঠিতেছে যাইতেছে, আমরা তাহার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও অনুভব করি না, এ কথা এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই জানিতেন না। মাক্সবেল প্রভৃতি ইহার সম্ভাবনা প্রমাণ করেন, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া যান নাই। সম্প্রতি হার্টজ্ ও তাঁহার পথবর্ত্তীদের কল্যাণে স্কুলের বালকেরা প্রকৃতির এই রহস্য-ব্যাপার উদ্ঘাটিত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে; এবং কয়েক বর্ষ মধ্যে হয়ত আমরা এখনকার এই বেওয়ারিষ শক্তিসমষ্টিকে আমাদের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া সংসারকার্য্যে নিয়োজিত করিব ও তাহাতে স্বত্ব লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিব।

রহস্যটি এই। তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি যে দুইটা লইয়া

জিনিষ, কতকটা সেই গোছের। টানিয়া ধরিতে জোর লাগে, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বের অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা একবারে পায় না। স্প্রিংটি টানিয়া ছাড়িলেই বারকত ঘন ঘন দুলিতে থাকে, এবং দুলিতে দুলিতে থামিয়া যায়। অনেক জিনিষ আছে যাহা স্থিতিস্থাপক নহে; যেমন নরম মাটী, গালা, অথবা মোম। টানিলে বাড়িয়া বা বাঁকিয়া যাইবে, ছাড়িলে দুলিবেও না, পূর্ব্বাবস্থাও পাইবে না; বাড়িয়া ও বাঁকিয়াই থাকিবে। আকাশ কতকটা স্প্রিঙের মত; কোন অংশ একটু নাড়িয়া ছাড়িলে দুলিতে থাকে, এবং এইরূপ দুলিতে থাকে ও স্পন্দিত হয় বলিয়াই চারিদিকে ঢেউ উঠে; সেই স্পন্দন ও আন্দোলন ক্রমশঃ সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হইয়াই ঢেউ উৎপাদন করে। জল ও বায়ু স্থিতিস্থাপক, কাজেই তাদের এক অংশের আন্দোলনে সমস্তটা আন্দোলিত হইয়া জলে তরঙ্গ ও বায়ুতে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক ঈথরে যখন টান পড়ে তখনি তাড়িত শক্তির বিকাশ হয়। রবরের সূতা দুই হাতে টানিয়া ধরিলে সেই সূতার যেমন অবস্থা হয়, কাচে রেশম ঘষিয়া কাচখানি সরাইয়া লইলে, চুলে চিরুণি ঘষিয়া চিরুণি খানি সরাইলে, উভয় দ্রব্যের মাঝে, কাচ ও রেসমের মাঝে, চুল ও চিরুণির মাঝে যে ঈথর থাকে তাহারও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হয়। যে দ্রব্যে তাড়িত ভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহার পাশের ও চারিদিকের আকাশে যেন টান পড়িয়াছে। রবরের সূতা টানিয়া ধরায় দুই হাতে যেমন পাল্টা টান পড়ে, এক হাত আর এক হাতের কাছে যাইতে চায়; তেমনি মাঝের ঈথরে টান পড়ায় কাগজের টুক্‌রাগুলি চিরুণির দিকে বা কাচের দিকে যাইতে চায় ও লাফাইয়া উঠে।

তবেই তড়িৎ-শক্তি কিরকম, কতকটা বুঝা গেল। দুটা জিনিষ পরস্পর ঘর্ষিয়া যত সরাইয়া লইবে, তাহাদের মাঝের আকাশও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া যাইবে। হঠাৎ যদি জিনিষ দুইটা ছুঁইয়া দেওয়া যায় (একটার গায়ে আর একটা ছুঁইলে হয়, অথবা একটা তামার তার দিয়া দুটাকে স্পর্শ করিয়া দিলেও হয়,) তাহা হইলে ঈথরের টান অমনি আল্‌গা হইয়া যায়; স্প্রিংকে অথবা রবরকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িলে যেমন সে কয়েকবার দুলিয়া দুলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আইসে, সেইরূপ মাঝের ঈথরও বার কতক দুলিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা পায়। ইহাকেই ইংরাজিতে ডিশ্‌চার্জ বলে। স্প্রিং বা রবারের সুতার যেরূপ আমাদের হস্তের অপেক্ষা অধিক জোর হইলে, নিজের দুই প্রান্ত হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, টান আল্‌গা করিয়া লয়, তড়িৎ-শক্তিও সেইরূপ অধিক প্রবল হইলে মাঝের বাধাবিঘ্ন সকল নষ্ট করিয়া নিজের দুই প্রান্তকে একত্র করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মাঝে বাতাস থাকিলে জ্বলিয়া উঠে, কাচ থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষের শরীর থাকিলে আঘাত লাগে। বজ্রপাতের পূর্ব্বে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ এই দুয়ের মধ্যে সমগ্র আকাশটার ঐরূপ টান পড়ে। টান অতিরিক্ত হইলেই বায়ুস্তর প্রভৃতি ব্যবধান ছিন্ন করিয়া ডিশ্‌চার্জ হয়; সমগ্র ঈথরটা কাঁপিয়া উঠে; কোন হতভাগ্য জীব সম্মুখে পড়িলে তাহার শরীরটাও ছিঁড়িয়া যায়।

তড়িতের বিকাশ যেমন আমাদের নড়িতে চড়িতেই হইতেছে, এই ডিশ্‌চার্জও সেইরূপ অলক্ষিতে নিয়তই হইতেছে। প্রতি ডিশ্‌চার্জেই খানিকটা ঈথর স্প্রিঙের মত দুলিয়া উঠে, এবং খানিকটা দুলিলেই সেই আন্দোলন চারিদিকে আকাশসাগরে

সংক্রামিত ও ব্যাপ্ত হয় তাহার আর সন্দেহ কি। সুতরাং প্রতি ডিশ্‌চার্জ্জেই ঈথরে ঢেউ উঠিতেছে। এ ঢেউগুলি বড় ছোট নহে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু নড়িয়া ঈথরে ধাক্কা দিলে যে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপাদন করে, এই সব তাড়িত ডিশ্‌চার্জ্জের ঢেউ অবশ্য তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। এই সব তরঙ্গ কেহ হাত হিসাবে কেহ বা মাইল হিসাবে দীর্ঘ, আর আলোক তরঙ্গের বেলায় বলিতে হইবে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

কথাটা এই। আকাশে ছোট বড়, অতি ছোট হইতে অতি বড় পর্য্যন্ত, ঢেউ প্রতিনিয়তই উঠিতেছে। আকাশে কোন রকমে টান বা আঘাত পড়িলেই এই সব ঢেউ উৎপন্ন হইয়া প্রবলবেগে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। তপ্ত পদার্থের পরমাণু গুলির ধাক্কায় যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি উঠে, সেইগুলি—তাহারও সব নহে, কতকগুলি মাত্র—আমাদের চক্ষুরূপ সুকৌশল যন্ত্রযোগে মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া দূরস্থ পদার্থের খবর দেয়। আর বাকী সমুদয় ছোট বড় ঊর্ম্মি, যত মাইল দীর্ঘ হউক, আমাদের উপর দিয়া নিয়ত চলিয়া যাইলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের অভাবে এতকাল অলক্ষিত রহিয়াছে।

মাক্সবেলই প্রথমে স্থির করেন যে, যে ঈথরে ঢেউ উঠিলে আলোক হয়, সেই ঈথরেই কোনরূপ টান পড়িলে তাড়িত ভাবের আবির্ভাব হয়; এবং ঈথর যখন এত স্থিতিস্থাপকের মত, তখন সেই তাড়িতভাব লোপের সময় অর্থাৎ ডিশ্‌চার্জ্জের সময় বড় বড় ঢেউ উঠিবারও সম্ভাবনা। জর্ম্মণ অধ্যাপক কৌশলক্রমে তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব সাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক ফুট দীর্ঘ

এক ইঞ্চি পুরু পিত্তল দণ্ডকে তড়িৎযুক্ত করিয়া, ডিশ্‌চার্জ্জ করিলে চারিদিকের ঈথরে যে ঢেউ উঠে, তাহা প্রায় এক হাত লম্বা। কাচের বোতলের ভিতর ও বাহির পাতলা টিনের রাংতায় মুড়িয়া যে তড়িৎ-সঞ্চয়ের যন্ত্র সচরাচর প্রস্তুত হয়, ইংরাজীতে যাহাকে লীডেনজার বলে, তাহা ডিশ্‌চার্জ্জ করিলে আরও বড় বড় ঢেউ উঠে। আমাদের চিরপরিচিত আলোকরেখা বা রশ্মিগুলি যেমন মসৃণ পদার্থের পরে পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বা ফিরিয়া আইসে, স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়া বিবর্ত্তিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; হার্টজের কৌশলে এই নবাবিষ্কৃত দীর্ঘ ঊর্ম্মির রশ্মিও সেইরূপ প্রতিফলিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে দেখা গিয়াছে।

সাহিত্যের উপাদান।

সত্য অনেকে অনেক রকম করে' বোঝাতে চেষ্টা করেচেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, সত্য হচ্চে বাহ্য প্রকৃতির সহিত চিন্তার সামঞ্জস্য। কেউ কেউ আবার মন ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না—তাঁরা বলেন, যে, সত্য হচ্চে চিন্তা পরম্পরার সুসংলগ্নতা। কিন্তু এঁরা কেবল বাহ্য প্রকৃতি এবং মনঃপ্রকৃতির সম্বন্ধের মধ্যে যে সত্য আছে তারই কথা বল্‌চেন। আলোকে অন্ধকার দূর হয়, আগুনে হাত পোড়ে এই সকল সত্য সম্বন্ধেই তাঁদের উক্তি।

কিন্তু তুমি যাকে সাহিত্যের সত্য বল্‌তে চাও সে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ বোধ হচ্চে। সাধারণতঃ যাকে সত্য বলা যায়, যেমন ইতিহাসের সত্য, জীবনচরিতের সত্য, সে তোমার

সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। যদি হত তবে কবিতা খুঁজে সত্যই পাওয়া যেত না, সমস্ত মিথ্যা হত। কেননা, রোমিয়ো বলে' কোন লোকই ছিল না—আর, জুলিয়েট তার প্রেমেও পড়েনি এবং বিষও পান করেনি।

তুমি বল্‌চ, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বই সাহিত্যের সত্য। মূল তত্ত্ব বল্‌তে তোমার ভাবটা এই—আমাদের আত্মার সহিত প্রকৃতির অথবা ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে একটা মতামত আমাদের মনে ক্রমশ যতই গাঢ় হতে থাকে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নীতি সম্বন্ধে ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ততই বিজড়িত হয়ে একটা বিশেষরূপ ব্যক্তিগত আকার ধারণ পূর্ব্বক আমাদের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। এই একটি ভাবসমষ্টিকে জীবনের মূলতত্ত্ব বলা যায়।

তাই যদি হয় তবে দেখা আবশ্যক সেটা প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় কিনা।

মনে কর যে, কেউ এমন করে' বর্ণনা করতে পারত যে, আমরা সেই বর্ণনা পড়ে' সূর্য্যাস্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেতুম, তাহলে কি এই বর্ণনাকে তুমি সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করতে না? এই বর্ণনায় লেখকের জীবনের মূলতত্ত্ব থাকবার কোন দরকার নেই, সূর্য্যাস্তটা স্পষ্টরূপে আমাদের মনে অঙ্কিত হওয়া নিয়ে কথা।

তুমি বল্‌চ শেক্সপিয়রের নাটকের পাত্রগণের মধ্যে শেক্সপিয়রের মূর্ত্তি পাবই পাব—আমরা চিন্‌তে পারি না পারি। মনে কর যে শেক্সপিয়রের নাটকগুলো গাছে ফলেচে—তা হলে কি তার কম মূল্য হত!

তুমি বল্‌বে যে, জীবনের মূলতত্ত্ব শেক্সপিয়রের নাটকে

পাওয়া যায়। আমি বলি যে, সমস্ত ভাল নাটকেই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়;—কেন না, যেখানে মানুষ আঁকা হয়েচে সেখানে মানুষের জীবনের মূলতত্ত্ব খানিকটা থাক্‌বেই—তা নইলে মানুষকে ভাল রকমে আঁকা হল না। কিন্তু লেখকের জীবনের মূলতত্ত্ব কি তাতে থাক্‌বেই থাক্‌বে, কিম্বা না থাক্‌লে সেটা সাহিত্য হবে না?

সাহিত্যে মানুষকে মানুষ চেনায় বটে, কিন্তু তার কারণ, মানুষ মানুষের কাছে চিরকাল প্রিয় সামগ্রী, এই জন্যই মানুষ সাহিত্যের প্রধান বিষয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যেকালে আমাদের আর্টিষ্টিক্ সুখ দেওয়া তখন হাতের কাছে এমন একটা সুবিধার বিষয় পেয়ে ছাড়তে পারে না। মানুষ স্বভাবত সামাজিক, পরস্পরের আসঙ্গ-প্রয়াসী, এই জন্য মানুষের মনের মত এমন চিত্তরঞ্জক প্রসঙ্গ আর নেই। সাহিত্য আমাদের মনোহরণের উদ্দেশে এই রকম চিত্তরঞ্জক বিষয় বেছে নেয়—কিন্তু এ গুলো তার অবলম্বন মাত্র, এ তার উদ্দেশ্য নয়। যেমন ভাস্করমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য পাথর খোদে, কিন্তু পাথর কাটাই যে ভাস্করের কাজ তা বলা যায় না।

গোটিয়ের গ্রন্থবিশেষে প্রকাশিত মূলতত্ত্বকে তুমি মিথ্যা বলেছ। অর্থাৎ তাতে যে সৌন্দর্য্যের ছবি ধরা হয়েছে সে সৌন্দর্য্যে আমাদের আনন্দ হয় না বরং কষ্ট হয়। সে হিসাবে আমিও তাহাকে অনার্টিষ্টিক্ বল্‌তে প্রস্তুত আছি। আমি টেয়োফিল্ গোটিয়ে সম্বন্ধে তোমার মতামত নিয়ে কিছু বল্‌চিনে—কিন্তু তোমার মতে যদি গোটিয়ে তার নিজের মূলতত্ত্ব তার রচনায় প্রকাশ করে' থাকে তাহলে তার লেখাকে কেন সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেবে না? নিজের নিজত্ব প্রকাশ করা

নিয়েই যদি কথা হয় তা হলে ত গোটিয়েকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

আসল আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের কার্য্য এবং অন্য সমস্ত আর্টের কার্য্য একই—কেবল উপাদানের প্রভেদ। অনেক সময় লেখকের নিজত্ব প্রকাশ সাহিত্যের একটা বিশেষ উপাদান মাত্র। লেখকের নিজত্বকে ত্যাগ করে' আর কোন উপযোগী বিষয়কে অবলম্বন করলেও সাহিত্য সাহিত্যই থাকে। অনেক বিষয় আছে যা' সাহিত্যের অনুপযোগী যেমন তরল পদার্থ ভাস্করের অনুপযোগী। এমন বিষয় অবলম্বন করা চাই, এবং সে বিষয়টিকে এমন ভাবে দাঁড় করানো চাই, যাতে আমাদের আর্টিষ্টিক্ আনন্দ দিতে পারে। মনুষ্যের বিস্ময় আগ্রহ ভালবাসা ইত্যাদিকে যদি উপযুক্তরূপে ফলিয়ে তোলা যায় তবে তাতে আমাদের আর্টিষ্টিক্ সুখ হয়। জীবনের মূলতত্ত্ব, নিজের নিজত্ব, নৈতিক সত্য, দার্শনিক সত্য সবই এই আর্টিষ্টিক্ সুখের উপাদান স্বরূপে ব্যবহৃত হতে পারে—কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্চে সেই সুখ। সকল আর্টই আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্রেক করে' সুখ দেয়। সঙ্গীত একপ্রকার অনির্দ্দিষ্টভাবে আমাদের চিত্তকে বিচলিত করে, চিত্র এবং মূর্ত্তি আমাদের বিশেষরূপ ভাবোদ্রেক করে। সাহিত্যের ক্ষেত্র এদের সকলের চেয়ে বিস্তৃত। কারণ, সাহিত্যের অবলম্বন হচ্চে ভাষা—ভাষায় মানবের সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রসর অধিকার করে' রেখেচে। তাই, ভাষার সাহায্যে সাহিত্য অনেক বেশি রকমে আমাদের চিত্তবৃত্তি উদ্রেক করতে পারে—সেই জন্য আমাদের ভ্রম হয় যে, সাহিত্যের কার্য্য বুঝি অন্যান্য আর্ট হতে স্বতন্ত্র।

যখন আমাদের চিন্তা এবং চিন্তাপ্রকাশক ভাষা সাহিত্যের

উপাদান—তখন যে সেই চিন্তা এবং ভাষা যোগে আমাদের নিজত্ব কতক পরিমাণে সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে সেটা মুখ্যরূপে আবশ্যক নহে সেটা আনুষঙ্গিক মাত্র। সঙ্গীতেও রচয়িতা অথবা গায়কের আত্মস্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ পায়, চিত্র এবং মূর্ত্তিতেও তদ্রূপ। মানুষে যাই করুক না কেন তাতে তার নিজত্ব একটু থাকবেই। কিন্তু আর্টের মধ্যে সেইটেকেই যে সর্ব্বময় প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক তা আমি মান্‌তে পারি নে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সোশ্যালিজ্‌ম্।

বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক্, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যালিজ্‌ম্ মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।

সোশ্যালিষ্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে; এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এস্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্ ব্যাক্স্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যাঁহারা কোন কোন প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের বর্ত্তমান মতাবলম্বীদিগকে "লিবারাল্" কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিষ্ট্‌দিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্‌ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই "লিবারালিজ্‌ম্‌" বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থ-সঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জ্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারালদের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার সৃষ্টি করিয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্‌ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহার সম্যক্‌ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ধনীর কর্ত্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্র-পাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক, কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্ম্মচ্যুত প্রাচীন কারী-করের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারীকর অনেকটা নিজের ওমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারীকরের

নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিষ্ট্‌রা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জন সাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট, নয় মর' সেও তদ্রূপ। যে নির্দ্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমী সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভাল হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে কর, সোশ্যালিষ্ট্‌ বিধানমতে কোন এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমস্‌লা যোগ করিয়া তাহার কোন লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোন লাভ নাই এবং ভাল রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভাল রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত

শস্তায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিষটা ভাল করিবার দিকে তাহার কোন দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে অতএব নির্দ্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য সোশ্যালিষ্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে, যে উদ্দেশ্য যাহাই হৌক্ ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামত আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখন সমাজ টিঁকিতে পারে না, অতএব একটা কোনরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনা-সঙ্গত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংশ্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স্ সাহেব বলেন, আদিম কালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়;

ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র বহির্জ্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এখন প্রত্যেকে বড় হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ—প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব-সমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের আত্মানুসন্ধায়ী সভা।

প্রায় ৮। ১০ বৎসর হইল ইংলণ্ডে "আত্মানুসন্ধায়ী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। প্রেত-দর্শন, ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস, সম্মোহন তত্ত্ব, (Hypnotism) দিব্যজ্ঞান (clairvoyance) প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক কাণ্ড সকলের যথার্থ তথ্য কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আশ্চর্য্য ঘটনা-গুলি সমিতির সভ্যেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিয়া থাকেন। অনেক বিচক্ষণ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সভার সভ্য। কিছু কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট ইহার সভাপতি ছিলেন—

এক্ষণে পণ্ডিতবর অধ্যাপক হেন্‌রি সিজ্‌উিক ইহার সভাপতি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমিতি আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন জানিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল হয়। সভাপতি সিজ্‌উিক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা পাঠ করিলে সভার কি উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি।

তিনি এই মর্ম্মে বলেন—"আমাদের এ কালে মানব-আত্মার প্রকৃতি ও গতি লইয়া কতই না বাদানুবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ মনান্তর উপস্থিত হইতেছে; এই সব কষ্টকর ব্যাপার দেখিয়াই আমরা গোড়ায় এই সভা স্থাপনে প্রবৃত্ত হই। এক পক্ষে, খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাসটি প্রবল যে, আমাদের আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র ও দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্যার সাধারণ মত উক্ত কল্পনার বিরোধী—শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কোন ব্যক্তির মানসিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতি তাহার শারীরিক জীবন ও ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত অবিচ্ছিন্ন রূপে সংযুক্ত—দেহের বিনাশে আত্মারও বিনাশ হয়। কিন্তু আমরা কোন পক্ষেরই গোঁড়া নহি। আধুনিক বিজ্ঞান-পদ্ধতিতে আমাদের দ্বিধা-শূন্য বিশ্বাস আছে বটে; সমবেত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত আমরা নতশিরে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নহি সত্য কিন্তু তাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার-সকল আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রমাণ সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই নিজের

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি এই বিষয়ে বিজ্ঞান-সিদ্ধ পদ্ধতির অনুগত নহে। আমরা এই অভাব পূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; আত্মার স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইবে তাহা আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহাই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে এই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে দেখা আবশ্যক।

একটি মন অপর মনের উপর যে প্রভাব প্রকটন করে সেই প্রভাব দূর হইতে যখন অপর মনটি জানিতে পারে, তাহাকে টেলিপ্যাথি অর্থাৎ "দূরানুভূতি" বলা যায়—এই দূরানুভূতি ব্যাপারের গুরুতা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি; এবং সম্মোহন ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ার্থ আমরা একটি পৃথক উপ-সমিতি স্থাপন করিয়াছি—সম্মোহিত অবস্থায় বিশেষরূপে যে দূরানুভূতিক কাণ্ড সকল প্রকাশ পায় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। মৃত্যুকালে যে সকল উপছায়ার আবির্ভাব দেখা যায় তাহা আমরা পূর্ব্বে ভূতের গল্পশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করিতাম—কিন্তু ক্রমশ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে পীড়িতাবস্থায়, জীবনের সঙ্কটাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমরা যে উপছায়া দেখিতে পাই তাহাও দূরানুভূতির প্রকার-ভেদ মাত্র। আরও ইহার প্রমাণ এই পাওয়া গিয়াছে যে, আমরা মৎলব করিয়াও ইচ্ছা করিয়াও এইরূপ উপছায়া উৎপাদন করিতে পারি—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। এই সকল মৃত্যু-কালীন প্রেত-দর্শন মনের বিভ্রম মাত্র—উহা বাস্তবিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। যতক্ষণ না আমরা অশরীরী প্রেতাত্মার বিশিষ্ট প্রমাণ পাই ততক্ষণ আমাদের এইরূপ মনে করিতে হইবে যে শরীরী

আত্মারই কোন গুপ্ত শক্তির দ্বারা এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়।"

অধ্যাপক সিজ্‌বিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে "আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভায়" যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে এইরূপ বলেন—"আমাদের সভার অস্তিত্বের ৬ বৎসর কাল মধ্যে আমাদের সভার অধীন একটি উপসমিতি ১২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া "দূরানুভূতি" বিষয়ক মতের অনুকূলে নিজ অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আর একটি উপসমিতি মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির অলৌকিক শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন।"

অতএব দেখা যাইতেছে, "আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী সভা" এখনও প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পান নাই। এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার তাঁহারা একটা "দূরানুভূতি" শক্তি (telepathy) কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

পহুঁ।

(১)

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এমন সকল শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের অর্থ করিতে যথেষ্ট পাঠ ও চিন্তার প্রয়োজন; অনেক সময় সে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়া থাকে, সেরকম স্থলে তাহাদের পক্ষোদ্ধার তত দুরূহ নয়, কিন্তু যখন কোন শব্দের ধাতু অন্তর্জলীর রোগীর নাড়ীর মত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিম্বা শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ আবিষ্কার

দুর্ঘট হইয়া পড়ে, তখন বড় বিপদ। 'নিছনি' লইয়া ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করায়, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার হইয়াছে, এবং তাহাতে আমাদের আশা হইয়াছে এইরূপ আলোচনায় প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক দুর্ব্বোধ্য শব্দ সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে আর একটি শব্দের খুব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, সে শব্দটি 'পহুঁ', কোথাও চন্দ্রবিন্দু আছে, কোথাও নাই; ইহা সংস্কৃত শব্দ, কি সংস্কৃত ধাতুমূলক বাঙ্গলা বা মৈথিলী কিম্বা অন্য কোন ভাষায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; বোধ হয় একের বেশী অর্থেও 'পহুঁ' ব্যবহৃত হয়; যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবেন তাঁহাদের কতকটা সুবিধা হইবে ভাবিয়া নিম্নে কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একস্থানে আছে

"গোরা 'পহুঁ' বিরলে বসিয়া।

জ্ঞানদাসে আছে

"অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী
পরশিতে বিহসি ঠেলই 'পহুঁ' পাণি।"

অন্যত্র

"ধরি 'পহুঁ' হাসি আলিঙ্গন দেল।"

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন

"চরকি চরকি পড়ু লোচন লোর
কত রূপে মিনতি করল 'পহুঁ' মোর।"

অনন্তদাস বলেন

"রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর
দাস অনন্ত 'পহুঁ' না পাওল ওর।"

অন্যতম পদকর্ত্তা রসিকদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"যৈছন চতুর শঠের 'পহুঁ'
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ।"

এইরূপে প্রায় সকল পদকর্ত্তাই 'পহুঁ' শব্দে প্রভুর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, একটু চিন্তা করিলেই মনে হয় 'পহুঁ' 'প্রভু' শব্দের অপভ্রংশ হইলেও হইতে পারে; এবং 'পহুঁ মোর শ্রী নিবাস' ইত্যাদি পাঠ পড়িলে সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না; উদ্ধৃত অংশগুলিতেও 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লইলে কিছু অসঙ্গত হয় না। 'পহুঁ' শব্দ ছাড়াও 'পহুঁক' কথাটি মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"কহ রাধামোহন 'পহুঁক' বলিহারী।"

অন্যত্র

"পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র কক যাপে।"

গোবিন্দদাস একস্থানে বলিয়াছেন

"পহুঁক চরণযুগ সাবধী করবি।"

বিদ্যাপতিতেও আছে

"ধনি অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি 'পহুঁক' মালা।" *

'পহুঁক' যদি 'প্রভু' শব্দ হইতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'পহুঁক' এর অর্থ 'প্রভুর' বলিলে বোধ করি অসঙ্গত হয় না।

---

* পঁহুক মালা ঠিক নহে, পহুপ মালা অর্থাৎ পুষ্পের মালা হওয়া উচিত।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু এ সমস্তই অনুমানের উপর বলা হইতেছে। যাহা হউক ব্যাপার এখানেই যদি শেষ হইত তাহা হইলে প্রশ্নটা জটিল হইয়া পড়িত না, কারণ তাহা হইলে 'পহুঁ'র এই একটা অর্থ ধরিয়াই চলা যাইত; কিন্তু 'পহুঁ' এরকম স্থানেও প্রযোগ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে 'পহুঁ'র অর্থ 'প্রভু' ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বোধ হয় না; আর যদি বা টানিয়া বুনিয়া সেরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে পদ নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, নিম্নে তাহারো দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, যথা

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' নটবর শেখর নাচত গাওত তালধারী।"

অন্যত্র

"গোবিন্দদাস 'পহুঁ' জগমনমোহন বিহরই ভেল কলপসম রাতি।"

আর একস্থানে

"রাধামোহন 'পহু' দুহু অতি নিরুপম ত্রিভুবন করু অবতংশ।"

এবং

"রাধামোহন 'পহুঁ' রসিক শুনাহ।"

নরোত্তম দাস বলিয়াছেন

"নরোত্তম দাস 'পহুঁ' নাগর কান
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।"

বাহুল্য ভয়ে আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না; উদ্ধৃত পদগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পহুঁ যদি ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা না যায় ত পদগুলি সম্পূর্ণ হয় না; সুতরাং 'রাধামোহন পহু রসিক শুনাহ' অর্থ রাধামোহন 'বলিতেছেন' বা 'বলেন' এবং রসিকগণ 'শুনিতেছেন' বা 'শুনেন' এরূপ বলা, কিম্বা "নরোত্তম দাস পহুঁ নাগরকান রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।" পদের অর্থ নরোত্তম দাস বলিতেছেন "হে নাগর কান তুমি রসিক

এবং কলাগুরু অতএব তুমি সকলই জান," এরূপ বলা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিকই শেষ উদ্ধৃত পদগুলিতে 'পহুঁ'র 'বলেন' বা 'বলিতেছেন' এরূপ অর্থ না করিলে গোবিন্দদাস, রাধামোহনদাস ও নরোত্তমদাস ক্রিয়াহীন হইয়া পড়েন, কিন্তু ক্রিয়াহীন কর্ত্তার ব্যবহার কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; যাহা হউক একটু আলোচনা দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পহুঁ।

(২)

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন "পহু" অর্থে প্রভু এবং "পঁহু" অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁশব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্র বাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু ও পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু। "গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর শেখর" অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর। "রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ" অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ। "নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান, রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান" ইহার অর্থ এই—তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান তুমি রসিক কলাগুরু তুমি সকলি জান। এরূপ ভণিতা হিন্দী গানেও দেখা যায় যথা, "তানসেনপ্রভু আকবর।"

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙ্গাও দেখা যায়, যথা "গোবিন্দদাসের পহু হাসিবা হাসিয়া রহু।"

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না। "রাধামোহন পহুঁ দুঁহু অতি নিরুপম"—এস্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ না হইলে আর কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাঁহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর কোন বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে "পহুঁ"র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল—দৈবাৎ দুই একটি যদি পাওয়া যায়। "রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে" এস্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে "পহুঁ"র "ভণে" অর্থ ব্যবহার দেখা যায়। "গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সাবাহু, বেলি অবসান ভৈ গেলি।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এস্থলে আর কোনরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরও এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে "পহুঁ"র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে? এক, "ভণহুঁ" * হইতে "ভহুঁ" এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমান মাত্র। বিশেষতঃ যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদে পহুঁর এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সঙ্গত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

---

* ভণহুঁ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

আমার বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভণিতার "পহুঁ" অর্থে "পুনঃ"ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। "গোবিন্দদাস পহুঁ" অর্থাৎ "গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে "পহুঁ" শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ এইরস গায়।" অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদিগের পদে একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—"তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।" "রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।" "গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে না জানিয়ে কী ভেল গোরি।"

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখন বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখন বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি আমার কোন শ্রদ্ধেয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে তাঁহাদের দেশে "নিছে-পুঁছে" শব্দের চলন আছে। এবং নব বধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে "নিছিয়া" লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে "নিছনি" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। বৈশাখ। পুরাতন ও নূতন। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়—কিন্তু হায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছু মাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে, কথা কীটের মত অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল—"নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না" অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল "বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।" তস্য পুত্রঃ "নবীন সূর্য্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।" তস্য পুত্রঃ "নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্দ্ধান হয়।" তস্য পুত্রঃ "নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।" (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্রঃ "নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?" অবশেষে "৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।" এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল—নববর্ষ আসিয়াছে,

অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই, "হ্রাসবৃদ্ধি" কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন—"হ্রাস বৃদ্ধির কথাটা বলিয়াছি ত আর একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটি ক্রমাগতই বড় হইতেছে! কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ডুবিতেছে বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।"—ছোট ছেলেটি যে ক্রমে বড় হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড় হইয়া থাকে সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও

যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।—মামলায় মরণ। মাম্‌লা মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কিরূপ সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে—সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙ্গালীর ঘরে মাম্‌লা মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মাম্‌লার পরিবর্ত্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মত এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মাম্‌লা ত একপ্রকার আইনসঙ্গত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্ব্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশ বাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে মকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।—মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রবন্ধে জেনেরাল্ বুথ যে কিরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক্ আমাদের—বাঙ্গালীদের—অত্যুগ্র

আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় ত সে পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ। প্রভাবতী সম্ভাষণ। স্বর্গী বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণা রসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্ব্বি শেষে ভাল বাসিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে একান্ত ব্যথি হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই।— লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিব নিমিত্ত বলিল, "উনি আর তোমায় ভাল বাস্‌বেন না।" তু অমনি শিরশ্চালন পূর্ব্বক, "ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি" এই ক আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বার বার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, "না ভাল বস্‌বি এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থি করিয়া, তুমি, স্ফূর্ত্তিহীন বদনে, "তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভ বস্‌বো" এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরসসহ- কারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।"—

"মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব" প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। "নূতন বাড়ি" গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না—প্রভু মহেন্দ্রনাথ বাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবী ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে।

(রূপকথা)

১

প্রভাতে।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে' দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে।

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,'
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে,'
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,'
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে।

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে,'
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'

আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে এক শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি!
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন-আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া

বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্ করে, এই চিত্রিত-বৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত, এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র ফেন-শুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মত আকাশ দিক্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজ-

পুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্র-তীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিক্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙ্গাৎ, পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।"

রাজপুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র

কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না, এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ, ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন্, চিঁড়েতন, হর্‌তন অথবা কহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে ছুরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই ছুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। ছুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ

করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুঁতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তামরাজ্যের কলরব-হীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্‌নি একান্ত যথাযথ, এম্‌নি পরিপাটি, এম্‌নি প্রাচীন, এম্‌নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারি-দিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙ্গাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়! এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক কোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্‌নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা,

মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে

নাই—নির্ব্বাক্ নিরুদ্বিগ্নভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এমন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ, তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাক্ষাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূতপূর্ব্ব শোভা,

এ কি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল! তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাবাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষ্যা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হোক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টর্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিণীর এত সাজের ধুম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকম-সকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত একটাও কথা

যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙ্গে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্ থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জ্বলিতেছে এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি আন, তুরি ভেরি বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি কর, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, তুরি তিবি তুরি-ভেরি লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের মধ্যে তেম্‌নি হইতে লাগিল।

এম্‌নি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড় মধুরস্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই তাহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায়

একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

১০

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারাণী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলংঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

স্বরলিপি।

(রাজা ও রাণী হইতে)

রাগিণী মিশ্র—কাওয়ালি।

সখি, ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে কি মনমাঝে!

বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল ?
বল গো সজনি এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে !
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে সবি লোকলাজে !
না জানি কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার সাজে !

৪।৩

৩ বা রা। জ্ঞা -া -া -া। -া -া রা সা। রা -া -সা -রসা।
৩ স খী। ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি — —।

॥

৩ ন্‌া -া সা -া। -া -গা গা গা। মা -া -া -পা।
৩ বা — জে —। — — স খী। ঐ — — — —।

৩ মপমা জ্ঞা বজ্ঞরা সা। সরসা -ন্‌া সা -া। -ন্‌সা -রা বা রা।
৩ বু ঝি বাঁ শি। বাঁ — জে —। — — স খী।

৩ জ্ঞা -া -া -া। -রজ্ঞা -মজ্ঞা রা সা। রা -া সা -রসা।
৩ ঐ — — —। — — বু ঝি। বাঁ — শি — —।

৩ ন্‌া -া সা -া। {-া -া পা মা। পা -া পা -া।
৩ বা — জে —। {— — ব ন। মা — ঝে — —।

৩ পা -া ধা -র্সা। ঞর্সঞা -ধা পা -া। -া -মপমা পা -যা।
৩ কি — ম ন। মা — ঝে —। — — ব ন।

৩ গমা -পা পা -া। পা -ধা -ঞা -ধর্সা। ঞা -ধঞধা পা -ধপা।
৩ মা — ঝে —। কি — — — —। ম — — ন — —।

। মপা -মধা পা -া। -া -রা॥ মা -া পা -া। পা -না না -া॥
। যা — ঝে —। — —॥ ব — স —। স্ত — বা য়া

। না নর্সা ধা -না। র্সাঃ -নঃ র্সর্রসনা -র্সা। না র্সা -া র্রা।
। ব হি ছে —। ক্কো — থা ম্ম। কো থা য় হু।

। র্রা -া বর্সা -র্রা। র্জ্ঞা -া -া -া। র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা।
। টে — ছে —। কু — — ল্। ব ল গো —।

। র্রা র্সা র্সা -া। র্সা নর্রা র্সা -া। ঞ্ঞা ধা পমা -গমা।
। স্ব জ নী —। এ সু থ —। র জ নী — ।

। পধা -পর্সা ঞ্ঞা -া। ধঞ্ঞা -ধা পা মপা। গা -রগা মা -া }॥
। কো ন্ থা —। নে — উ দি। য়া — ছে — }॥

। ন্ সা রা -জ্ঞা। রা মা জ্ঞমা -জ্ঞরা। সা রা সা রসা।
। ষা ব কি —। ষা ব না —। মি ছে এ ই।

। ন্ ন্ সা -া। সমা মা মা -া। পা -া পা -ধা।
। ভা ব না —। মি ছে ম —। রি — লো ক।

। ঞ্ঞা -ধর্রা র্সা -া। -া -ঞ্ঞধপা মা মা। পমপা পা পা -া।
। লা — জে —। — — স খী। মি ছে ম —।

। প্ত বপা পা -ধা। ঞ্ঞধা -র্রা র্সা -া। র্সা র্রা র্রা -র্জ্ঞা।
। রি লো ক —। লা — জে —। না ভা নি —।

। র্রা র্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্রা। র্সা নর্সর্রা র্সা -া। ঞ্ঞা ধা পমা -গমা।
। কো থা সে —। বি র হ —। হু তা শে —।

। পা পর্সা না না। না -া নধা -না। র্সা -না র্সর্রসনা -র্সা}॥
। ক্কি রে অ ভি। সা — র —। সা — ষে —}॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বর।

উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্। খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

২। গ=কোমল গ; ঞ=কোমল ন; দ=কোমল ধ; ঋ=কোমল র; ঙ্ম=কড়ি ম।

৩। উপরোক্ত স্বরাক্ষরগুলির গায়ে এক একটি আকার বসাইলেই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। যথা সা=এক মাত্রা; সা-া=দুই মাত্রা; সা-া-া=তিনমাত্রা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন বিসর্গ, যথা সঃ; দেড় মাত্রা, যথা সাঃ; অর্দ্ধ-মাত্রা প্রভৃতি খণ্ডমাত্রার চিহ্ন অতি অল্প স্থলেই আবশ্যক হয়—অনেক সময়েই স্বরাক্ষরগুলি একত্র করিয়া তাহার গায়ে একটি আকার দিয়া এক মাত্রার সামিলে আনা হয়। যে সুর কেবল ঈষৎ মাত্র ছুঁইয়া যায়, তাহার স্থায়িত্ব-কালকে স্পর্শ-মাত্রা বলে। এই স্পর্শমাত্রার সুরগুলি ছোট অক্ষরে মূল সুরের পার্শে বসাইতে হয় যথা—এই গানের তৃতীয় সুর-পংক্তির আরম্ভে "সরসা"।

৪। দুই ছেদের মধ্যবর্ত্তী সুরগুলি এক একটি তালের অন্তর্গত। প্রতি ছেদের পরবর্ত্তী সুরের উপর তালের ঝোঁকটী পড়ে। এই ছেদ-বিভক্ত অংশগুলিকে তাল-বিভাগ বা পদ বলে। এই প্রত্যেক তাল-বিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই গানের প্রত্যেক তাল-বিভাগ চারিটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া আছে। প্রথমেই যে দুই মাত্রা দেখিতেছে, উহার সহিত প্রথম চরণের শেষ পদের দুই মাত্রা যোগ হইয়া চারি মাত্রা পূরণ হইয়াছে।

৫। গানের শিরোদেশে ৪।৩ এই যে তালাঙ্ক চিহ্ন আছে, ইহার অর্থ এই, এই গানটির অন্তর্গত প্রত্যেক তাল-বিভাগ যতটি মাত্রায় বিভক্ত তাহারই মোট সংখ্যা আকারটির বামপার্শ্বে স্থাপিত; এই গানে প্রত্যেক তাল-বিভাগে চারটি করিয়া মাত্রা আছে, এই হেতু ৪ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আকারটির ডাহিন পার্শ্বে যে ৩ সংখ্যা লিখিত আছে ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই;—এক-এক-এক-এক; একদুই-একদুই-একদুই-একদুই; একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন-একদুইতিন; এইরূপ ভাবে সংখ্যা তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলে যে কালবিলম্ব হয় তদনুসারে তাল বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল নির্দ্ধারিত হয়। এক দুই তিন, এক দুই তিন, এইরূপ তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে যতটা সময় লাগে এই গানটির প্রত্যেক মাত্রা ততটা কালস্থায়ী, তাই ৩ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে, বিলম্ব, দ্রুত, অতিদ্রুত, প্রভৃতি আদেশ স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার আবশ্যক হয় না—কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত, ঐ সংখ্যার দ্বারা তাহা ঠিক্ ব্যক্ত হয়।

৬। যে সুরগুলিতে গানের অক্ষর নাই—কেবল অক্ষরের টানটী চলিতেছে তাহাকে "আপ" বলে; এই টানের সুরগুলি হাইফেন বা ক্ষুদ্র কসির দ্বারা যোগ করিয়া দিতে হয় যথা:—

। পা -ধা -ঞা ধর্সা।

। কি — — — ।

৭। আস্থায়ী হইতে পুনরাবৃত্তির সাধারণ চিহ্ন ॥ যুগল-ছেদ। অন্য স্থান হইতে পুনরাবৃত্তির বিশেষ চিহ্ন { } গুম্ফবন্ধনী। যেখানে এই } বিমুখী গুম্ফবন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া

দিতে হইবে ; ছাড়িয়া দিয়া, যেখানে এই { প্রমুখী বন্ধনী দেখিবে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যথা—এই গানের একাদশ ও শেষ পংক্তিতে "উদিয়াছে" ও "সাজে" এই কথা দুটির পরে যে } বিমুখী বন্ধনী আছে ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া চতুর্থ পংক্তিতে "বনমাঝে"র গোড়ায় যেখানে প্রমুখী { বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পুনরাবৃত্তি করিয়া কোথায় ছাড়িতে হইবে? যেখানে যুগল ছেদ আছে সেইখানে ছাড়িবে। ছাড়িয়া আবার আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কারণ, যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন।

৮। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া কোথায় ছাড়িয়া দিবে? যেখানে শিরোদেশে যুগল ছেদ দেখিবে। শিরোদেশস্থ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে থামিবার কিম্বা ছাড়িয়া দিবার চিহ্ন। ঐখানে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কলি ধরিতে হইবে কিম্বা একেবারেই ঐখানে থামিয়া যাইবে।

এই গানে কাওয়ালির ঝোঁক্ যথার্থ সমান আছে—কিন্তু রীতিমত কাওয়ালি তালের পদ-বিভাগের নিয়ম রক্ষা করা হয় নাই—সুতরাং সম ফাঁকের ব্যবস্থা এই গানে দেখাইবার আবশ্যক নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ উপদেশ

দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, "পূর্ব্ব প্রবন্ধে একথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক।" দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোন ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনিনাংচ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয় মাত্র চন্দ্রনাথ বাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি, তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, চন্দ্রনাথ বাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথ বাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে! অতএব, চন্দ্রনাথ বাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দ্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই, যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক, এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথ বাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা, আকারে যদিও

বৃহৎ, কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ "তাঁহারা বড় ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধ হয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা বা বিকৃতি বশতঃ আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ।" তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ "আত্মসম্প্রসারণ।" স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশঃ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞান শিক্ষা সৌন্দর্য্য চর্চ্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, "পদার্থ-বিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়-প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিষ।" "বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।" "প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।"

কিন্তু "হাঁ"-কে বড় করিয়া "না" করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। "সৃষ্টিকৌশলের" মধ্যে "বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা" দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণ-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "লীলা" কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? "লীলা" কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? "সৃষ্টি-কৌশল" জিনিষটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোন যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালবাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশিস্বরে আহ্বান করিতেছেন—তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথ বাবু কি বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে "পাষণ্ড" বলিয়াছেন। সে যাহাই হৌক্, সৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে

যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘোরা গেল। ন্যাশনাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখ্‌লুম। কোন ছবি পুরোপুরি ভাল লাগ্‌তে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্‌দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে' কোন কথা বল্‌তে পারিনে।

১৫ সেপ্টেম্বর। স্যাভয় থিয়েটারে "গণ্ডোলিয়র্স" নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। আলোকে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে মনে হল একটা কোন্ কল্পরাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; সেখানে আমার মনে হল আমার চারিদিকে যেন কিছুক্ষণ ধরে' কিন্নর লোক থেকে সৌন্দর্য্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল। যেন, হঠাৎ এক সময়ে একটা আদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে' সুন্দর নর নারীর একটা ওলট্-পালট্ ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সঙ্গীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়চে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্ব্বশ্রুত সুর পিয়ানোতে বাজাচ্ছিলেন। শুনে আমার সেই সব মনে পড়তে লাগ্‌ল! সেই

ভারতবর্ষের রৌদ্রালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহ পরিচিত সঙ্গীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্ত্তা আমরা বহন করে' করে' বেড়াচ্চি, ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে' এনেছি সে বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; "ভ্রম-ক্রমে" বলে' একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল, কিন্তু সেটা আমার মনে হল মৌখিক শিষ্টতা মাত্র। কিন্তু সন্তোষের বিষয়, যার কম্বল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র;—দেখে' পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগ্‌ত ত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। ঈফেল্ স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। এমন অনেক সময়ে হয়, রাজপথে কোন নীল-

নয়না পাস্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক্ না কেন, তারো একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাঞ্জনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে; তবে হাস কি দেখে'? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ—কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে' বল্‌তে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতাপুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে' হাসি পায় তাহলে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার্" বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলে' বোধ হয়।"

২২ সেপ্টেম্বর। আজ সন্ধ্যার সময় গোটাকতক বাঙ্গালা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোত্রীগণ বিশেষ পছন্দ করেচেন। আশা করি, সেটা কেবলমাত্র মৌখিক ভদ্রতা নয়। তবে চাণক্য বলেচেন, "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এঁরা একে স্ত্রীলোক, তাতে আবার আমাদের রাজকুল ইংরাজকুলও বটেন।

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিষপত্র কিনে দোকানে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্চে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে আমরা খুব সমারোহের সহিত বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে' আমার বান্ধব অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্ত্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে, আমরা কোন বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দুজনে মিলে' জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাই। আজ কাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করচি, যে, কাজের আর তিলমাত্র অবকাশ থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাইনে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ৎকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হ'তেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে' থাকি। রাত দুটো বাজ্‌ল, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্চে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটখাট এক্‌জিবিশ্‌ন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। শুন্‌লুম, এটা প্যারিস্‌ এক্‌জিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালার প্রবেশ করে' কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকররচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখ্‌লুম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুন্দর মানবশরীরের মত সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই

দেখি, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই চরম সৌন্দর্য্যের উপর, জীব-শক্তি-ব্যক্তির এই সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই ছবিখানি দেখ্‌লে চেতনা হয় পশু মানুষ বিধাতার স্বহস্তরচিত একটি মহিমাকে বিলুপ্ত করে' রেখেচে, এবং চিত্রকর মনুষ্যরচিত অপবিত্র আবরণ উদ্‌ঘাটন করে' সেই দিব্য সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য আভাস দিয়ে দিলে। যবনিকার এক প্রান্ত তুলে ধরে' বল্লে, দেখ, দেখ, তোমরা কোন্ লক্ষ্মীকে অন্ধকারে নির্ব্বাসিত করে' রেখেছ! এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে সেই অসীমসুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য্য যে বড় সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা' বল্‌তে পারিনে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারীপ্রকৃতি, একটি অমর সুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারি দিব্য লাবণ্য এর সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে চকিতের মত মানব-অন্তঃকরণের সেই অনির্ব্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল!

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম্ নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট্ রচিত "ব্রাইড্ অফ্ লামার্‌মুর" উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কি এক নাট্যকৌশলে ক্রমশঃ অলক্ষ্যে দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

আমাদের সুখবর্ত্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসেছিল।

তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁৎ সুন্দর ছোট মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুল্‌চে—বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল ষ্টেজের আলো জ্বল্‌ছিল এবং সেই আলো ষ্টেজের অনতিদূরবর্ত্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুন্দর সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জ্জনা করবেন—অভিনয়কালে বারবার সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দূরবীন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসঙ্কোচে দূরবীন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলো অভদ্র প্রথা আছে—যত কালই এদের সংসর্গে থাকি সেগুলো আমাদের যেন অভ্যাস হয়ে না যায়! যেমন ঘূর্ণী নাচ—বিশেষতঃ ওয়াল্‌জ্, মেয়েদের নাচবস্ত্র, পুরুষদের খাটো কুর্ত্তি, নাট্যশালায় দূরবীন কষা, নিমন্ত্রণসভায় কাউকে গানবাজনায় প্রবৃত্ত করে' দিয়ে গল্প জুড়ে দেওয়া।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে' এসেচেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিঁড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাক্ সব্‌জি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা' কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে'

বেড়ান। বড় বড় লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কিরকম করে' কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল্ ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে' আসেন। ইতিমধ্যে একজিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে' এসেচেন এবং অবসরমত অ্যামেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করচেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জান্‌তুম। ইনি বাঙ্গলা শিক্ষা করে' অনেক ভাল বাঙ্গলা বই গুজরাটিতে তর্জ্জমা করেচেন। এঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, খর্ব্ব, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

পুরুৎ ঠাক্‌রুণ।

পুরুৎ ঠাকরুণ পাকা মাথায় সিন্দূর পরেন, বয়স তাঁর ষষ্টি বর্ষ। তা হলে কি হয়, এখনও পুরোহিত ঠাকুর হারাধন শর্ম্মার তিনি মরণ কাঠি জিয়ন্ কাঠি। শাঁখা বাজাইয়া, নথ দোলাইয়া ঠাকুরাণীটি যখন ঝঙ্কার করেন, তখন ঠাকুরটির হরিনাম ভুল হইয়া যায়, পরিণাম স্মরণ থাকে না, মনে হয় বুঝি বার্দ্ধক্যের এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

পুত্রবধূ এবং কন্যাগণের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ শেষ হইয়া যায়। পট্টবস্ত্রপরিহিতা এবং চর্চ্চিতসিন্দূর শ্বেতসীমন্তিনী পুরোহিত ঠাকুরাণীটিকে অতি প্রত্যূষে ফুলের বাগানে বা বেলতলায় সাজি হাতে ঘুরিতে দেখিয়া সেকালের লোকের তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া মনে হইত।

একালের ঝি বউ কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার অন্যরকম নামকরণ করিয়াছে। শাশুড়ির একাদশীর দিন রায়েদের বউ যখন এইমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া খিড়কির ঘাটে মুখ ধুইতে-ছিলেন, পুরুৎ ঠাক্‌রুণ তখন সাজি হাতে হন্ হন্ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। বউকে দেখিয়া ডানিহাতের সাজি বামে রাখিয়া ঠাকুরাণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাচ্ছিল্যে বলিয়া উঠিলেন—"একেই বলে কলির মেয়ে! বুড়ো শাশুড়ি একাদশী কবে ঘরে পড়ে', বউ উঠ্‌লেন কিনা বেলা চার দণ্ডের সময়!" সেই দিন থেকে রায়েদের বউ পুরোহিতানীকে নাকি সমবয়স্কাদের কাছে অতি সঙ্গোপনে "পুরুৎ প্রেতিনী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। দুই দিন উপ্‌রি উপ্‌রি রাঁধিয়া চাটুয্যেদের সাধের মেজবউর ব্যামোহ হইয়াছিল—তাকে দেখিতে গিয়া ঠাক্‌রুণ বলিয়াছিলেন—"কি বাবুই হয়ে উঠ্‌লি তোরা? এই একটু অসুখ করেচে, এর জন্যে লোকে জানাজানি! আমরা হলে মরে যেতুম!" সেই দিন হইতে মেজ বৌ তাঁর নাম দিয়া-ছিলেন "পুরুৎ রাক্ষসী!" পরে যে রায়েদের বউতে আর মেজ বউতে বেগুণফুল পাতান হইয়াছিল সেটা এইরূপ মতের ঐক্য এবং প্রবল সহানুভূতির ফল।

ফুলের সাজি পূজার ঘরে রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঠাকরুণ যখন কুট্‌নো কুট্‌তে বসেন, তখন তাঁর আর এক মূর্ত্তি। লগ্ন বুঝিয়া সে মূর্ত্তি বৈচিত্র্যময়ী। শাকসব্‌জি তরকারির যেদিন অনটন সেদিন ভীমামূর্ত্তি, সম্মুখে প্রকাণ্ড বঁটি, হাতে কচ্ কচ্ ঘস্ ঘস্ শব্দ, মুখে পুত্রবধূদের এবং কখন কখন কর্ত্তাটির ত্রিকুলের শাখাপল্লবিত পরিচয়। তাই যারা ছেলেপুলের অসুখের জন্য পুরুত ঠাকুরাণীর কাছে উপদেশ এবং ঔষধ

প্রার্থনা করিতে আসে, তাহারা কেহ প্রায় রিক্তহস্তে দেবীদর্শনে আসে না। কেহ আনে লাউ কুমড়ো পুঁইদাঁটা, কেহ বেগুণ, কাঁচকলা থোড়। তখন অভয়া মূর্ত্তি, কেবল হাস্য এবং গল্পরস, এমন কি, অভয় পাইয়া নামাবলী গায় ঠাকুরটি যখন দাল-চালের খবর সুধাইতে আসেন তখন তাঁহাকে নথনাড়া সহিতে হয় না।

মূর্ত্তি প্রসন্নময়ী যখন ঠাকুরাণী শৌচাচার এবং জাতি-মহিমা ভুলিয়া যথার্থ দেবীর মত ছেলেদের, দুঃখীদের রোগ-শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসেন। রুগ্ন ছেলেটি বড় কাঁদিতেছে, মা পিসি কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারিতেছে না—পুরুৎ ঠাকুরাণী আসিয়া কোলে লইলে সে একেবারে চুপ। লোকে বলে বুড়ি কি মোহিনী জানে—আমি কিন্তু জানি বুড়ি অনেক ছেলে-ভুলানো গল্প জানে। বুড়ি যে জিলিপি মিঠাই সন্দেশের গাছের গল্প করে, ছেলেরা জানে তার মালী যদি কেউ থাকে ত সে পুরুৎ ঠাকরুণ! এ বয়সে মিষ্টান্নের আর বড় ধার ধারি না, কিন্তু বুড়ির মিষ্টি মিষ্টি গল্পগুলি মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় আবার তেম্‌নি ছেলে বনিয়া যাই।

কত ছিটেফোঁটা মন্ত্রতন্ত্রই জানা আছে এই পুরুৎ ঠাকরুণটির। শুনা যায় তাঁর মন্ত্রঃপূত শর্ষপ তৈলের প্রলেপে সে অঞ্চলে চর্ম্মরোগ ত দেখা দেয়ই না—জলপড়ার মহিমায় পেঁচো এবং মামদো প্রভৃতিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঔষধ করাও তাঁর বিলক্ষণ আসে। কিন্তু নাতী নাৎনী সম্বন্ধীয় দম্পতিগণের মিলন-সম্পাদনে ঠাকুরাণীর কর্ণমর্দ্দন ও মুষ্টিযোগে যেরূপ অভ্রান্ত ক্ষিপ্রহস্ত তাতে ঔষধটা কতটা হস্তজ এবং কতটাই বা বলজ সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। বাসর ঘরে পুরুৎ ঠান্‌দিদির রঙ্গরস যে না দেখিল সে বুঝিতে পারিবে

না কেন ঠাকুরটি এখনও সে নথভূষিত বদনচন্দ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত। আর যে বর তাঁর পদ্মহস্তের স্পর্শসুখ কর্ণপল্লবে অনুভব করিয়া অশ্রুপাতের বদলে ওষ্ঠে এবং দন্তে হাস্যরস সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াছে, জনশ্রুতি এই যে তাহাকে "দোজবরে" হইতেই হইবে।

পুরুষ মহলেও পুরোহিতানীর পসার কম নহে। অনেকেরই তিনি ঠান্‌দিদি—কিন্তু নাতীগণ সহসা তাঁকে ঘাঁটাইতে রাজি নন্। তাহার প্রধান কারণ, বাজে কথা ঠাকুরাণীটির ঠাট্টা-তামাসার বিষয়ীভূত নহে। পণ্ডিতা না হইলেও তাঁর বিদ্রূপে একটা "নৈতিক লক্ষ্য" থাকিত—অনেক বেচালের চাল তিনি বাক্যকশাঘাতে সংযত করাইয়াছেন। নিষ্কর্ম্মা আমোদপ্রিয় গ্রাম্য যুবকদের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা ঠাকুরাণীদিদির ভয়ে তটস্থ। "অরগুণ নেই বরগুণ আছে" "বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" প্রভৃতি বাক্যবাণ তাঁর অমোঘ অস্ত্র—এবং লোকে বলে তিনিই তাহার রচয়িত্রী।

আতিথ্যে ঠাকুরাণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা। বারো মাস তাঁর সে জন্য আয়োজন। দৈনিক বরাদ্দ চাল দালের ভিতর থেকে তিনি গোপনে চারি মুষ্টি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। বাড়ির কুকুর বিড়ালকে পর্য্যন্ত আহার করাইয়া স্বয়ং আহারে প্রবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস থাকিলেও মাসের মধ্যে বিশ দিন ঠাকুরাণীকে "ফলাহার" করিতে হয়। অভুক্ত অতিথিকে পানাহার দিতে তাঁর যে আনন্দ তার আর কি বলিব! তখন আর জাতিভেদ বড় থাকে না। শূদ্রকে পরিবেশন করিতে গিয়া বস্ত্র সম্বরণে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সাবধান হইলেও, মনটার মধ্যে কোন ভেদাভেদ কেহ কখন লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

পাল পার্ব্বণে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি আরও বিকশিত হইয়া উঠে। পৌষ পার্ব্বণে পিঠে পুলির দিনে পুরুৎবাড়িতে যে প্রসাদ পাইল না তাহার বৃথা জন্ম। তখন বিচিত্র আলিপানার রঞ্জিত সুঠাম আঙ্গিনায় ঠাকুরাণীকে সহস্রবার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া মনে হয় লক্ষ্মীর পদরেণু ধারণের জন্যই এ চিত্রবিদ্যার সৃষ্টি বটে।

পুরুৎঠাক্‌রুণকে বৌ ঝি প্রণাম করিলেই তিনি স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করেন "আমার মত পাকা মাথায় সিন্দূর পর বাছা!" এ কলিকালে কিন্তু সে আশীর্ব্বাদ বড় ফলে না।

সাহিত্যের প্রাণ।

একটি মাত্র গাছকে প্রকৃতি বলা যায় না। তেমনি কোন একটি মাত্র বর্ণনাকে যদি সাহিত্য বলে' ধর তা হলে আমার কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণনা সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নেই কিন্তু তার দ্বারা সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একটি মাত্র সূর্য্যাস্ত বর্ণনার মধ্যে লেখকের জীবনাংশ এত অল্প থাকতে পারে, যে, হয় ত সেটুকু বোধগম্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু উপরি-উপরি অনেকগুলি বর্ণনা দেখ্‌লে লেখকের মর্ম্মগত ভাবটুকু আমরা ধরতে পারতুম। আমরা বুঝতে পারতুম লেখক বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মার সংস্রব দেখেন কি না; প্রকৃতিকে তিনি মানব-সংসারের চারিপার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালের ছবির মত দেখেন, না, মানবসংসারকে এই প্রকাণ্ড রহস্যময়ী প্রকৃতির একান্তবর্ত্তীস্বরূপ দেখেন, কিম্বা মানবের সহিত প্রকৃতি মিলিত হয়ে, প্রাত্যহিক সহস্র নিকটসম্পর্কে বদ্ধ হয়ে, তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য দৃশ্য উপস্থিত করে।

সেই তত্ত্বটুকুকে জানানই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য তা' নয়, কিন্তু সে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের উপর কার্য্য করে—কখনো বেশি সুখ দেয়, কখনো অল্প সুখ দেয়; কখন মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখন বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে তা' নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখন ম্লান শ্রান্তির ভাবে, কখন গভীর শান্তির ভাবে, স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত করে' তোলে। নতুবা, তুমি যে-রকম বর্ণনার কথা বলেছ সেরকম বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। ভাষা কখনই রেখাবর্ণময় চিত্রের মত অমিশ্র অবিকল প্রতিরূপ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, যেমন-তেমন লেখকের যেমন-তেমন বিশেষত্বই যে আমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি তা নয়। মনে কর, পথ দিয়ে মস্ত একটা উৎসবের যাত্রা চলেচে। আমার এক বন্ধুর বারান্দা থেকে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখ্‌তে পাই, আর এক বন্ধুর বারান্দা থেকে বৃহৎ অংশ এবং প্রধান অংশ দেখ্‌তে পাই—আর এক বন্ধু আছেন তাঁর দোতালায় উঠে যে দিক থেকেই দেখ্‌তে চেষ্টা করি কেবল তাঁর নিজের বারান্দাটুকুই দেখি। প্রত্যেক লোক আপন আপন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের এক একটা দৃশ্য দেখ্‌চে—কেউ বা বৃহৎভাবে দেখ্‌চে, কেউবা কেবল আপনাকেই দেখ্‌চে। যে আপনাকে ছাড়া আর কিছুই দেখাতে পারে না সাহিত্যের পক্ষে সে বাতায়নহীন অন্ধকার কারাগার মাত্র।

কিন্তু এ উপমায় আমার কথাটা পুরো বলা হল না, এবং

ঠিকটি বলা হল না। আমার প্রধান কথাটা এই—সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্চে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্য্যাস্তকে তিন রকম ভাবে দেখা যাক্। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত, চিত্রের সূর্য্যাস্ত, এবং সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্য্যাস্ত হচ্চে, নিছক্ সূর্য্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্য্যাস্ত হচ্চে কেবল সূর্য্যের অন্তর্ধানমাত্র নয়, জলস্থলআকাশমেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে' সূর্য্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্য্যাস্ত হচ্চে সেই জলস্থল-আকাশমেঘের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে' দেখা; কেবলমাত্র সূর্য্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্ম্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে' প্রকাশ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে' একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জ্বল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; তেম্‌নি জগতের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা দান করে' একটা নূতন কাণ্ড করে' তুলি; অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অমর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি; এবং তখনি সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত সর্ব্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকল প্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কার-রূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্ম্মল করে' দেখাতে পারে।

সুইজর্‌ল্যাণ্ডের শৈলসরোবর-সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বল্‌তে পার সেখানকার উদয়াস্ত কিরকম অনির্ব্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেইরকম আছে। বড় বড় লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিষকে এমন করে' প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের কতখানি বিশ্বের কতখানি প্রতিবিম্বের নির্দ্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে' দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কুণো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব, লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' না ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আপনার জীবনের দশদিক্ উন্মুক্ত করে' নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে' নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই জন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বা'র করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘরগড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করচে সেটি হচ্চে লেখকের মর্ম্মস্থান—অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তার একটা বিশেষত্ব খুঁজে বা'র করা কঠিন এই জন্যে, যে,

তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে' তুলেচেন তাকে দুটি চারটি সুসংলগ্ন মত-পাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এই জন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।

কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে—কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মত অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই; সাক্ষাৎ ভাবে, বা পরোক্ষ ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষটিকেই চাই। তাঁর হাসি চাই, তার কান্না চাই, তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মত।

কিন্তু, এই হাসি কান্না অনুরাগ বিরাগ কোথা থেকে উঠ্‌চে! ফল্‌ষ্টাফ্‌ ও ডগ্‌বেরি থেকে আরম্ভ করে' লিয়র্‌ ও হ্যাম্‌লেট্‌ পর্য্যন্ত শেক্সপিয়র্‌ যে মানবলোক সৃষ্টি করেচেন, সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসিঅশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারো অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তা এবং খুচ্‌রো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্সপিয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি নভেলে যা বর্ণিত হয়েচে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে শেক্সপিয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি নভেল যতই চিত্রবিচিত্র করে' রচিত হোক্‌, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক্‌, শেক্সপিয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি

নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেক্সপিয়রে বর্ণিত প্রতিদিনদুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্সপিয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্য্যন্ত আলোড়িত করে' শেক্সপিয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে' দিয়েচেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্চে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে' কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করচে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মত অবাধে ঝরে' আসচে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মত প্রমোদে ফেটে পড়চে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গোটিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্চে ঠিক এর বিপরীত। গোটিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেচেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখ্‌তে পাইনে। যে সৌন্দর্য্য মানুষের ভালবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য্য ভালবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্য্যকে অবারিত করে' দেয়—মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্য্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠ্‌চে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে' তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন, সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক্ ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এই জন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ

স্বীকার্য্য, যে, প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাক্‌লেও সাহিত্য হয় কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ কিন্তু বীজ গাছ নয়।

আমার পূর্ব্বপত্রে এ কথাটাকে বোধ হয় তেমন আমল দিই নি। তোমার প্রতিবাদেই আমার সমস্ত কথা ক্রমে একটা আকার ধারণ করে' দেখা দিচ্চে।

কিন্তু যতই আলোচনা করচি ততই অধিক অনুভব করচি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুক্‌রো সাহিত্য তুলে নিয়ে বল, এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে' দেখ, তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোন অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হুহু করে' চলে যাচ্চে; তার সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাক্‌চে না কেবল সাহিত্যে থাক্‌চে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্ব্বের সহিত রক্ষা করে।

আমার এক একবার আশঙ্কা হচ্চে তুমি আমার উপর চটে' উঠবে—বল্‌বে, লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না। আমি বাড়িয়ে কমিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল নিজের মতটাকে নানা রকম করে' বল্‌বার চেষ্টা করচি; প্রত্যেক পুনরুক্তিতে পূর্ব্বের কথা কতকটা সম্মার্জ্জন পরিবর্ত্তন করে' চলা

যাচ্চে—তাতে তর্কের লক্ষ্য স্থির রাখা তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্চে। কিন্তু তুমি পূর্ব্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠ্‌তে পারলে আমি জোর পাইনে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন কবচ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্চে।—তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোন একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়—অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্ত্তে হাইরোগ্লিফিক্স্ ব্যবহারের মত। কিন্তু এরকম্ রচনা-প্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে' প্রতিনিধি দ্বারা ব্যক্ত করা। এ রকম করলে যুক্তিসংসারের আদানপ্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক্, আগে থাক্‌তে দোষ স্বীকার করচি তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

তুমি লিখেচ, আমার সঙ্গে এ তর্ক তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও। তা হলে আমার পক্ষে ভারি মুস্কিল। তা হলে কেবল টুক্‌রো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে' যায় কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি? এই জন্যে তর্ক উপস্থিত হলে বিনা নুটিশে অকস্মাৎ কাউকে ডাক্ দিয়ে

সাম্‌নে তলব করতে পারিনে—নামও জানিনে, চেহারাও চিনিও নে। লেখবার একটা সুবিধে এই যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়, লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে' যাওয়া যায়—নিজের সঙ্গে নিজের নূতন পরিচয়ে প্রতি পদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে। সেই নূতন আনন্দের আবেগে লেখা অনেক সময় জীবন্ত ও সরস হয়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও আছে। কাঁচা পরিচয়ে পাকা কথা বলা যায় না। তেমন চেপে ধরলে ক্রমে কথার একটু আধটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। চিঠিতে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্ত্তন করবার সুবিধা আছে। প্রতিবাদীর মুখের সাম্‌নে মতিস্থির থাকে না এবং অত্যন্ত জিদ্ বেড়ে যায়। অতএব মুখোমুখী না করে' কলমে কলমেই ভাল।

ধর্ম্মজঙ্গল।

নব্য হিন্দুর এক প্রধান সমস্যা ধর্ম্ম। এক দিকে পুরাতন শাস্ত্রবিধি—নানা মুনির নানা মত, নানা গুরুর নানান্ টীকা, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নানা সময়ের স্তূপাকার বিধি এবং বিধানের দুর্ভেদ্য রহস্য; একদিকে প্রচলিত লোকাচার—হিঁদুয়ানির সহস্র নির্দ্দিষ্ট এবং অনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান, খাওয়া পরা শোওয়া বসা, ওঠা নামা, হাঁচি কাশির বিবিধ উপদ্রব; আর একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন জ্ঞানালোকে নূতন ভাব, নূতন বিশ্বাস এবং নূতন কর্ত্তব্যের উত্তেজনা। এই তিনের

মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করা মহা দায়। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেয়, লোকাচার আবার স্বতন্ত্র বিধান জারি করে, এবং ইংরাজী শিক্ষা যে পথ নির্দ্দেশ করে তাহা অনেক সময়েই লোকাচারের বিশেষ বিরোধী এবং শাস্ত্রকেও যে সর্ব্বত্র সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলে এমন বলা যায় না। সুতরাং নব্য হিন্দুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শিক্ষাগুণে তিনি পাশ্চাত্য ভাবে দীক্ষিত, সমাজের ভয়ে লোকাচার পালন করেন এবং তর্কস্থলে কেবল আর্য্যমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য জানাশুনা বচন পাইলে তাহা লইয়া সঘনে মুখনাড়া দেন। কতটুকু কি মানিলে এবং কতটুকু কি করিলে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ পালন করা হয় এবিষয়ে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ড বিধর্ম্মীরই মত।

সে জন্য কিন্তু নব্য হিন্দুকে দোষ দেওয়া চলে না। কি করিলে না করিলে হিন্দুধর্ম্ম পালন কিম্বা লঙ্ঘন করা হয় বলা বাস্তবিকই বড় শক্ত। মুসলমান কিম্বা খৃষ্টধর্ম্ম যেরূপ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে কতকগুলি মূল বীজে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করাই মুসলমান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র; যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করার উপরেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা; হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসের এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি নাই। নানাবিধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিরোধী মত ও বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, কাব্য দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল যাহা কিছু কোন কালে এদেশে উদ্ভূত হইয়াছে কিম্বা বিদেশ হইতে আসিয়া কালক্রমে এদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই নিঃশব্দে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার

দুই সম্পূর্ণ বিরোধী মতের গতি বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে। নিরীশ্বরবাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নহে এবং দেবোদ্দেশে ক্রমাগত জীবহিংসা করিয়া অহিংসা সাধন হয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট মূল মত বা বিশ্বাস নাই। ঋষিরা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন—তাঁহারা সেই সকল চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন, বলপূর্ব্বক সব ঋষিকে এক গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরাও তৎকার সুবিধামত যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন যাবতীয় প্রাচীন ঋষিবাক্যের সহিত তাহার ঐক্য হইবার কথা নয়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনো কিছু ছিল না—এবং পরে পরে পাঁচ জনে সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ব্যাখ্যাও করেন নাই।

কেবলি যে কোনও মূল ধর্ম্মমত কিম্বা বিশ্বাসের কোনরূপ আঁটাআঁটি নাই তাহা নয়, আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ মাংসাশী, পশ্চিমী ব্রাহ্মণের আমিষসংস্পর্শ নিষিদ্ধ এবং এ নিষেধ অবহেলা করিলে অবিলম্বে জাতিচ্যুত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণ পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গলার শক্তিউপাসকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের পানদোষদৃষ্টান্তও বিরল নহে, কিন্তু পলাণ্ডুভক্ষণ কিম্বা মদ্যপানে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সদ্য জাতিনাশ হয়। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দাম্পত্য ছিন্ন করিয়া পত্যন্তরগ্রহণও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন নানা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান—কোনটির সহিত কোনটির বড় মিল নাই। এ সকল আচার-

ভেদকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ, এই আচারভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে আহারব্যবহার আদান-প্রদান সম্বন্ধে যত বাধা এবং সকল প্রকার আত্মীয়তার পথ একেবারে বন্ধ।

কিন্তু আদানপ্রদানের পথ বন্ধ কেবলি কি আচারভেদ নিবন্ধন? না, জাতিবৈরী, গ্রাম্য দলাদলি এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে? রাঢ়ী বারেন্দ্র, কুলীন বংশজ, কুলমেল হেন-তেন এ সকলেও ত আমাদিগকে পরস্পর হইতে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা এ দেশের মাটির গুণ বলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম একদিকে যেমন ঢিলেঢালা আল্‌গা—মত ও বিশ্বাসের বাঁধাবাঁধি নাই, বিরোধী অনুশাসন এবং আইনকানুনের মধ্যে ভেদাভেদ নাই, কেবলি শাস্ত্রে অশাস্ত্রে লোকাচারে অনাচারে গোঁজামিল; আর একদিকে তেমনি বজ্রআঁটুনি, স্তরে স্তরে নানারকমের জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, কুলে কুলে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। মুসলমান অথবা খৃষ্টান ধর্ম্ম যেমন বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে এক বৃহৎ মণ্ডলীর মধ্যে আনিয়া এক করিয়া ফেলিতে চায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মণ্ডলীগঠন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ভেদবুদ্ধি ইহার স্বাভাবিক।

প্রচার ত হিন্দুধর্ম্মের ভাব নয়, সুতরাং মণ্ডলীগঠনের আমাদের আবশ্যকও হয় নাই। আর দেশব্যাপী সুবৃহৎ এক ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপনের পক্ষে আমাদের কতকগুলি বাধাও ছিল। ভারতবর্ষ চিরদিনই সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগ অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিত্য ঝগড়া

বিবাদ যুদ্ধহাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। এ অবস্থায় একটা রীতিমত ধর্ম্মগঠন অসম্ভব। তবে এখন যে আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া পড়িয়াছি সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া—ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে সকল বিষয়ে যে একটি প্রণালীবদ্ধ বৃহৎ সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে প্রাচীনকালের সমাজ ও ধর্ম্মে এই ভাব আরোপ করিয়া একটি মানসী প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলিতেছি মাত্র। এবং নব্য হিন্দুধর্ম্মকে এই মানসী প্রাচীনেরই বংশধর ঠাহরাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যেন সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ধর্ম্ম, এক-মত, এক-বিশ্বাস—এবং এই বিপুল জনসমাজ যে ধর্ম্মবন্ধনে পরিচালিত তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত আমাদের যাহা কিছু ঐক্য ঐ যাবনিক হিন্দু নামটায়। হিন্দু বলিলে আমরা প্রথমতঃ ভারতবাসী বলিয়া বুঝি, দ্বিতীয়তঃ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী নয় বলিয়া জানি, তৃতীয়তঃ পিতামাতা যে হিন্দু তাহার পরিচয় পাই। মনের এক কোণে জাতিভেদের একটু ছায়াও আসিয়া পড়ে। এবং ব্রাহ্মণ্যের সহস্র বিরোধী বিধানের মধ্যে যে কোন গুটিকতকের প্রভাব অনুমান করি। কিন্তু জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে প্রাচীনকালে মধ্যে মধ্যে যে সকল ধর্ম্মান্দোলন গিয়াছে তাহাও এখন হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চৈতন্য প্রভৃতি সংস্কারকেরা অবতারের মত সম্মানিত হয়েন। এমন কি, যে বুদ্ধদেবের প্রভাবে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মণ্য একেবারে নির্ব্বিষ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত জাত্যভিমান ও মিথ্যা দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল সে বুদ্ধদেবও আমাদের একজন অবতার মধ্যে গণ্য। শুধু তাই

বিশেষ লক্ষণ। এবং সেই জন্যই জাতিভেদ আমাদের ধর্ম্মের সহিত এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে রক্তচলাচল বন্ধ। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দিকে আমাদের যত ঝোঁক। দেবতা তেত্রিশ কোটি এবং ইহার উপরে প্রতিদিন দু' দশটি করিয়া বাড়িতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেবকদিগের মধ্যে দলাদলি। শৈব বৈষ্ণব দেবতার নামে ছড়া বাঁধিয়া গালি দেয়, বৈষ্ণব খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবের যত অপকর্ম্ম বাহির করে, আবার শাক্ত শৈবের মধ্যেও বনিবনাও হয় না। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, স্ত্রীদেবতার প্রতি ধনপতি সওদাগরের বিরাগের কথা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আবার ছোটখাট অনেক অজ্ঞাতকুলশীল দেবতা আছেন, ভক্তেরা স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এবং এরূপ অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দেখা যায় যে, মনস্কামনা সিদ্ধিপক্ষে সত্যপীর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনসা দেবী অনায়াসে মহেশ্বরকে লঙ্ঘন করিয়া যাহাকে তাহাকে কালিন্দীসহোদরসদনে চালান দিতে পারেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন জাগ্রত দেবতার পরিচয় শুনা যায়। গ্রামের লোকেরা অনেক বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করে। ও-পাড়ায় মনু বুড়ী এতদিন বাঁচিয়া বাঁচিয়া একানব্বই বৎসর বয়সে যেই ইহলীলা সাঙ্গ করিল, বৎসর না যাইতে এ-পাড়ার নবীন ঘোষের গৃহিণী পুত্রশোকের মর্ম্মঘাতী বেদনা অনুভব করিলেন; লোকে সন্ধান পাইল মনু বুড়ী নিতান্ত যে-সে নয়, নবীন ঘোষের বাড়ীর ঈশান কোণে আমড়াতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমড়াবনের পাশে পুকুরপাড়ে ওলাদেবীর বাস, মনু ওলাদেবীর কেহ হয়।

অতএব ওলাদেবীর মত মনু বুড়ীরও সেবার বিধানাদি করিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। এইরূপে মনুঠাকুরাণী ওলা মনসার দল বৃদ্ধি করিলেন। জেনেরাল নিকলসন সিপাহী-দের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন—তাহারা তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। আর সন্ন্যাসী ফকির মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি ত নিত্য ঘটনা। এইরূপে পুরাতন ও নূতন দেবদেবীতে আর স্থান সংকুলান হয় না। দেবতাদিগের মধ্যেও নানা জাতি এবং বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, এমন কি, কদাচ কখনো মুসলমান এবং খৃষ্টান পর্য্যন্ত। এইখানে বলা ভাল, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুরূপী দেবতারও মধ্যে মধ্যে নাম শুনা যায়। এবং অনেক সময় ভূতপ্রেত হইতে এই সকল দেবতার অভিব্যক্তি।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল সময় এই সকল দেবতাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন তাহা নয়—দেবতার আবির্ভাব কখন্ কোথায় হয় বলা ত যায় না—তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তা' ভূতো বাগ্‌দীই কে জানে আর হারু চণ্ডালই বা কে জানে! তবে ঘণ্টা নাড়িবার বেলায় একটা ব্রাহ্মণ চাই বটে। কারণ, শূদ্রসংস্পর্শে দেবতার দেবত্বনাশ হইতে আটক নাই। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ জুটিতে বিলম্ব হয় না। এবং ঘণ্টানাড়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরাও এই অনার্য্য দেবতার চরণে ফুলচন্দন ও একটি করিয়া প্রণাম পাঠাইয়া ধন্য হয়েন।

অনার্য্য দেবতা বলিলাম বলিয়া এখানে হয়ত কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, হিন্দুধর্ম্মকে অনেকে সম্পূর্ণ আর্য্য বলিয়া মনে করেন এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত ইহাকে এক ঠাহরান। কিন্তু হিন্দু এবং আর্য্যে অনেক তফাৎ। আর্য্য বলিতে কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীকেই বুঝায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য;

হিন্দু আর্য্যে অনার্য্যে, উচ্চ নীচে,নানা বিরোধী জিনিষের সম্মিশ্রণের ফল। হিন্দু কেবলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে আবদ্ধ নয়, হাড়ি বাগ্‌দী ডোম চামার ভারতের অধিবাসী যে কেহ স্পষ্টতঃ মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান নয় সেই হিন্দু। এবং ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হইলেও হিন্দুধর্ম্মগঠনে এই সকল নানাবিধ নিরক্ষর লোকদিগের কল্পনার কম প্রভাব নহে। এবং সে প্রভাব উন্নত ব্রাহ্মণদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। মাঝিমাল্লারা বিপদ্ নিবারণের জন্য বিশালাক্ষির দহে পয়সা ফেলিয়া দেয়। দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও নৌকা করিয়া যাইবার সময় উক্ত স্থানে বিশালাক্ষি দেবীর উদ্দেশে তাম্রমুদ্রা নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছেন এবং শূন্যে প্রণাম ঠুকিয়া মনে মনে বলেন, হে মা বিশালাক্ষি, এ যাত্রা রক্ষা কর, যেন বাড়ী গিয়া গৃহিণীর মুখচন্দ্র দেখিতে পাই, আবার যখন এখান দিয়া যাইব তোমার জন্য আবার এমনি করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিব। মুসলমানের দেখাদেখি অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণেরা সিন্নি দিয়া পীরকে সন্তুষ্ট রাখেন। এ সকল দেবতা উপদেবতা যে ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রসূত নহে তাহা ত আর চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে হইবে না। এবং ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মগঠনে নিম্নশ্রেণীর প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সংহত ধর্ম্মগঠনে এক করিতে চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা আপনমনে ধ্যানধারণা করিতেন এবং আপন উন্নত আদর্শে আপনাকে গঠিত করিতেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে আদর্শে কখনও পৌঁছে নাই, এবং সাধারণের পক্ষে সে আদর্শ দুর্গম বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণকে সে বিষয়ে উপদেশও দিতেন না। জ্ঞানধর্ম্মে অগ্র-

সর বলিয়া সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের সহিত সর্ব্বত্র যোগ রক্ষা করিতে পারিল না, তখন সহস্র প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া বংশগুণে ব্রাহ্মণই সেইসকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। এই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রভাব। নহিলে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম সাধারণ্যে কখনও প্রচলিত হয় নাই—এবং ব্রাহ্মণের প্রভাব ঠিক খৃষ্টান পাদ্‌রীর মত নহে। বংশগৌরবে দেবত্বের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এবং ইহা হইতেই তাঁহার অমর প্রভাব।

কিন্তু এ কথা মানিতে হয় যে, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের মূল ব্রাহ্মণ। এবং সাধারণের প্রভাব যেমন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়াছে ব্রাহ্মণের প্রভাব তেমনি সাধারণের ধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে গঠন দিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যোগ ঠিক কোন্‌খানটায় এবং বিচ্ছেদই বা কোথায় এখন নির্ণয় করা কঠিন। কালসহকারে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নিঃশব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে এবং প্রচলিত সহস্র সংস্কার আত্মসাৎ ও পরিপুষ্ট করে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে নামিয়া আসিয়া সাধারণের উপযোগী অনেক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এবং সে সকল বিধি ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজের উপরেও ফলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম সকলই;—ব্রাহ্মণেতর নানাবিধ উপধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের সম্মিশ্রণ হিন্দুধর্ম্ম; অমিশ্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম; এবং যে সকল অপধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের ছায়াও মাড়ায় নাই তাহাও

হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বেখা টানা চলে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি কি, তাহা এতক্ষণে বোধ করি কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এবং কোনপ্রকার শৃঙ্খলার যে এখানে কিরূপ অভাব তাহা বুঝিতেও কাহারো বড় বাকি নাই। হিন্দু দেবচরিত্র আলোচনা করিলে এ অভাব আরও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। তেত্রিশ কোটির অধিক দেবতা হইলেও একই দেবচরিত্রের এরূপ অসঙ্গত বিরোধী বর্ণনা দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এবং একই দেবতার নানা বিরোধী উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-প্রকার নৈতিক একতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এক কৃষ্ণকে কতজনে কতভাবে দেখে—কেহ রূপকহিসাবে, কেহ অবতার-হিসাবে, কেহ পূর্ণব্রহ্মহিসাবে, কেহ আদর্শ মনুষ্যহিসাবে; এবং এই হিসাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। কৃষ্ণলীলা যাহারা কেবলমাত্র রূপকহিসাবে গ্রহণ করে এবং যাহারা ইহার পার্থিব অনুকরণকেই মুক্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে নীতিবিষয়ে ঐক্য হইবার কথাও নয়। কৃষ্ণের নামের চারিদিকে নানা রসের গল্প জুটিয়াছে—এই সকল গল্পের নায়করূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকসম্প্রদায়ের নীতি গঠন করেন। মহাদেবও একদিকে অসাধারণ সংযমী যোগীপুরুষ—ভোগসুখের মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ; অন্যত্র নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া এবং কুচনীপাড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এক মহাদেবের দুইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক প্রভাব। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উভয় ভাবে এই সকল দেবচরিত্রের কিরূপ প্রভাব যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন,

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন। আর মিথ্যাচরণে কাপট্যাবলম্বনে এবং যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের দেবগণ কিরূপ পটু তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইলে সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান এবং অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত রাশীকৃত গ্রন্থের উপর নিশ্চিন্ত মনে বরাত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত দেব-চরিত্র চরিত্রহীনতার আদর্শ। এবং নবাবী যথেচ্ছাচারিতাই দেবতাদিগের ক্ষমতার একমাত্র পরিচয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি যতই সংযম সাধনের উপদেশ দিয়া মরুক্ না কেন, এইসকল প্রবল আদর্শ আমাদিগকে সংযমসাধনের পথ হইতে নিরাপদ দূরে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের এইরূপ বহুরূপী বিশৃঙ্খলা বোধ করি অনেকাংশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের সহিত জড়িত। এক বৃহৎ সংহত শাসনতন্ত্রের অধীনে সমস্ত দেশ যখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিবার অবসর পায় তখনই প্রায় ধর্ম্ম লইয়া জাতির হৃদয়ে একটা আন্দোলন উঠে এবং সুবৃহৎ সংহত ধর্ম্ম-গঠনের এই সময়। নহিলে, চতুর্দ্দিকের অশান্তি উপদ্রবে লোকের মন যখন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকে তখন সুশৃঙ্খলে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত জাতীয় ধর্ম্মসংগঠনের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ প্রথম দৃষ্টিতে কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার অনুকূলে যখন রীতিমত ঐতি-হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আর এ যোগ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজনৈতিক অশান্তির সহিত রোমের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থাও বিশৃঙ্খল ছিল—আমাদেরই

মত নানা দেবতা উপদেবতা, কোনটির সহিত কোনটির বড় ঐক্য নাই, রোমানেরা মনের নানা প্রবৃত্তিকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিত, ভাল মন্দ বিচার ছিল না, স্বর্গ নরক গায়ে গায়ে, মুড়ি মিছরি একদর। রাজনৈতিক শান্তি এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মগঠন প্রায় একসঙ্গেই আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইংরাজশাসনের শান্তিতে জাতীয় ধর্ম্মগঠনের ভাবের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছে। এবং প্রাচীনকালেও আমাদের অদৃষ্টে একবার এই শুভ অবসর জুটিয়াছিল। অশোক তখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—তাঁহার প্রবল প্রতাপে সমস্ত ভারত এক-ছত্র। রাজনৈতিক অবস্থা শান্তিময় এবং জাতীয় ধর্ম্মগঠনের অনুকূল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম এবং অশোক একজন পরম বৌদ্ধ। অল্পদিন মধ্যে হুহু করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া আমাদের মজ্জার মধ্যে বসে নাই—বসিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষ বহু-দিন একছত্র রহিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল। শিথিল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বৌদ্ধ আন্দোলনের বৃহৎ সংহত সুশৃঙ্খলা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার ছোটখাট রাজ্য উপ-রাজ্য এবং অনির্দ্দিষ্ট সহস্র বিশ্বাস উপবিশ্বাসের অরাজকতায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

এই অরাজক অবসরে চারিদিক হইতে যে নূতন বহুরূপী ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল তাহাই এই নব্য হিন্দুধর্ম্মের জননী। এবং সেই অবধি হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল—যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে নানা রকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা—কোথাও পথ দেখা যায় না—এবং এতদিন পথের সন্ধানও কেহ

করে নাই। সূর্য্যালোক নাই—দিক্‌নির্ণয়শলাকা নাই—ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে ইহাদ্বারাই যদি কালে এই বিপুল ধর্ম্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়—এবং এই ঘন নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয়—সেই একমাত্র ভরসা।

বঙ্কিমচন্দ্র।

হিন্দুর এ হীন গৃহ চির স্বর্গময়
হিন্দু রমণীর যেই নিষ্কাম জীবনে,
আজীবন পালে হেথা রমণীহৃদয়
যে নিত্য সাবিত্রী-ব্রত পতির চরণে,
কবিতার আদি গুরু অমর ভাষায়
যে পরম নারীধর্ম্ম শুনাল ধরায়,
সেই অমৃতের ছবি আঁকি পুনরায়
ঘরে ঘরে ও লেখনী অমৃত বিলায়;
বিষবৃক্ষ মাঝে চির অমৃতবল্লরী
তোমার ও সূর্য্যমুখী যেন মূর্ত্তিমতী
পতিসেবা, কায়মনে বিক্রীত কিঙ্করী
পতিদেব-দেবালয়ে, পতি মুক্তি গতি;
পতি-ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে পতি-সন্ন্যাসিনী
পবিত্র এ গৃহাশ্রমে হিন্দুর রমণী।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সচেতন ও অচেতন আত্মা।

শরীর ও মনের পরস্পরের সহিত যোগাযোগ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক পণ্ডিত অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সকল বিষয়েই একত্ববাদ উত্তরোত্তর অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একত্ববাদীদিগের মোট কথা এই যে, শরীর ও মন ভিন্ন পদার্থ নহে, উহারা এক—কেবল এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র। একই পদার্থকে এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বস্তু বলি, অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে মন বলি। এইরূপ অনুমানের সহিত কাহারও বিবাদ না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শরীর মনের সম্বন্ধ মনে ধারণা করিবার যে বিশেষ কোন সহায়তা হইল তাহা বলা যায় না। এমন কি, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ, যাঁহারা বিশ্বের সকল বিষয়েই সম্বন্ধ বাহির করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাও এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণয়ে বড় নারাজ। টিণ্ডাল বলিয়াছেন যে, বস্তু ও মনের যোগাযোগের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা বৃথা। সম্বন্ধ যে আছে তাহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু যোগবন্ধনটি কি প্রকারের আমরা কিছুই জানি না। অবশেষে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে অতি প্রাচীন দার্শনিকদিগের সময়ে এই রহস্যটি যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল এখনও ঠিক তদ্রূপ। হক্স্‌লি বলিয়াছেন যে আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে জিনের আবির্ভাব এবং ভৌতিক পরমাণুর কম্পন হইতে মনের উৎপত্তি দুই সমান আশ্চর্য্য ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু মনিষ্ঠ পত্রিকার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক ফ্রান্‌সিস্‌ রাসেল এইরূপ নৈরাশ্যের কারণ

দেখিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে আজকাল দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রসকলের যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইবার কথা।

যাহা জানা আছে তাহার সহিত অজানা বিষয়ের কোনরূপ তুলনা করিতে পারিলে—কোন প্রকার সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিলে তবেই উহাকে ধারণা করিবার সুবিধা হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের আয়ত্ত করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। লেখক মহাশয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, নূতন তত্ত্বানুসন্ধানের এই প্রথম সোপানের ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন না। তিনি তাড়িৎশক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত অনুমানের সহিত বস্তু এবং মনের একটি তুলনা দিয়া, বস্তুর ক্রিয়া দ্বারা মনের প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টরূপ ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এতদিন তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রচলিত ছিল না। ইহারা যে, পরমাণুর চালনা-উদ্ভূত তাহা বহু পূর্ব্বেকার তাড়িৎযন্ত্র দেখিলেও বুঝা যায়, কিন্তু তখন ইহার অধিক কেহ জানিত না। সম্প্রতি ভৌতিক পরমাণু বিকম্পনের সহিত তাড়িৎশক্তির সম্বন্ধ কি প্রকারের তাহা অনুমিত হইয়াছে এবং এই অনুমান সম্বন্ধে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত এক মত। কিছুকাল হইল অধ্যাপক লজ্ এই বিষয়ে এক নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি যে, সর্ব্বব্যাপী ঈথরেরই ক্রিয়াবিশেষ তাহাতে কোনও বৈজ্ঞানিকের আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরে তিনি আরও সূক্ষ্মরূপে ঈথরের তাড়িতাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঈথরের দুই বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট উপাদান

আছে। ইহারা যতক্ষণ একত্রে থাকে ততক্ষণ কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়গোচর চিহ্ন দ্বারা স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে—যথা কোন বস্তুর পরমাণু চালনদ্বারা—ঈথরের এই দুই উপাদানকে পৃথক্ করা যায় তাহা হইলে ইহারা পরস্পরের প্রতি গমনেচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণদ্বারা তাড়িৎ-শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই ত গেল বিজ্ঞানের কথা। ইহার সত্যমিথ্যার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই। কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া বস্তুর সাহায্যে মনের কি উপায়ে প্রকাশ হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ঈথর যেমন সর্ব্বব্যাপী তেমনি একটি সর্ব্বব্যাপী আত্মা বিশ্বের সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। এই আত্মার দুই উপাদান অনুভূতি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই দুই উপাদান যখন এক হইয়া থাকে তখন পরস্পরকে তৃপ্ত রাখে—কোনরূপ চেতনার উদ্রেক হয় না, কিন্তু জীবিত স্নায়বীয় পদার্থের কম্পিত পরমাণুর সংস্পর্শে এই দুই উপাদান বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় উহাদের যে মিলনেচ্ছা জন্মে তাহাকে আমরা চেতনা বলিয়া অনুভব করি। উপাদানদ্বয়ের ন্যূনাধিক বিচ্ছেদে চেতনার তারতম্য আমরা প্রতিদিনকার ছোট ঘটনায় দেখিতে পাইতে পারি। আমাদের যে সময়ে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা নাই, আহার মনের মত হইয়াছে, শরীরের যেটুকু ক্লান্তি জন্মিয়াছে তাহা সুকোমল শয্যা এবং মৃদুমন্দ বাতাসে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতেছে, সে সময়ে আমরা সচেতন থাকি কি অচেতন থাকি বলা ভারি শক্ত। অপর পক্ষে যখন অবস্থা এইরূপ যে "পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু"—যে অবস্থা অনুভব করিতেছি বাসনা

তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটিতেছে তখন যে আমরা পূর্ণ-মাত্রায় সচেতন তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মনিষ্টের লেখক মহাশয় ভরসা করিতেছেন যে জীবনের সকল অবস্থার সহিত মিলাইয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে বা এইরূপ কোন সহজ-বোধ্য অনুমানকে যদি স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে শরীর মনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে কাহারও ধাঁদা লাগিয়া যাইবার কোন কারণ ঘটিবে না।

আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেণলজি।

আমাদিগের যেমন যুগল পদ, যুগল হস্ত, যুগল চক্ষু, যুগল কর্ণ, সেইরূপ আমাদিগের মস্তিষ্কও যুগল। মস্তকের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক দুই সমান অংশে বিভক্ত—একাংশ বিনষ্ট হইলেও অপরাংশে কাজ কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। দুই অংশ অক্ষত থাকিলে কাজ যতটা ভাল রকমে চলে একটির দ্বারা অবশ্য সেরূপ চলিতে পারে না। সমস্ত মস্তিষ্কপিণ্ড একপ্রকার সাদা পদার্থে গঠিত; তাহার উপরিভাগে যেন একটা ধূসর পদার্থের পাত্‌লা প্রলেপ বিদ্যমান। মস্তিষ্কের এই ধূসর অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে উহা বিচিত্র আকার-বিশিষ্ট স্নায়ু-কোষের সমষ্টি মাত্র; ঐ প্রত্যেক স্নায়ু-কোষের সহিত দুই চারিটি করিয়া সূক্ষ্ম স্নায়ু-সূত্র সংযুক্ত এবং অভ্যন্তরস্থ শুভ্র পদার্থটি নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ু-সূত্রের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র অতি সূক্ষ্ম ও উহাদের জাল-বিস্তার অতীব জটিল। এই স্নায়ু-কোষগুলি একপ্রকার শক্তির আধার-

স্বরূপ এবং স্নায়ু-সূত্রগুলি ঐ শক্তির বাহক-স্বরূপ। মোটামুটি-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিদ্যুৎপদার্থ উৎপন্ন হইয়া যেরূপ তার-যোগে অন্যত্র প্রবাহিত হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তর-প্রদেশে দুইটি বড় বড় স্নায়ু-পিণ্ড আছে যাহাকে ইংরাজিতে "গ্যাংলিয়ন" বলে—একটির নাম "অপ্‌টিক থ্যালামস" আর একটির নাম "কর্পস্ ষ্ট্রায়াটম্"। এই স্নায়ুপিণ্ডদ্বয় উপরিস্থ ধূসর প্রলেপের সহিত স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা সংযুক্ত। উহারা স্নায়ু-শক্তির উৎপাদন, পুঞ্জীকরণ, ও বণ্টনের প্রধান কেন্দ্র-স্থল।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন পাক-চক্র ও বিবিধ অংশের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে একস্থানে কোন উৎপাৎ উপস্থিত হইলেই তাহার ফল দূরবর্ত্তী অংশেও পৌঁছিয়া থাকে। মস্তিষ্ক যে দুই অর্দ্ধাংশে বিভক্ত—সেই দুই অর্দ্ধাংশ স্নায়ু-সূত্রগঠিত একটা চৌড়া পটির দ্বারা সংযুক্ত। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের পশ্চাতে আবার একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আছে—ইহারও প্রধান উপাদান স্নায়ু-কোষ ও স্নায়ু-সূত্র।

মস্তিষ্কের গঠন কিরূপ মোটামুটি তো একপ্রকার বলা হইল। এখন দেখা যাক্, মস্তিষ্কের ক্রিয়াসকল কিরূপে সম্পন্ন হয়। ফ্রেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলেন যে, মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশ এক একটি বিশেষ মানসিক বৃত্তির আধার এবং কোন ব্যক্তির মাথার গঠন দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার বিশেষ প্রবৃত্তি কোন্ দিকে? তাঁহাদের মত কতদূর সত্য একথা এখানে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার মূলে যে কতকটা সত্য নিহিত আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। গল ও স্পুর্‌জৈম্ এই সত্যটি আবি-

ফ্রাঁব করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কেব প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র কাজ আছে—এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষায় তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। তবে, ফ্রেণলজিষ্ট-সম্প্রদায় মস্তিষ্কের যে যে অংশ যে যে প্রবৃত্তির আধার বলিযা নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত এখনকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতের ঐক্য হয় না।

গল ফ্রেণলজির মত জারি করিবার অনেক দিন পরে ফ্লুরাঁ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কোন পশুব মস্তিষ্কেব কোন অংশ সমগ্র মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সেই অংশের বিশেষ ক্রিয়া স্থগিদ হইয়া যায়। তাহাব পর বিক্ আবিষ্কার করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অনুভব-ক্রিযার প্রভাবে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাপ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর ফ্রিস্ ও হিট্‌সিগ্ একটা কুকুরের মাথার খুলি অনাবৃত করিয়া তাহার মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, মস্তিষ্কেব কোন কোন অংশ ঐরূপে উত্তেজিত করিলে তাহার বিপরীত দিকের দেহ নড়িযা উঠে। এই সময় হইতেই আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদের সূত্রপাত হয। তাহার পর ফেরিয়ার হর্সলি বাকের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরও অনেক আবিষ্কার করেন।

তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কের একটা ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছেন—দৃষ্টি-কেন্দ্র, শ্রুতি-কেন্দ্র, স্পর্শকেন্দ্র, ঘ্রাণকেন্দ্র, আস্বাদ-কেন্দ্র এবং পৈষিক গতি-কেন্দ্র প্রভৃতি কেন্দ্রস্থান মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে আছে তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মস্তিষ্কমণ্ডলের উপরিভাগ ও পার্শ্বে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা আত্মসম্ভ্রম, দৃঢ়তা, উপচিকীর্ষা, অনুচিকীর্ষা, বিস্ময়, আশা ও সৌন্দর্য্যানুরাগের বৃত্তি নির্দ্দেশ করেন তত্রস্থ ধূসর পদার্থের কোন হানি ঘটাইলে তাহার বিপরীত দিকের সমস্ত শরীরের পেশী-

সমূহ অসাড় হইয়া পড়ে এবং ঐ অংশ উত্তেজিত করিলে বিপরীত দিকের দেহস্থ পেশীসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মস্তিষ্কের ঐসকল অংশ হস্ত পদ, বাহু, মস্তক, মুখ ওষ্ঠ প্রভৃতির গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্র-স্থান। বাম-দিকের কপালের রগ—যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা নির্ম্মিমিৎসার স্থান নির্দ্দেশ করেন তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বাক্যোচ্চারণ-ক্রিয়ার গতি নিয়মিত করিবার কেন্দ্রস্থান। এই কেন্দ্রটি যাহার ধ্বংশ হইয়া যায় সে অভাষা (Aphasia) রোগে আক্রান্ত হয়। অভাষা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সব কথাই বেশ বুঝিতে পারে অথচ কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারে না। উহার নিকটস্থ আর একটি অংশ ধ্বংশ হইয়া গেলে লিখন-বিকার (Agraphia) উপস্থিত হয়—যে ব্যক্তি লিখনবিকারগ্রস্ত তাহার লেখা কেহ বুঝিতে পারে না। সে ব্যক্তির হস্তচালনা ক্রিয়া নিজের আয়ত্তে থাকে না। সুতরাং যাহা মনে করে তাহা কিছু লিখিতে না পারিয়া নানা-প্রকার হিজিবিজি আঁক পাড়িতে থাকে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা লোকাদর-স্পৃহা, বাস্তনিষ্ঠা, সখ্য, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের মতে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থান। কানের উপরিভাগে যেখানে ফ্রেণলজিষ্টেরা অর্জ্জনস্পৃহা ও জুজুগুপ্সার স্থান নির্দ্দেশ করেন উহা শ্রুতির কেন্দ্রস্থান। তাহার পর ঘ্রাণ, আস্বাদ এবং স্পর্শের কেন্দ্রসকল মস্তিষ্কের আরও নিম্নতর স্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে ফ্রেণলজি সম্বন্ধে কিছুই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না—কেন না তাঁহারা মস্তিষ্কের কোন অংশ উত্তেজিত করিবার সময় অন্য পার্শ্ববর্ত্তী অংশসকল দগ্ধ

করিয়া ফেলেন। মস্তিষ্কের সকল অংশের সঙ্গে যেরূপ যোগা-যোগ আছে তাহাতে একাংশ নষ্ট হইলে অন্য অংশের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ না হইতেও পারে—দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি সরলতর বৃত্তির ক্রিয়া হয় প্রকাশ হইতে পারে—তদপেক্ষা জটিলতর বৃত্তি প্রকাশ না হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

কপালের মস্তিষ্কে যে বুদ্ধিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা একরূপ স্বীকার করেন—কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তো এবিষয়ে তাঁহারা কোন বিশেষ ফল পান নাই। ফেণলজিষ্ট সম্প্রদায় বলিতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন ইহা বিশ্বাস করেন। ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া এইমাত্র দেখিয়াছেন কপালের রগদেশ উত্তেজন করিলে মনোযোগক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রশস্ত কপাল বুদ্ধির নিদর্শন বটে, কিন্তু শুদ্ধ কপালের মস্তিষ্কই যে বুদ্ধির স্থান তাহা নহে—মস্তিষ্কের বোধ-বাহক ও গতিবাহক যতগুলি প্রধান কেন্দ্রস্থান আছে, সকলের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রভাবে বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তবে কপালের মস্তিষ্ক যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কতকটা অভাব-পক্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, যে সকল জীবের কপাল-প্রদেশের মস্তিষ্কখণ্ড বিনষ্ট হইয়া যায় তাহাদের বুদ্ধি লোপ পায়। তাহারা অবাধে আহার করিতে পারে কিন্তু কোথায় তাহাদের খাদ্য তাহা জানিতে পারে না। যে কুকুরের এইরূপ কপালের মস্তিষ্ক বিনাশ পায় তাহার নিকট যদি একটা অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ কর তাহা হইলে সে অস্থি ধরি-বার জন্য আগ্রহের সহিত দৌড়িয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে থামিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারে না—হয়তো যেখানে অস্থিটি আছে তাহা ছাড়াইয়া কতদূর চলিয়া যাইবে।

জাপানী সভ্যতা।

এপ্রিল মাসের ফর্টনাইট্‌লি বিবিউ পত্রিকায় জাপানী ব্যবহার সম্বন্ধে পিগট্ সাহেবের একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জাপানীদের যথার্থ আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্যবোধের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর এই অতি দূরপ্রান্তবর্ত্তী "অসভ্য" দেশের নিকট হইতে বলদৃপ্ত সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের শিখিবার এখনও কত কি আছে তাহাই দেখাইয়াছেন।

জাপানী আর্টের প্রশংসা এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বেও দু'একজন আর্ট-সমালোচক এমন কথা বলিয়াছেন—এবং য়ুরোপের উপরে ইহার প্রভাব যে সভ্যতাবর্দ্ধক ও উন্নতিকর এ কথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তাই বলিয়া সকল আর্টেই যে জাপান য়ুরোপকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য নয়। চিত্রবিদ্যার য়ুরোপে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে জাপানে ততদূর হয় নাই। জাপানী চিত্রকরের রচনায় ছায়া আলোকের সেরূপ পরিপাটি সন্নিবেশ দেখা যায় না। কিন্তু দুই চারিটি সূক্ষ্ম রেখাপাতে আর্টিষ্টিকতার যথেষ্ট পরিচয়। সুন্দর জিনিষকে সুন্দররূপে কেমন করিয়া ফুটাইতে হয় জাপানীরা তাহা বেশ বুঝে।

জাপানী আর্টের গৌরবই এই। কোথায় একটুখানি কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা দেখায় ভাল—একটি রেখা টানিলে অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়—একটু কারুকার্য্য করিলে চরম খোলতাই হয় জাপানীরা ঠিক ধরিতে পারে। জাপানী দোকানের একখান সামান্য পাখায়, একটা চারগণ্ডা পয়সার কাগজচাপায়, একটা যে-কোন-কিছুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানীদের মত দৈনন্দিন সামান্য ব্যবহার্য্য জিনিষেও সৌন্দর্য্য রক্ষা করার দিকে আমাদের কোন মনোযোগ নাই—কাজ চলিয়া গেলেই আমরা সন্তুষ্ট, মোটা তালপাতার পাখাই হোক্, গোলপাতার ছাতাই হোক্—দেখিতে ভালমন্দে আমাদের বড় যায় আসে না।

কিন্তু জাপানীরা সকল জিনিষকেই একটু সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের যত্নের ত্রুটি নাই। একটু কাঠকাঠরা তাহারা পড়িতে দেয় না—একটা না একটা সাজানগোছানর কাজে লাগাইয়া লয়। এবং এই সাজানগোছানতেই জাপানীদের বিশেষ নৈপুণ্য।

ইংরাজ লেখক জাপানীদের এই গুণেই বিশেষ মুগ্ধ। তিনি সর্ব্বত্রই তাহাদের সুশোভন বিন্যাসপটুতার কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ফুলদানীতে কত রকমে ফুল সাজায়—এবং এই ফুল সাজাইবার জন্য কত রকমের ফুলদানী! সুরের বিচিত্র সমাবেশে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—ফুলের বিচিত্র সমাবেশে জাপানী বিন্যাসপটুতা তেমনি পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কণ্ডর সাহেবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ লাভ করা যায়। কিসের পর কি রঙ্ খাপ খায়, কোন্ ঋতুতে কিরূপ ফুলবিন্যাস শোভা পায়, কোন্ ফুল দেবতাকে দিতে হইবে, কোন্ ফুল বিবাহোৎসবের উপযোগী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। দুইটি তীব্র রঙের মধ্যে কোমল রঙের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। যে যে রঙে মিশ খায় না মধ্যে সবুজ পাতা কিম্বা শুভ্র ফুল দিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। ভিন্ন ঋতুর সঙ্গে ভিন্ন ফুলের যেন ভাবগত ঐক্য থাকে। বাসন্তী

ফুলবিন্যাসে নবীন যৌবনের শ্যামলতা, গ্রীষ্মকালে পরিপূর্ণ বিস্তারের ভাব, শরতে কার্শ্য এবং শীতে শুষ্ক নীরস জীর্ণতা।

ফুলদানী নানা রকমের—এবং নানারকম করিয়া ফুল সাজাইতে হয়। কণ্ডব সাহেব এক খাড়া বাঁশের নির্ম্মিত বিয়াল্লিশ রকম ফুলদানীর উল্লেখ করিয়াছেন—কোনটির নাম সিংহমুখ, কোনটি বা হংসদ্বার, কোনটি বানরদেহ, কোনটি বংশী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁশের গোড়া হইতে কাটিয়া নৌকাকারের নানা প্রকার সোনলা ফুলদানী প্রস্তুত হইয়া থাকে—তাহাতে এমন করিয়া ফুল সাজান হয় যে, দেখিয়া বোধ হয় যেন এক একখানি ফুলের নৌকা—ফুলের দাঁড়, ফুলের হাল, ফুলের মাস্তুল। নৌকা কোনটি বিদেশাভিমুখে চলিয়াছে, কোনটি বা বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে এইরূপ নানা ভাবের।

শেষ কথা, জাপানের সামাজিকতা—ভদ্রতার রীতিনীতি, মেলামেশার নিয়ম, কথাবার্ত্তার ধরণধারণ। সমাজকে সুসভ্য সুন্দর করিতে হইলে কতকগুলি শিষ্টাচারের নিয়ম বিশেষ আবশ্যক। ভাষা সুশোভন এবং ব্যবহার সুন্দররূপে সুসংযত হওয়া উচিত। কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজেই ইহার অভাব দেখা যায়। ইতর বর্ব্বরতা আমাদের দেশে যে কিরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত খবরের কাগজগুলি পড়িলেই বুঝা যায়—তাহা ছাড়া সম্ভাষণ অভিবাদনের ত কোন নিয়মই নাই। জাপানীদের ইহার বিপরীত। কথাবার্ত্তার মধ্যেও সৌন্দর্য্য যাহাতে রক্ষিত হয় সে দিকে তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যদি গলা থাকে গান গাহিতে বলিলে গান না গাহা, যদি বাজাইতে জানি দু'ন ওজর আপত্তি করিয়া তবে সুর বাঁধিতে বসা এইরূপ অসামা-

ভিকতা জাপানী চরিত্রে বিরল। জাপানীদের কোটো বলিয়া একপ্রকার যন্ত্র আছে—নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে কেহ তাহা বাজাইতে জানিলে গৃহকর্ত্তা প্রায়ই তাঁহাকে বাজাইতে অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে অভদ্রতা করা হয়। বিনাইয়া বিনাইয়া ভড়ং করা জাপানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। আরও এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের তাহাদের অনেক নিয়মাদি আছে—এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাপানের অবস্থার একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী যুবকদিগের অনেকেরই মধ্যে ইংরাজী ধরণধারণ প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের বড় বড় লোক সকলেরই বিশ্বাস যে, এ বিদেশীয়ানা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না—তবে জাপানী সভ্যতা ইহার দ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে।

আদিম সম্বল।

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোন কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে, স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আ একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয় আর একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পা এ কথা স্বভাবতই অসঙ্গত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহা মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনই উন্নতির পথ হইতে পা না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর এ জনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারা য়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অ তেমনি সত্যপ্রিয়তা আর একটি। ছলনার প্রতি যে একট স্বণা সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্ন সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াই পারে তেমনি স্বভাবসুস্থ যুবকজাতি সহজেই সত্যাচরণ করে।

যদি বা কোন বয়স্ক বিজ্ঞ লোক এমন মনে করেন কথাট সম্পূর্ণ সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলে আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে অতএব সেরূ স্থলে অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত; কথাটা যেমনি প্রামা ণিক হৌক্ তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে জাতির মাথা এমন যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয় গেছে।

আর যাই হৌক্, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই শোভা পায় না। আমার কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে; আরেক জন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভাল হইবে না। কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। বলে কাজ হয় কিন্ত

কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সেই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্য পক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্ম্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিবা, মানুষের স্বাধীনতাসর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মত বানাইয়া তাহা হইতে নির্ব্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্ত্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম, বিরোধ, সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয় কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কি আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনি। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া ঘাটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক তাঁহারা খুব পাকা কথা

বলেন সন্দেহ নাই কিন্তু এত পাকা কথা কোন মানুষের মুখে শোভা পায় না। যে খাঁটি লোক, যাহার মন সাদা, যাহার পৌরুষ আছে সে বলে ফলাফল বিচার আমার হাতে নাই, আমি যাহা সত্য তাহা বলিব লোকে বুঝুক্ আর নাই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর নাই করুক্।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কি হিসাবে দেখিব? যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্টাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্ব্বে আমরা কখন এক জাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সঙ্কল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই সমস্ত সমবেত-হৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে, এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসঙ্কোচে অসীম জনতার মধ্যে নিবলস নির্ভীক হইয়া আদান প্রদান করিতে থাকিবে; তাহার জ্ঞানের খনি তাহার কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহার প্রেমের পথ সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে,—তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীরত্ব বলে, বুড়ামানুষের মত তর্ক করিয়া, অভ্যাস, আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া

তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্ম্মে, সমাজে, দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম, ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা সহকারে বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক।

দীপশিখা।

বৈশাখ মাসের সাধনায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় জগদানন্দ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে।

"অঙ্গারকণা সমুদয় যেমন এখানে (দীপশিখার বহির্ভাগে) আসিয়া পড়ে, অমনি জ্বলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায় না। অঙ্গারকণার যে অংশ জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া এইরূপে পুড়িয়া যায় তাহাই ধূমাকারে পরিণত হয়। তাই শিখার বহির্ভাগ হইতে আলো হয়

না এবং তাহা অপরিষ্কার থাকে।" দেউস্কর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

উপরের লিখিত কথাগুলি যদি সত্য হয়, তবে একথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অঙ্গারক বায়ুই ধূম। কিন্তু এরূপ কথা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না। যাহাকে ধূম বলি, সে জিনিসটার সঙ্গে আশৈশব পরিচয়। কতবার দেখিলাম, কতবার তাহা দ্বারা গাত্র পরিচ্ছদের মলিনতা সম্পাদন করিয়া গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলাম; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো ব্যতীত আর কোন জিনিষের লেশমাত্রও ত তাহাতে পাই নাই। "অঙ্গারক বায়ু" জিনিসটাকে লইয়াও বিস্তর নাড়াচাড়া করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে 'ধূম' পাই নাই। না পাইবারই কথা, ঐরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষটাতে যে আবার 'অঙ্গার' আছে একথা পণ্ডিতেরাও ঝট্ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই শুনিয়াছি; সুতরাং অঙ্গারক বায়ুই যে দীপশিখার ধূমের কারণ একথাটা আমার মাথায় গলিতেছে না।

উত্তরদাতা মহাশয় লিখিতেছেন—"বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রভাবে অঙ্গারকণাগুলি জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া একেবারে পুড়িয়া গিয়া অঙ্গারকে বাষ্পে পরিণত করে। তাহাতেই ধূম উঠিতে থাকে।" দেউস্কর মহাশয় ধূমকে অঙ্গারক বায়ু মনে করিয়াছেন। আচ্ছা, যদি অঙ্গারক বায়ুই ধূম হয়, তবে যে শিখায় ধূম নাই, তাহাতে কি অঙ্গারক বায়ু হয় না? যদি না হয়, তবে কি হয়? আর যদি হয়, তবে তখন ধূম হয় না কেন?

অধিক বায়ু চিমনির ভিতরে গেলে কি হয়, সে কথা এখন থাকুক, খোদ্ শিখার ভিতরে অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে কি হয় তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখুন। দোয়াতের আকৃতি-

বিশিষ্ট কেরোসিন তেলের আলোগুলির শিখাতে কি পরিমাণ ধূম হয়, যিনি না দেখিয়াছেন, এই বেলা একবার দেখুন। ইহার ভিতরে ব্লো-পাইপের সাহায্যে বায়ু প্রবেশ করান যাউক। সর্ব্বাগ্রে ধূমের লোপ এবং শিখার উজ্জ্বলতা ইহার ফল। আরো অধিক বায়ু প্রবেশ করাইলে শিখার উজ্জ্বলতার হ্রাস হইবে, কিন্তু তাহার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাইবে—কোন অবস্থাতেই ধূম কিন্তু একেবারেই হইবে না। ধূম যে নিরবচ্ছিন্ন কয়লার গুঁড়ো, ইহা অতি অল্প যত্নেই স্থির করা যাইতে পারে। প্রজ্বলিত অবস্থায় যাহা দীপের উজ্জ্বলতার কারণ হইয়াছিল, অপ্রজ্বলিত অবস্থায় তাহাই ধূম। অক্সিজেনের আধিক্যই যদি ইহার উৎপত্তির কারণ হয়, তবে এই সৃষ্টিছাড়া কথাটা মানিতে হয় যে অক্সিজেন অধিক হইলে জ্বলন্ত বস্তু নিভিয়া যায়!

শিখার অন্তর্ভাগে তৈল হইতে উৎপন্ন হাইড্রোকার্ব্বণ জাতীয় বাষ্পগুলি সঞ্চিত হইতেছে। অক্সিজেন এবং উত্তাপের সংস্রবে এই বাষ্পগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন এবং কার্ব্বণ জন্মাইতেছে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া জল হইল; সেই জল বাষ্পাকারে উড়িয়া গেল। কার্ব্বণ (অঙ্গার) কণার মধ্যে যেগুলি অক্সিজেন প্রাপ্ত হইল সেগুলি উক্ত অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গারক বায়ু হইল। যেগুলি অক্সিজেন পাইল না তাহার কতক গরম হইয়া জ্বলিতে লাগিল, অবশিষ্ট অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেই শিখামুখে নির্গত হইল। যাহাতে জ্বলিল, তাহাকে আমরা শিখা নাম দিলাম, যাহা জ্বলিতে পাইল না (অপেক্ষাকৃত ভিতরে, সুতরাং উত্তাপ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল বলিয়া) তাহা ধূমের সৃষ্টি করিল। অক্সিজেন

আরো অধিক হইলে, আরো অধিকসংখ্যক অঙ্গারকণা তাহার সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বায়ুর সৃষ্টি করিত। এই প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী অঙ্গারকণা উজ্জ্বল হইয়া শিখার পুষ্টিসাধন করিত। চাই কি, এর পর আর ধূম হইবার যোগ্য অঙ্গার অবশিষ্ট নাও থাকিতে পারিত। প্রজ্বলিত কার্ব্বণকণাগুলি ঐ অবস্থায় অক্সিজেনের সংশ্রবে আসিলে অঙ্গারক বায়ু হয়—নচেৎ নিভিয়া গিয়া ধূমের দলে মিশে।

অক্সিজেনটাই বাস্তবিক খুব চাই; তার পর উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট চাই। একটী কার্ব্বণকণাও যেন অপ্রজ্বলিত অবস্থায় বাহিরে আসিতে না পায়; অর্থাৎ ধূম যেন না হয়। দাহনটী যেন নিঃশেষরূপে হয়।

অগ্নিকে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিলে উত্তাপ ঘনীভূত হয়, এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে তাহার উত্তাপের অপচয় হয় না। কাচ লোহা ইত্যাদি গলাইবার সময় অগ্নিদেবকে কিরূপ সংকীর্ণ কারায় রুদ্ধ করা হয়, ভাবিয়া দেখুন। চিমনি-দ্বারা এই কার্য্যটী বেশ পরিপাটীরূপে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং চিমনি দিবার পূর্ব্বে এবং পরে ল্যাম্পের উত্তাপের কিরূপ তারতম্য হয় তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে অনুভবও করা যায়।

খোলা ল্যাম্পের বাতাস পাইবার সুবিধাটা আপাততঃ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পরিমাণ ধরিলে বাস্তবিক বেশীই বটে। কিন্তু ঠাণ্ডা বলিয়া একে ত এই বায়ু শিখার তাপ হরণ করে, তাহাতে আবার শিখার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার নাই—অথচ সেটী চাই। শিখার উষ্ণ-পদার্থ বেগে ঊর্দ্ধগামী হইতেছে, যে বাতাস খুব বেগে আসিয়া তাহার গায় পড়িবে তাহা ছাড়া অন্য বাতাসের এই পদার্থের

সহিত মিশিবার ক্ষমতা খুব কম। শিখার পদার্থ দগ্ধ হইয়া প্রবলবেগে চিমনির মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে। শূন্যতা নিবারণ করিবার জন্য বায়ু তদনুরূপ বেগে নিম্নদেশ দিয়া চিমনির ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপে শিখার পদার্থের সহিত এই বাতাসের মিশিবার ক্ষমতা জন্মে; অথচ চিমনির ভিতরটা খুব গরম বলিয়া শিখার সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই তাহার ঠাণ্ডা দোষটা অনেক পরিমাণে দূর হয়। চিমনি ফাটা অথবা বায়ুর প্রবলতা উভয় কারণেই ঠাণ্ডা বাতাসের দ্বারা উত্তাপ নষ্ট হইয়া শিখার অনিষ্ট হয়।

উত্তাপ বেশী হইলে, আর উষ্ণ বায়ু শিখার পদার্থের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশিতে পাইলে শিখার আলো বাড়ে আর ধূম রহিত হয়। চিমনি দ্বারা এই দুইটী কার্য্যেরই সহায়তা করা হয়। বন্দোবস্তটী বেশ, কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে চিমনির আবিষ্কারের সময় এইরূপ উদ্দেশ্য উপায়ের আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই। চিমনির আবিষ্কর্ত্তা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পানের 'বিড়ের' আকৃতিবিশিষ্ট একটী কাগজের 'ঠোঙা' দিয়া একটী শিখাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বানরের ভাগ্যে কৌতূহলের ফল যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল সৌভাগ্যের বিষয়, সকল অবস্থাতেই সেরূপ হয় না।

এস্থলে একটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কয়েক বৎসর যাবৎ বাজারে সেণ্ট্রাল্ ড্রাফ্ট্ নামক এক নূতন কায়দার ল্যাম্প উঠিয়াছে। তাহাতে শিখার সহিত বাতাস বেশী পরিমাণে এবং ভালরূপে মিশিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই ল্যাম্পের আলো পুরাতন প্রণালীর ল্যাম্পের আলোর অপেক্ষা পরিষ্কার।

স্বরবর্ণ 'অ'।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহারি অনুবৃত্তি-ক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিঞ্চিৎ পরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

বাঙ্গলায় প্রধানতঃ 'ই' এবং 'উ' এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে গত শব্দের গ-য়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-য়ে ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণ এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখা।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্ত্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্ত্তী বর্ণে য-ফলা থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্ত্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলতঃ য-ফলা, ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্ব্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। *

* য-ফলা যেমন 'ই' এবং 'অ'র সংযোগ, ব-ফলা তেমনি 'উ' এবং 'অ'র সংযোগ অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্ব্বনিয়ম খাটে। কিন্তু ব-ফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটী মনে পড়িতেছে, তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যথা অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, নম্বস্তরী। কম্বল, সম্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং ব-ফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

ঋ-ফলাবিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃ, ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনা স্থলে আনা যায়। কিন্তু বাঙ্গলায় ঋ-ফলা উচ্চারণে ইকার যোগ করা হয় অতএব ইহাকেও পূর্ব্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না। †

অপভ্রংশে পরবর্ত্তী 'ই' অথবা 'উ' লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে। যেমন 'হইল' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ল', 'হউন' শব্দের অপভ্রংশে 'হ'ন' (কিন্তু 'হয়েন' শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হ'ন' উচ্চারণ হয়)। 'থলিয়া' শব্দের অপভ্রংশে 'থলে', 'টকুয়া' শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

'ক্ষ'র পূর্ব্বেও 'অ' 'ও' হইয়া যায়। যেমন কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ। 'ক্ষ' শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'ক্ষ'র সঙ্গে য-ফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের য-ফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন। যেমন, তাঁহারা 'লক্ষটাকাকে' বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা।'

যাহা হৌক্ মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই একটা ব্যতিক্রম আছে পূর্ব্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে 'ও' স্বরবর্ণের প্রতি বাঙ্গলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত আমরা সংস্কৃত 'অ'র বিশুদ্ধ

† মহারাষ্ট্রীয়েরা 'ঋ' উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি

উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের 'অ' সংস্কৃত 'অ' এবং 'ও'র মধ্যবর্ত্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে। যেমন 'অ' এবং 'উ'র মধ্য পথে 'ও'; 'অ' এবং 'ই'র সেতুস্বরূপ 'এ'; যখন এক পক্ষে 'ই' অথবা 'এ' এবং অপর পক্ষে 'আ' তখন 'অ্যা' তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন করে। বোধ হয় ভাল করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে বাঙ্গালীরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রশ্নোত্তর।

সন্ধ্যাকালে পশ্চিম গগন লোহিতাভ হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নিবেদন করিতেছি।

ফাল্গুন মাসের সাধনায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটী যাঁহারা পড়েন নাই, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে সেটী পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি।

আলোকজনক ঈথরতরঙ্গগুলির যেমন কোনটী দ্রুত, কোনটী শ্লথ, তেমনি দ্রুতগুলির অপেক্ষা শ্লথগুলি আকারে বড়। মনে করুন লাল আলোর বড় বড় ঢেউগুলি যেন বড় বড় পাথীর ডানার ন্যায় অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে নড়িতেছে, বেগুণী আলোর ছোট ছোট ঢেউগুলি মশা মাছির ডানার ন্যায় অতি দ্রুত-ভাবে কাঁপিতেছে।

লাট্টি সোজাভাবে জলে প্রবেশ করাইলে অল্পেতেই তলা পাওয়া যায়, কিন্তু যতই 'তেরছা' ভাবে প্রবেশ করান যায়, তলা পাইতে ততই তাহার বেশীটা

জলে ঢুকাইতে হয়। আলোকের রশ্মিকেও তেমনি দুপুরবেলার অপেক্ষা বিকাল বেলায় অনেকখানি বেশী বায়ুর ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে পৌঁছাইতে হয়।

জলের তরঙ্গের পথে নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল বাধাস্বরূপ থাকিলে দেখা যায় যে, ছোট ছোট তরঙ্গগুলি উহাদের আঘাতে লোপ পায়, কিন্তু বড় তরঙ্গগুলির তত ক্ষতি হয় না—উহারা ঐ সকল প্রস্তরকে অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে।

শব্দের তরঙ্গ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। সূর্য্যের শুভ্র আলোক যেমন নানাবর্ণের অনেকগুলি আলোকের সমষ্টি, তেমনি হারমোনিয়ম ইত্যাদি যন্ত্রের এক একটী 'রীডের' আওয়াজ তীব্র গম্ভীর বহুসংখ্যক আওয়াজের সমষ্টি। তীব্র আওয়াজগুলির আতিশয্যে 'রীডের' আওয়াজ অনেক সময় কর্কশ হয়। তখন কি করা হয়? না, জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন শব্দের তরঙ্গের পক্ষে তদনুরূপ কার্য্যকারী কোন পদার্থের প্রয়োগ করা হয়। রীডগুলিকে কম্বল অথবা তদনুরূপ কোন বস্ত্রদ্বারা ঢাকিলে, তাহার লোমে বাধা পাইয়া অতিশয় তীব্র ধ্বনির নিতান্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হীনবল হইয়া যায়। তাহার ফলে রীডের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয়।

আলোকের রাজ্যেও এই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জলের তরঙ্গের পক্ষে প্রস্তরগুলি যেমন, শব্দের তরঙ্গের পক্ষে কম্বলের লোম যেমন, আলোক-তরঙ্গের পক্ষে বায়ুতে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি তেমন। সন্ধ্যাকালে এইরূপ কণামিশ্রিত অনেকখানি বায়ুর ভিতর দিয়া আলোককে আসিতে হয়। সবুজ, নীল, বেগুণী আলোর ছোট ছোট তরঙ্গগুলি ঐ সকল কণায় বাধা পাইয়া অল্পাধিক পরিমাণে লোপ পায়। বাকি থাকে লাল, লেবুর রঙ এবং হলদে রঙের আলো। ইহাদের মিশ্রণজাত আলোর যেমন রঙ তাৎকালীন আকাশের আমরা সেইরূপ রঙ দেখি।

ল্যাম্পের চিমনিতে কালী মাখাইলে তাহার ভিতর দিয়া আলোর শিখাকে অপেক্ষাকৃত লাল রঙের দেখা যায়। ইহারও কারণ ঐরূপ। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আলোকতরঙ্গগুলি কালীর কণার আঘাতে লুপ্ত হইয়া যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের মিশ্রণোৎপন্ন আলোর রং অপেক্ষাকৃত লাল হইবারই কথা।

কালীমাখান কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিলে ডুবুবেলায়ই সূর্য্যকে অপেক্ষাকৃত লাল দেখা যায়। শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

গতসংখ্যক সাধনায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়াছেন—তাহার দুই একটী বিষয়ে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকার উদয়কালে বৃহত্তর দেখাইবার কারণ যে দৃষ্টির ভ্রম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই—কিন্তু যখন সূর্য্য আকাশের নিম্নদেশে থাকে তখন বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থের সহিত ইহার আকার তুলনা করা যায় বলিয়াই যে ইহাকে বৃহত্তর দেখায়—এ কথা অবিসম্বাদে গ্রাহ্য করা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে—যখন অসীম মহাসমুদ্রের মধ্য হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র উদিত হয় তখনও তাহাদের আকার বৃহত্তর দেখায় এবং যত আকাশের উপরে উঠে—ততই তাহাদের আকার কমিতে থাকে। যদি একখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা বৃক্ষাদি পার্থিব পদার্থ দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া কাষ্ঠফলকের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া সূর্য্যোদয় পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলেও ইহার গোলক বৃহত্তর দেখাইবে—তখন ত আর তুলনা করিবার কিছু রহিল না—তবে কেন সূর্য্য-গোলক বৃহত্তর দেখায়?

আমার বোধ হয়, শূন্য হইতে পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশকালে সূর্য্য-রশ্মিসকলের বক্র পথ অবলম্বনই (refraction) এই আকার বৃদ্ধির কারণ। সূর্য্যগোলকের প্রান্ত হইতে যে সকল রশ্মি আমাদের চক্ষে পৌঁছায়, তাহারা সূর্য্য হইতে এক সরল রেখা-ক্রমে আসে না বায়ু-স্তরের গাঢ়তানুসারে বাঁকিয়া আসিয়া চক্ষে পড়ে এবং রশ্মিসকল যে যে সরল পথ অবলম্বন করিয়া চক্ষে পড়ে, সেই সেই সরল পথের বর্দ্ধিতাংশে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই এটী আলোকের সাধারণ ধর্ম্ম। এই বিষয়টী লইয়া একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে—যে আকার বৃদ্ধির কারণ—রশ্মি সকলের পথ পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি সমান ভূমিযুক্ত দুইটী বৃত্তসূচি (Circular cone) লইয়া তাহাদের সমান ভূমিকে উভয়ের সাধারণ ভূমি করিয়া সাজান যায়,—তাহা হইলে যে একটী চিত্র হয়—সূর্য্যরশ্মির পথও প্রায় সেই চিত্রের অনুরূপ; সূচিদ্বয়ের একটী শৃঙ্গ সূর্য্য ও অপরটী দর্শকের চক্ষু।

এখন যে সূচির শৃঙ্গ চক্ষু তাহার পৃষ্ঠ যদি সাধারণ ভূমির দিকে বর্দ্ধিত করা যায়—তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অপর সূচিটীর শৃঙ্গ প্রথম সূচির মধ্যে পড়িবে—অর্থাৎ আমরা সূর্য্যের আকার বৃহত্তর দেখিব।

যখন সূর্য্য আকাশের নিম্ন ভাগে থাকে তখন রশ্মিসকল গভীর জলীয় বাষ্প ও বায়ু স্তর ও তীর্য্যক ভাবে ভেদ করিয়া আসে বলিয়া রশ্মিসকল অধিক বাঁচিয়া যায়, কাজে কাজেই সূর্য্যের আকার ও বাড়িয়া পড়ে কিন্তু সূর্য্য যতই আকাশের উপরে উঠিতে থাকে—রশ্মিসকল লম্বভাবে বায়ুস্তর ভেদ করিতে আরম্ভ করে সুতরাং রশ্মি-পথের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না, এই কারণে তখন সূর্য্যের প্রকৃত আকার দেখা যায়। শ্রীহরিদাস চৌধুরী।

প্রশ্ন।

১। যদি পৃথিবীর উপরের কোন স্থান হইতে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ কাটা যায় এবং এই সুড়ঙ্গের এক সীমা হইতে যদি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়—তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডটীর গতি কি প্রকার হইবে? এটী কি কেন্দ্রে গিয়া নিশ্চল থাকিবে?

২। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রে পশ্চিমদিকে কামান গর্জ্জনের ন্যায় যে শব্দ শুনা যায় তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? মেঘশূন্য পরিষ্কার রাত্রেও এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। শুষ্ক ভূমিতে অনেক দিন পরে বৃষ্টি হইলে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয় এ গন্ধটি কিসের? শ্রীহরিদাস চৌধুরী। কৃষ্ণগঞ্জ।

৪। কিয়ৎক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিলে আমাদের মাথাটী নিম্নদিকে তলিয়ে যায়, এবং আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভাসিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা আমাদের মাথাটী ভারী। এতখানি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র মাথা কিরূপে ভারী হইল তাহা পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ বুঝাইয়া দিলে সুখী হইব।

৫। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ বেশী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া নিবে কেন?

শ্রীসতীশচন্দ্র ওয়াদাদার। চট্টগ্রাম।

সাধনা।

হিং টিং ছট্।

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ!—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়
চখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা, এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝট্পট্,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি বসে' গেছে কল্পা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁই-ফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে!
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কানোজ কাঞ্চি মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা!
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত!
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;

কোনখানে নাহি পায় অর্থ কোনরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ!
চুপ করে' বসে' থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ!
তাহাদের ডেকে আন যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্ত্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্ত্তি!
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বল চট্‌পট্!"
সভাসুদ্ধ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চখে!
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস" রেগেমেগে বলে!—

"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ করি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল!
হাঁফ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'!
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত,
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

উমেদার।

আমি উমেদার। তিন বৎসর ধরিয়া উমেদারি করিতেছি চেষ্টার ত্রুটি নাই, হাঁটাহাঁটির কসুর নাই, কিন্তু কিছু জুটে নাই। শুনা ছিল, রাজধানীতে কাজকর্ম্মের বড় সুবিধা, তাই কলিকাতায় আসিয়াছি। জানা ছিল, মাতুল মহাশয় কলিকাতায় একটা বড় রকমের কাজ করেন, দুই একটা ভেক্যান্‌সিও নাকি তাঁর হাত দিয়া যায়, তাই সেই আশায় ভর করিয়া মামার স্কন্ধে চাপিয়াছি। কিন্তু এ হেন মণিকাঞ্চণযোগেও আমার এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা হইল না। অনেক কাজকর্ম্ম খালি হইল, সইসুপারিশ তাও সাধ্যমত জুটাইলাম, দুই এক স্থলে আশাও পাইলাম, কিন্তু কেমন পোড়াকপাল, জুটে জুটে করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত কিছু জুটিল না, আমি বেকার!

বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি পিতৃদেব উপার্জ্জন মন্দ করিতেন না, সৎব্যয়ে ও দানধ্যানে তাঁর নাম যশও বেশ ছিল, এখন ঐটুকুই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, কিন্তু তাতে ত আর পেট ভরে না। পাঁচ দশ বিঘা জমাজমী ছাড়া সামান্য অর্থ ও অলঙ্কার ছিল, দু ভগ্নী—দুটীর বিবাহেই তা প্রায় শেষ হয়। মার কষ্ট ও সংসারের অবস্থা দেখিয়া আঠার বৎসর বয়সেই আমাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইল, তার পর উমেদারি-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি কিন্তু আজ এই তিন বৎসরেও এ সাগরের কূলকিনারা দেখিতেছি না।

বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে মা, বিধবা পিসি, আর দুটী ভগ্নী ও একটী ভাই। ভগ্নী দুইটী বিবাহের পর হইতে অধিকাংশ

শ্বশুরালয়ে থাকেন, বাকী পরিবারবর্গের অভিভাবক এখন আমি, কিন্তু আমি বেকার!

মামা কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিতেন। তিনি মামাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, উপস্থিত কর্ম্মের সোপানও নাকি তাঁহা হইতে। ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াই হোক্, অথবা কৃতজ্ঞতার খাতিরেই হোক্ মামা পিতার মৃত্যুর পর হইতে আমার সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পরিগ্রহ করার বছর দুই পর হইতে খরচপত্রের টানাটানিতে মামা আর কিছুই সাহায্য করিতে পারেন না।

কিন্তু গরজ বড় বালাই, মামার খরচপত্রের টানাটানি বুঝিয়াও আমাকে মামার বাসায় থাকিতে হইল। মামা কিছু আশা ভরসাও দিলেন, আমি সেই সাহসে, তাঁর সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও,তাঁর গলগ্রহ হইয়া বসিয়া বসিয়া তিন বৎসর কাটাইলাম—সাধে কি বলিয়াছি, গরজ বড় বালাই!

মামার প্রথম পক্ষের একটী পুত্র আর এক কন্যা; কন্যা শ্বশুরবাটী ভবানিপুরেই প্রায় থাকেন, কখন কদাচিৎ এ বাসায় আসেন, কিন্তু দুদিনের বেশী কখনও থাকিতে দেখি নাই; ছেলেটীর বয়স দশ এগার, নাম তার রাজন। দিদিমা রাজনকে বড় আদর দেন, পাছে সেই আদরে ছেলেটী নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে দিদিমাকে কলিকাতার বাসায় রাখা হয় না, তিনি বাটীতেই থাকেন।

কলিকাতার বাসার অন্যান্য পরিবারের মধ্যে নূতন মামী, আর তাঁর তিনটী সন্তান। মামীর মাসী, মামীকে "মানুষ" করিয়াছেন, তাঁর কাছছাড়া থাকিতে পারেন না, তাই তিনি মামীর

কাছেই থাকেন! আর মামীর একটী ভাই, সে রাজনের বয়সী, মামীর বড় স্যাওটা, সুতরাং এইখানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। মা এখানে, বাটীতে রাঁধিয়া দিবার লোক নাই, কাজেই মামীর মাসতুত ভাই, মামীব চেয়ে বছর পাঁচের বড়, সেই মাসতুত বড় ভাইটী এই পরিবাব শ্রেণীভুক্ত, তিনি বিবাহিত ও সপুত্রক, অতএব তাঁর দারাসুতও অধিকাংশ সময় এইখানেই থাকেন।

মামী ছেলেগুলিকে একলা সাম্‌লাইতে পারেন না, সে জন্য চাকর চাকরাণীর সংখ্যা কিছু অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইয়াছে, একজন পাচকও আছেন।

মামী তাঁর বাপমাযের বড় আদরের মেয়ে। মাসকাবারে মামীর পিতা নিয়মিতরূপে মামীকে প্রতিমাসে দেখিতে আসেন; এই বৃহৎ সংসাব ফেলিয়া, ঘবের গিন্নি মামী বড় একটা বাপের বাড়ী যাইতে পারেন না, কাজেই মামীর মাও মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখিয়া যান।

মামীর সেই মাসতুতো ভাইটী আমি আসার ৩৪ বৎসব পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছেন, কিন্তু চাকরীর উপর তাঁর বড় বিতৃষ্ণা, স্বাধীন জীবন বহন করিবার ইচ্ছা তাঁহার একান্তই বলবতী, তাই আর তিনি কাজকর্ম্মের চেষ্টা করেন না। চাকর চাকরাণীবা বড় চুরী করে, সেই জন্য বাসার বাজার করার ভার তাঁব উপর, তিনি কিছু বেশী খরচ কবেন বটে, কিন্তু হলে কি হয়, চাকরেরা ত আর চুরী করিতে পারে না।

বড় ঝঞ্ঝাট বলিয়া টাকাকড়ি মামা নিজে হাতে কিছু রাখেন না; পূর্ব্বে মামার কিছু বাজে খরচ ছিল, অনর্থক দানে ও আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে মাসে মাসে তাঁর প্রায় ২০।২৫ টাকা অপব্যয় হইত, মামীর সুবন্দোবস্তে সে খরচটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

আমার আফিস নাই, সুতরাং সারাদিনই অবকাশ। আমি কলিকাতায় আসার দিন পনের পর একদিন মামীর মাসী কথায় কথায় আমায় বলিলেন, "দেখ সুরেন, একটা কথা আজ কদিন ধরে' এঁরা কেউ তোমায় বল্‌তে পাচ্চেন না—জামাই, কামিনীকে (মামীর নাম কামিনী) রোজই তোমায় বল্‌তে বলেন, কিন্তু সে ত ভাই, ভেবেই খুন, কি করে' তোমায় বলবে, সে বলে, ও কথা আমি কেমন করে' সুরেনকে বলি, পাছে সে কিছু মনে করে; আরে বাছা সুরেন তো তোর ঘরের ছেলে, তাকে আবার লজ্জা কি? কেমন কিনা ভাই! আমি বল্লেম, তোমরা কেউ না পার আমিই বলব এখন, সুরেন তেমন ছেলেই নয়, শুনবামাত্র সে হাসিমুখে স্বীকার হবে।" আমি অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত এই ভূমিকা শুনিতেছিলাম, তিনি সমান বলিয়াই চলিলেন, "তোমার মামা বলেন কি রাজনের ত পড়াশুনা ভাল হচ্চে না, যে মাষ্টারটী আছেন সেও তেমন যত্ন করে' পড়ায় না, হাজার হোক সে ত পর বই নয়; তা তুমি যদি একটু মনোযোগ কর, তবেই তোমার ভাইটের কিছু হয়, রাজনের জন্যে তোমায় আর বেশী বল্‌তে হবে না, তার যাতে ভাল হয়, তুমি তাই কর, তোমার মামা ত তোমার উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত! আর গোপাল তোমার মামীর ভাই, সেওত কিছু তোমার পর নয়, তাকেও একটু একটু দেখো!" আমি বলিলাম আজ্ঞে তার আর কথা কি! তিনি অমনি মামীর দিকে নয়নপল্লব বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দেখ্‌লি লো কামিনী, তুই আবার ভাব্‌ছিলি, পাছে সুরেন কিছু মনে করে, হ্যাঁলা, তুই কি সুরেনের তেমনি মামী যে ইত্যাদি।

পরদিন মামা আমায় বলিলেন, "হ্যাঁ হে তুমি নাকি বাড়ীর

মধ্যে ওদের কাছে বলেছ, মাষ্টার রাজনদের ভাল করে' পড়ায় না, তুমিই এখন হ'তে ওদের পড়াবে! সেত ভালই, তুমি ভার নিলে ছোঁড়াদের কিছু হতে পারে!"

পরদিন হইতে দশ টাকা বেতনের মাষ্টার মহাশয় বিদায় পাইলেন। আমিই রাজনদের নিয়মমত পড়াইতে লাগিলাম। মামার এপক্ষের ছেলে ও মেয়েটী দুপুরবেলায় পণ্ডিতের কাছে পড়ে, আমি আসার পর মাস খানেক দেড় এই বন্দোবস্তে কাটিয়া গেল, একদিন শুনিলাম ছেলেরা খোট ধরিয়াছে, পণ্ডিত মশাই মারে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব! পণ্ডিত আসিয়া দুই দিন ফিরিয়া গেল ছেলেরা আর পড়িতে আসেনা, তাদের খোট সমানই চলিয়াছে আমরা সুরেন দাদার কাছে পড়ব। পণ্ডিত কিন্তু রোজই আসে, সাত টাকার মায়া সে বেচারী সহজে ত্যাগ করিতে চায় না—বুঝি পারেও না। মামী স্বয়ং একদিন আমায় ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু ভারি এক মুস্কিলে পড়েছি; তোমার ভাই বোন দুটী কি চোখেই যে তোমায় দেখেছে সুরেন দাদা সুরেন দাদা করেই তারা সারা! আবার কদিন থেকে খোট ধরেছে ওরা তোমার কাছে পড়বে, আর কারুর কাছে পড়তে চায় না, কি করি বল দেখি, পাছে তোমার কষ্ট হয় বলে' আমি ত তোমায় কদিন বলিইনি, তাড়াতুড়ি দিয়ে মেরে ধোরে কিছুতে ওদের যদি ভুলুতে পাল্লেম।" আমি কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছি, এমন সময় কোথা হইতে মামীর মাসী হরিনাম জপিতে জপিতে বলিয়া উঠিলেন "তা পড়াবে গো সুরেনই পড়াবে, ওকেত আর কোথায় বেরুতে হয় না, দুপুরবেলায় খেয়ে দেয়ে ওয়ে কাল কাটায় তা না-হয় ওদের নিয়ে দুদণ্ড বস্‌বে এ আর বেশী কি! কেমন সুরেন!"

এর পর হইতে ছোট ছোট ছেলেদেরও আমি পড়াইতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ মামা কিছু সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিলেন, তখন আমি ছেলেদের পড়াচ্ছি; মামা বল্লেন কই আজ পণ্ডিত আসেনি, আমি যথাবিহিত উত্তর দিলাম। মামা বলিলেন, বটে তুমি ত হে দেখ্‌চি অনেক খরচ বাঁচাও, আচ্ছা আসছে মাস হ'তে এখন থেকে দিদির কাছে কিছু কিছু পাঠাব, দিদির ভারি কষ্ট হয়, না? আমার টানাটানি বলেইত এতদিন কিছু পাঠাতে পারিনি! মামার এই প্রস্তাবে কিছু আহ্লাদিত হইলাম, ভাবিলাম মায়ের কোনরূপে সাহায্য হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে পারি।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি একটা প্রয়োজনে উপরে গিয়াছিলাম, নীচে আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, মামীর মাসী পাশের ঘর হইতে যেন কাকে বলিতেছেন, "ভিজে বেড়ালকে চেনা ভার, বসে' বসে' পাতড়া মারবেন, আর মামার কান ভারি করবেন, ধন্য কলিকাল যাহোক! মামাতো ভাইদের পড়িয়ে টাকা নিতে লজ্জা করে না! পোড়াকপাল আর কি!" কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম, কেননা জানিতাম, "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" বেকারের মত সহিষ্ণু জন্তু বুঝি আর দুটী নাই! কবিরা বোধ হয় বেকারের মর্ম্ম জানেন না—নতুবা এহেন দ্বিপদ বেকার থাকিতে সহ্য গুণের উপমার জন্য চতুষ্পদের শরণ লইবেন কেন?

তার পর দিন দুই গেল, মামা আর কোন কথা আমায় বলেন না, যেন কিছু লজ্জিত লজ্জিত। একদিন, হঠাৎ আমায় ডাকিয়া বলিলেন "তাইতো হে সুরেন! দিদির ত দেখি ভারি কষ্ট, তার কাছে কিছু পাঠাবার বড়ই দরকার, তা এক কাজ কর,

একটা প্রাইভেট টিউসনি দেখ, তাতে যে কটা টাকা পাবে, তাই দিদিকে পাঠালেই চলবে, তার পর যাহয় করব!" মামার বিপদ বুঝিয়া বড় দুঃখেই মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, প্রণয়স্রোতে মামার আমার আজ লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি পূর্ব্ব হইতেই একটী প্রাইভেট টিউসনির জোগাড় দেখিতেছিলাম, সেই দিন হইতে আরও একটু বেশী বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলাম, উমেদারের সহিত ছোট বড় অনেক লোকেরই আলাপ। কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত বোধ হয় এত লোকের আলাপ হয় না। সবেমাত্র "সেসন" খুলিতেছে কাজেই আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইল না, শীঘ্রই একটী টিউসনি জুটিল, বেতন বার টাকা। তখন হইতে বাড়ীতে মার নিকট মাসে মাসে দশ টাকা পাঠাইতে লাগিলাম, অনেকটা অভাব ঘুচিল। আমি কতক নিশ্চিন্ত হইলাম, মামাও বাঁচিলেন।

এই বাঙ্গলা দেশে আমাদের মত বেকারের অন্ন জুটিতে না পারে, কিন্তু পাত্রী জুটিতে বাকী রয় না, সব বন্ধ থাকে, কিন্তু বিবাহ বন্ধ থাকে না। আমার সম্বন্ধ জুটিল, বিবাহ ত হইল। সবে মাত্র কাজের চেষ্টায় আসিয়াছি, তখনও বুকভরা আশা, মনভরা উৎসাহ, তবু সে সময় আমি বিবাহের প্রস্তাবে প্রথমে অমত করিয়াছিলাম, কিন্তু মামার অনুরোধে মাগীর বেগুণফুলের কন্যার সহিত বিবাহ করিতে হইল।

বিবাহের পর বার তিনেক শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম, শেষবার শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন "বাবাজি একটা কাজকর্ম্ম কর, এমন নিশ্চিন্ত থাকাটা ত আর উচিত হয় না।"

বড় ঠাকুরঝি বলিয়াছিলেন "শুন্‌ছি নাকি তুমি খুব লেখাই

মেরে মেরে বেড়াচ্চ, পুরুষ মানুষ দু পয়সা উপার্জ্জন না কল্লে কি মানায়!" ইত্যাদি।

আমি বেকার বসিয়া আছি, সকলেই জানেন আমার অনেক সময়! আত্মীয় মুরুব্বিগণ সকলেই বলিতেন এ বয়সে বসে' থাকা কিছু নয়, যাতে তাতে ঢুকে পড়; সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন, শেষে কেহ অনুগ্রহ করিয়া দুই চারিটা ফাইফরমাস আমার উপর চাপাইতেন, সে ফরমাস নানা রকমের, সে সব সামান্যই কাজ—না করিয়া দিলে চলে না, আপত্তি খাটে না! একদিন ট্রামে আসিতেছিলাম, ট্রান্‌সফার টিকিট ছিল, বৌবাজারের চৌমাথায় নামিলাম, দেখিলাম একটী ঘোড়া বড় নাকাল, তার কাজও নাই, কামাইও নাই। যতগুলি গাড়ী আসিতেছে, চৌমাথার ব্যাঁক পার হইবার সময় সেই ঘোড়াটিকে অতিরিক্তরূপে যুতা হইতেছে, সে বেচারী সর্ব্বদাই এরূপ করিতেছে, কিন্তু তার কাজ কোন কাজের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে, তার বিশ্রামের গৃহ নাই, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রৌদ্রে পুড়িতেছে! তার অবস্থা দেখিয়া একবার নিজের অবস্থা মনে পড়িয়াছিল।

আমি প্রায়ই কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বড় বড় চাকরের, বড় বড় জমীদারের, বড় বড় মুরুব্বির বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই। বিশেষতঃ রবিবারে ত আমার সকাল বিকাল কামাই থাকে না। মাঝে মাঝে আফিস অঞ্চলেও যাই, আফিসে গিয়া আশা পাইয়া কোন কোন দিন বা বাবুদের বাটীতে যাই। বাড়ী গিয়া কোন বাবুর সাক্ষাতের আশায় ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করিয়া শুনিতে পাই, "বাবু আজ বড় ব্যস্ত, আর একদিন আস্‌তে বল্লেন।" কোথাও বা সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং বাবুর দর্শন লাভ ঘটে, কিন্তু

ফলটা প্রায়ই একরূপই দাঁড়ায়। কোন কোন বাটীতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না, দরোয়ানজীর অনুগ্রহে নগদ নগদ বিদায় পাই। আমি কিন্তু আশা ছাড়ি না, বাবুদের নিকট যাওয়া আসা বন্ধ করি না, যদি কখন কেহ আমার এইরূপ যাতায়াতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি তখন মনে মনে নিধুবাবুর সেই গানটী ভাবি—

"আমি তোমারে দেখ্‌তে আসি দেখা দিতে আসি না।
আমার স্বভাব আমি তোমা বই জানি না।"

তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বাসায় যাই, তখন বেলা কিছু বেশী হইয়া পড়ে, বাসায় যাইয়া শুনি চাকর চাকরাণীরা আমার সম্বন্ধে নানারূপ মিষ্ট আন্দোলন করিতেছে। আহার করিতে গিয়া দেখি, ভাত বাড়া রহিয়াছে, চালের সহিত তার আর প্রভেদ করা যায় না, কোন দিন বা দেখিতে পাই, অন্ন-পাত্রের উপর কুকুর বিড়াল ও বায়সবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের বলবুদ্ধির পরীক্ষা করিতেছে।

মধ্যে মামার আফিসে একটী কাজ খালি হইয়াছিল, মামার কথায় বুঝিয়াছিলাম সে কর্ম্মে মামার বিশেষ হাত আছে। মামার এক জ্ঞাতি ঠাকুরদাদা আছেন। আমাদের বাসার কাছেই তাঁর বাসা। তিনি মামার নিকট প্রায়ই আসিতেন। লোকটি বড় ভাল, কিন্তু কিছু স্পষ্টবাদী, অন্যায়টা তাঁর দু'চক্ষের বিষ। তিনি আমায় কিছু স্নেহ করিতেন, আমার জন্য মাঝে মাঝে উপরপড়া হয়ে মামাকে বলিতেনও। এক্ষণে এই কাজটীর কথা শুনিয়া মহা আনন্দসহকারে মামাকে বল্লেন, "দেখো ভাই, এটা যেন আর সুরেনের ভাগ্যে ফস্কায় না।" মামা উত্তর করিলেন "না, এটা বল্‌তে গেলে একরকম আমার একতারেরই মধ্যে।"

দুই দিন যেতে না যেতে দেখি, মধ্যাহ্নে ব্যাগহস্তে মামার এক সম্বন্ধী উপস্থিত—ইনি মামীর সহোদর এবং কনিষ্ঠ। জানি না কেন তাঁহাকে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধটা ঠিক করিতে পারিতেছি না—তাঁহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল! বুঝি নিশীথ রাত্রে কারাগৃহে নবাবপুত্রী আয়েষাকে নির্জ্জনে জগৎসিংহের নিকট দেখিয়া ওসমানের হৃদয় এমনই কাঁপিয়াছিল! সেই দিন মাতুল মহাশয় যখন আফিস হইতে ফিরিলেন, আমি তখন কার্য্যান্তরে উপরে ছিলাম; দেখিলাম মামা ঘরে যাইবা-মাত্র, পাখা হাতে মামী, তাড়াতাড়ি, মামার চাপকানের বোতাম খুলিয়া দিতেছেন, আমি অন্তরালে ছিলাম, হঠাৎ এ ঘটনাটী আমার চক্ষে পড়িল! মামার চক্ষের সেই সহাস্য দৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গের সেই আবেশময় সৃষ্টি আর মুখের সেই প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বুঝি এ সুখসম্ভোগ মামার পক্ষে বড় সুলভ নহে!

পরদিন একটু সকাল সকাল মামা আফিস চলিয়া গেলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার আফিস যাইবার কথা, মামা কিছু না বলায় ভাবিলাম তাড়াতাড়িতে বুঝি বা ভুলে গেছেন; মামার আফিস চিনিতাম, আহারান্তে আফিস গেলাম। গিয়া দেখি, মামা তাঁর সেই সম্বন্ধীটীকে বড় সাহেবের সহিত পরিচয় করাইতেছেন, সাহেবের মুখে একমুখ হাসি, মামাও যেন টিপিটিপি হাসিতেছেন, কেবল মামার সম্বন্ধী বেচারা যেন কিছু অপ্রতিভ অপ্রতিভ! মামা আমাকে দেখিতে পান নাই, আমি সরিয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইলাম। মামা যখন সসম্বন্ধী সাহেবের নিকট হইতে ফিরিতেছিলেন, আমি সম্মুখে পড়িলাম, মামা আর আমার দিকে তাকাইতে পারিলেন না, কেবল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সে কাজটা হয়ে গেছে!"

আমি একটু রাত্রি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় গিয়া দেখি মামার সেই ঠাকুরদাদা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! মামাকে বলিতেছেন, "বলি একবারেই কি গোল্লায় গিয়েছো! চখের চামড়াটাও কি না-বৌয়ের পায়ে দিয়েছো! সুবেনের বাপ তোমাকে মানুষ করে' কাজ-কর্ম্ম করে' দিয়েছিলেন, তুমি তাঁর সম্বন্ধী তাই বুঝি তুমিও তেমনি নিজের সম্বন্ধীর কাজ করে' দিয়ে সে উপকারের শোধ দিলে! অতি উত্তম কার্য্য করেছো!" ব্রাহ্মণ উঠিয়া চলিয়া যান, সম্মুখে আমায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,"ওরে বাবু, এ বাজারে ভাগ্নে হওয়ার কর্ম্ম নয়, পারিস তো আর জন্মে মামার দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ'য়ে উমেদারী করতে আসিস, এখন ঘরের ছেলে ঘরে যা।"

বৃদ্ধের বচন গ্রহণযোগ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। আমি এখনও সেই কলিকাতায় মামার বাসায় উমেদার!

বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ।

বাঙ্গলা শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে, তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এই জন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ, কোন স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড় ছোট প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘ হ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাঙ্গলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ হিসাবে বাঙ্গলা ভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তর-

ভূমির মত সর্ব্বত্র সমান। জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়। কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না। শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়। একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্ব্বেই অবিলম্বে আর একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

মন্দ পবন, কুঞ্জভবন,
কুসুম গন্ধমাধুরী।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু এই ভাব সমমাত্রক ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুম কানন
ফুল পরিমল মাধুরী।

ইংরাজিতে অনেক সময় আট দশ লাইনের একটি ছোট কবিতা লঘুবাণের মত ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ছোট কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না।

বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্ব্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়ই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌঁছায় না। সেই

অল্প সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোন লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বরপূর্ণ না হইলে সাধারণতঃ গ্রাহ্য হয় না।

বাঙ্গলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাঙ্গলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভাল ইংরাজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দাম গতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়-স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এই জন্য তাহাতে সর্ব্বত্রই একপ্রকার দুর্ব্বল সমাবৃত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা পরিমাণে চীৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফল লাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। "যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে" দুর্ব্বোধ হইতে পারে কিন্তু "সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়" দুর্ব্বল। "উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে" ইহার পরিবর্ত্তে "উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া" ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাঙ্গলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশতঃ বলায়

পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বার বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সঙ্গীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই একটি প্রাকৃত গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙ্গালী জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক, এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস, সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সঙ্গীতের লাঘব করে। কিন্তু "মনে রৈল সই মনের বেদনা। প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি আর বলা হল না" ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ সুতরাং সংস্কৃতে কাব্য রচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসান বাহুল্য।

হিন্দি সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, হিন্দিতে যে সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষমাত্র করিয়া সুর শুনানই

হিন্দিগানের প্রধান [illegible] সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতা[illegible] কবির গান, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী গান, [illegible] দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্য গানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই সকল কারণে বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

ভাসমান।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হচ্চে 'আইডিয়াল্' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাতপা নাড়া দেখ্‌তে পাই মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চল্‌চে ফিরছে, যাচ্চে আস্‌চে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়। কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে' মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালবাস্‌তে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহলে আপনার স্বজাতীয়কে দেখে' এস্থানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না। কিন্তু তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যবরণ দূর করে' অন্তরঙ্গ মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। তখন ভ্রম হয় ইংলণ্ডে পদার্পণ করবামাত্রই এই সব মানুষের সঙ্গে বুঝি পথে ঘাটে সম্মিলন হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরাজ, কেবল বিদেশী;—তাদের চালচলন ধরণধারণ যা কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকেলে পুরাতন সেটা ঢাকা পড়ে' থাকে; সেই জন্যে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্‌লে "ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে

আসিবে কত শোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

রাগিণী দেশ মল্লার—রূপক।

৩—৪।৩

।১।২।০।

১ ২ ০
॥ ধা পধা মা। গা রা গা সা। রা রমা মা।
॥ এ ম ন। দি নে তা রে। ব লা যা।

-া ॥
।-া -া -া -গমা। রা মা মা। পা পা পধা -া।
।— — — য়। এ ম ন। ঘ ন ঘোর —।

ক্র ... ... ব্র (ম্)
।ঞা ধা ঞা। -া -া -া -া। ধা পধা মা।
।ব রি ষা। — — — য়। এ ম ন।

।গমা রা গা রসা। রা গমপা মপমগা। -মা -া -া -গমগা।
।দি নে ম ন। খো লা যা। — — — য়।

।রা মা মা। পা পা পা ধপা। মা পা পা। না না র্সা র্সা।
।এ ম ন। মে ঘ স্ব রে। বা দ ল। ঝ র ঝ রে।

।না র্সর্রা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা। মা ধঞধা পধপা।
।ত প ন। হী ন ঘ ন। ত ম সা।

(মৃ)

। -। -। -। -॥ সা সা সা। সা সা সা সা। সা নৃসরা রা।
। — — — য়॥ সে ক থা। শু নি বে না। কে হ আ।

। -। -। -। -। রা রা রা। রা -। নৃ সা। রা সরগা গা।
। — — — র,। নি ভৃ ত। নি — র্জ্জ ন। চা রি যা।

। -। -। -। -। গা গা মা। মা পা পা ধপা। মা পা পা।
। — — —র,। দু জ নে। মু খো মু খি। গ ভী র।

। ধা ধা ঞা ঞধা। পা ধা পধা। মা মগা রা গরা।
। দু খে দু খী। আ কা শে। জ ল ঝ রে।

। সা গমগা রগরা। -। -। -। -। গা রগরা সা। সা সা নৃ নৃসা।
। অ নি বা। — — — র। জ গ তে। কে হ যে ন।

। ধ্‌নৃ ধ্‌নৃসা সা। -। -। -। -। মা পা পর্সা। না -। না না।
। না হি আ। — — — র। ম মা জ। সং — সা র।

ক্র ... ...

। নর্সা ধনর্সা র্সা। -। -। -। -। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা।
। মি ছে ন। — — — ব,। মি ছে এ। জী ব নে র।

... ... রু (মৃ)

। র্সা নর্সর্রা র্সর্রা। -। -। -। -। র্সা নর্রা র্সা।
। ক ল র। — — — ব,। কে ব লি।

। ঞা ঞধা পা ধপা। মা পধা পা। মা গমগা রা রা।
। আঁ খি দি য়ে। আঁ খি র। সু ধা পি য়ে।

। রপা মা মা। গমগা রা গরা সা। রা রমগা রগরা।
। হৃ দ য়। দি য়ে হৃ দি। অ নু ভ ব।

। -। -। -। -। গা রগরা সা। সা সা নৃ নৃসা। ধ্‌নৃ ধ্‌নৃসা সা।
। — — —ব,। আঁ ধা রে। মি শে গে ছে। আ ব র।

। -। -। -। -। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা।
। — — — ব। তা হা তে। এ জ গ তে। ক্ষ তি কা।

। -। -। -। -। ধা র্সা নর্সা। ধা ধা পা পঃধপঃ।
। — — — র,। না মা তে। পা রি ষ দি ।

। মা মগা মপমগা। মা -। -।-গমগা। রা রপা পা।
। ম ন ভা—। — — — র । এ ক দা।

। মা গমগা রা গরা। সা রগা রগা। সা সরা না সা।
। গৃ হ কো ণে। শ্রা ব ণ। ব রি ষ ণে,।

। রা মা মা। পা পা ধা পধা। মা মা পা। -। -। -। -।
। চু ক থা। ব লি য দি। কা ছে তা। — — —র,।

। ধা র্সা নর্সা। ধা ধঞধা পা পধা। মা মগা মপমগা।
। তা হা তে। আ সে যা বে। কি বা কা।

(ব)

। মা -। -। -। মা পা পর্সা। না না না না। নর্সা ধনর্সা র্সা।
। — — — র। ব্যা কু ল। বে গে আ জি। ব হে বা।

ক্র ... ...

। -। -। -। -। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা। নর্সা নর্সর্রা র্সর্রা।
। — — — য়,। বি জু লি। থে কে থে কে। চ ম কা।

... ... বৃ (মৃ)

। -। -। -। -। র্সা নর্সর্বা র্সা। ঞা ঞধা পা ধপা।
। — — — য়। যে ক থা। এ জী ব নে।

। মা পধা পা। মা মগা রগা সা। রমা মা মা।
। র হি য়া। গে ল ম নে। সে ক থা।

। গমগা বা গরা সা। রা রমগা রগবা। -। -। -। -।
। আ জি যে ন। ব লা যা। — — — য়।

ক্র ... ...
। রা মা মা। পা পা মপধা -।। ঞা ধা ঞা।
। এ ম ন। ঘ ন ঘো র। ব রি ষা।

... ... বু ক্র ... ... মৃ
। -। ধঞর্সা ঞর্সঞধা ঞা ॥
। — — — য় ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) স, র, গ, ম, প, ধ, ন, এই সপ্ত স্বর।

(২) স, র, গ, প্রভৃতি স্বরাক্ষরে আকার যোগ করিলেই এক এক মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। ঃ=অর্দ্ধমাত্রা; যথা স্বরলিপির ১৯ পংক্তিতে পঃ ধপঃ; অর্থাৎ পঃ অর্দ্ধমাত্রা ও ধপঃ একত্রে অর্দ্ধমাত্রা; পঃ ও ধপঃ মিলিয়া এক মাত্রা; বলা বাহুল্য "ধপঃ"-র ধ ও প প্রত্যেকে কাজেই সিকিমাত্রা।

(৩) ঞ=কোমল ন।

(৪) উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন রেফ্ ও খাদ সপ্তকের চিহ্ন হসন্ত।

(৫) পার্শ্বের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন—ফিরিয়া গিয়া যেখানে একেবারে থামিতে হইবে কিম্বা অন্য কলি ধরিতে হইবে তাহার শিরোদেশে যুগল-ছেদ বসে। অন্য কলি ধরিবার সময় কখন কখন আস্থায়ীর শেষ সুরের একটু পরিবর্ত্তন হয়—সেই পরিবর্ত্তিত সুর শিরোদেশে বসান হয়। যথা, দ্বিতীয় পংক্তির "-গমা"র উপরে "-।" বসিয়াছে। অর্থাৎ "গমা"র পরিবর্ত্তে "ম"-এর টান্‌টিই চলিবে।

(৬) রূপক তালটি অযুগ্মমাত্রিক; প্রতি তাল-বিভাগে একবার তিন মাত্রা, একবার চার মাত্রা করিয়া পর্য্যায় ক্রমে আসে; তাই ৩–৪।৩ এই তালাঙ্ক চিহ্নে ৩-৪ এইরূপ লেখা আছে; ।- র ডাহিন দিকে যে ৩ লেখা আছে তাহার অর্থ এই;—১, ২, ৩ খুব দ্রুত উচ্চারণ করিলে যতটা সময় লাগে এই গানের প্রত্যেক মাত্রা ততটা কাল স্থায়ী। এই পদ্ধতি অনুসারে, কতটা "বিলম্ব" কতটা "দ্রুত" তাহা যথাযথরূপে ব্যক্ত হয়।

(৭) ক্র-বৃ অর্থাৎ ধ্বনির ক্রমশঃ বৃদ্ধি; ক্র-মৃ=ক্রমশঃ মৃদু; ব=সবলে; মৃ=মৃদুভাবে। এই অলঙ্কার-চিহ্ন শিরোদেশে প্রযোগ হয়।

জীবিত ও মৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাণীহাটের জমিদার শারদাশঙ্কর বাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিযাছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি ছিল। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না;—তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবী নাই কেবল স্নেহের দাবী—কিন্তু কেবলমাত্র সেই সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোট ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কি কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইযা গেল—সময় জগতের আর সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মত বন্ধ

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে এই জন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে মৃত-দেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটীর, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বট-গাছ,বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছুই নাই। পূর্ব্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে; সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোত-স্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটীরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়া-তাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি!"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"মাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আয়ামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটীরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানের সেই কুটীরে গিয়া

উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটীরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটীরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে, কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—"দিদি"—অন্ধকার

ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা—শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় মা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালী গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্‌লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখের পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং দূরস্থ তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে

পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃত-দেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূত-পূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্য-ক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয়

তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পলাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়। সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল। পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত

ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে এক-দণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকট-বর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দো-বস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুর-বাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব!"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিক-

ক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথার কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল, যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ, অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুর-ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিবা অধিষ্ঠান হইল মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝাইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে!"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি!—এই বলিয়া তিনি কোনরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণিহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না! লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখি!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়াকপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি 'তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন! তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি—আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর কোন স্থান গড়িয়া রাখেন নি তখন কাজে কাজেই, বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই!"

এম্‌নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল, যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি নিশিন্দাপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল!" শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড়ে পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে!"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনিনা, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি শুনিতে কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"—

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না। উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে। একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম!" আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!" অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।" ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে, একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, জল্ দে!"—আ মরিয়া যাই! সোনা আমার তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস্ নাই! তাড়া-

তাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল। যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকিমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"—কাকিমা কহিল "হাঁ খোকা!" "আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?" ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"কাকিমা, তুই যা!"—কাদম্বিনী আজ অনুভব করিয়াছে যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই।—সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই। ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি!"

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন "ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!"—তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!" বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন বলিল "এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!" শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল! তখন কাদম্বিনী "ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

লোক-চেনা।

ইতিপূর্ব্বে "বালক"-পত্রিকায় মুখ-চেনা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। কিন্তু মুখ-চেনা অপেক্ষা লোক-চেনা আরও ব্যাপক; ইহার মধ্যে মুখচেনা, মাথা-চেনা, আকৃতি-চেনা, প্রকৃতি-চেনা সকলই আইসে। আমরা সকলেই একটু না একটু লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়া থাকি—কখনও চিনিতে পারি, কখনও বা ভুল করি। অধিক স্থলেই আমরা মোটামুটি একরকম চিনিতে পারি। একজন লোককে প্রথম দেখিবামাত্রই তাহার সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা আমাদের মনোমধ্যে স্বতই উদয় হয়; এই ধারণা সকল সময়েই যে ঠিক্ হয় একথা বলা যায় না। লোকের সহিত যাহার যত বেশি ব্যবহার, লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যার যত বেশি, তার সেই পরিমাণে লোক-চেনায় কম ভুল হয়। লোকের সহিত ব্যবহার থাকিলেই যে সকলের লোক চিনিবার শক্তি হয় তাহাও নহে। কেহ কেহ চিরজীবন লোকের সহিত ব্যবহার করিয়াও লোক চিনিতে পারে না—কেহবা স্বভাবতই লোক চিনিতে পটু। লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখি এখনও লোকচরিত্র-বিদ্যা অসম্পূর্ণ—এখনও উহা বিজ্ঞানের সামিলে আসে নাই। সেই জন্য তাহাদের সব কথাই যে বেদ-বাক্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। নিয়মগুলি প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবন-ক্ষেত্রে মিলাইয়া দেখিবেন—ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্ অন্তত সব জিনিস খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার একটা অভ্যাস জন্মিবে—পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হইবে। য়ুরোপীয়-

দিগের তুলনায় আমাদের এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি কম। আমরা বাহিরের সকল জিনিসই যেন চোখ বুজিয়া দেখি,—বহির্দৃষ্টি আমাদের নাই বলিলেই হয়, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিই প্রবল। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ আচার্য্যেরা লোক-চেনা সম্বন্ধে যে সকল সূক্ষ্ম নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ঠিক না হইলেও তাঁহাদের বিবৃত মূলতত্ত্ব যে অকাট্য সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের একটি মূল কথা এই—"যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি; যেমন প্রকৃতি তেমনি আকৃতি।" একজন কুস্তিগির পালোয়ানকে দেখ—আর একজন টুলো ভট্টাচার্য্যকে দেখ—উহাদের আকৃতি দেখিবামাত্র উহাদের প্রকৃতি একেবারেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আর একটি মূল কথা এই, ব্যক্তি-বিশেষ বা জীববিশেষের যেরূপ দেহের আকার তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও প্রত্যেক অংশও সেই দেহের অনুযায়ী—সমস্তের সহিত প্রত্যেক অংশের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একজনের কেবল হাতের তেলো দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার সমস্ত দেহের প্রকৃতি কিরূপ। Agassiez প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভূস্তর-নিহিত একটি অস্থি খণ্ড দেখিয়াই বলিতে পারেন, সে অস্থিটি কোন্ শ্রেণীর জীবের। লোক-চেনার উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ হয় বেশি কথা বলা অনাবশ্যক। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, আদালতে, বর-কন্যা-নির্ব্বাচনে, কর্ম্মচারী-নিয়োগে লোক-চেনা যে বিশেষ কাজে আইসে তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব আর বেশি বাক্যব্যয় না করিয়া আসল কথায় আসা যাক্।

একজন লোককে দেখিবামাত্র প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার দৈহিক প্রকৃতি কিরূপ, দৈহিক প্রকৃতির অবস্থা জানিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে। আমাদের আয়-

বৈদ্যে তিন প্রকার দৈহিক ধাতুর উল্লেখ আছে—বাত, পিত্ত ও কফ। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্য তাহার বায়ু-প্রকৃতি, যাহার শ্লেষ্মা বা কফের প্রাধান্য তাহার কফ-প্রকৃতি, যাহার পিত্তের প্রাধান্য তাহার পিত্ত-প্রকৃতি। পুরাতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও কতকটা এইরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। আমরা যাহাকে বায়ু-প্রকৃতি বলি, তাঁহারা তাঁহাকে স্নায়ু-প্রকৃতি বলিতেন আমরা যাহাকে কফ-প্রকৃতি বলি তাঁহারা তাহাকে লিম্ফ্যাটিক্ অর্থাৎ রস-প্রকৃতি বলিতেন—কিন্তু পৈত্তিক প্রকৃতির নামকরণে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আমাদের যা তাঁহাদেরও তাই। তবে, তাঁহাদের আর একটি শ্রেণী বেশি ছিল—তাহা রক্ত-প্রকৃতি। আধুনিক শিরোতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আবার ইহাই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। তাহা এই—(১) মনোময়ী প্রকৃতি; (২) প্রাণময়ী প্রকৃতি (৩) বলময়ী প্রকৃতি। প্রাণময়ী প্রকৃতির অন্তর্গত রক্তময়ী ও রস-ময়ী প্রকৃতি। যাহাদিগের দেহে অস্থি ও পেশীতন্ত্রের প্রাবল্য তাহাদিগেরই বলময়ী প্রকৃতি। পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে হাই-লাণ্ডীয় স্কট ও সুইস্‌জাতি এই লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের পাঠান আফ্‌গান ও সিখদিগেরও বলময়ী প্রকৃতির প্রাধান্য। এই প্রকৃতির লোকদিগের মোটা মোটা হাড়, পাকানো পাকানো দৃঢ় পেশী—ইহাতে কবিয়া শরীর বলবান ও কষ্টসহ হয়। যাহাদিগের বলময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদিগের স্বভাবও প্রবল; তাহারা সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ; কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহারাই নেতা। চিন্তাশীলতা অপেক্ষা তাহাদিগের দর্শন-পরতা অধিক। চিন্তা-শীল ব্যক্তিগণ যে কার্য্যোপায়-প্রণালী স্থির করেন, এই প্রকৃ-

তির লোকেরা তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। তাহারা উদ্ধত ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী; যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যে সকল জাতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহারা অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। বলময়ী প্রকৃতির আবার দুই প্রকার ধাঁচা আছে—এক পেশীময়ী—আর এক অস্থিময়ী। যে শরীরে অস্থির প্রাবল্য—অথচ পেশী কম, তাহাদিগের গঠন-রেখা কোণ-বিশিষ্ট ও খোঁচাল—তাহারা বড়ই অলস; তাহাদিগকে শীঘ্র চাগান যায় না, কিন্তু একবার চাগাইয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের আবার থামানো যায় না। এই ধাঁচার লোকদিগের কাজ-কর্ম্ম, চলা-ফেরা বড়ই অশোভন ও অনিপুণ, ইহাদের রকম-সকমও বর্ব্বরের ন্যায়। অস্থি ও পেশীর যখন সামঞ্জস্য হয় তখনই বলের সহিত শোভনতা ও পটুতা মিলিত হয়, তখনই বলময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়।

যাহাদিগের দেহে পুষ্টি-তন্ত্রের প্রাধান্য—অর্থাৎ পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্ত-পরিচালন যন্ত্রসকল অধিক কার্য্যকরী তাহাদিগেরই প্রাণময়ী প্রকৃতি। যাহাদের বক্ষদেশ প্রশস্ত, যাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র ও রক্ত চালন যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অধিক-কার্য্যকরী তাহাদিগকে রক্ত-প্রকৃতি বলা যায়। তাহারা একটুতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে ও সর্ব্বদাই ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। তাহারা যেরূপ চিরোৎফুল্ল ও দৈহিক স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট তাহাতে অভিরিক্তমাত্রায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দিকে তাহাদিগের ঝোঁক থাকা অসম্ভব নহে।

যাহাদের ঔদরিক যন্ত্র সকল বেশি কার্য্যকরী, তাহারা রসময়ী প্রকৃতির লোক—তাহারা লম্বোদর, নাদুস-নুদুস্ ও গোল-গাল; তাহাদিগের রক্ত-চালনা ঢিমা-চালে সম্পন্ন হয়—তাহাদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও মন্দীভূত, ক্ষীণ ও আলস্য-জড়িত। এই প্রকৃতির

লোকদের না আছে মনের বল, না আছে শরীরের বল। ইহারা নিদ্রালু, অলস, ও উদর-পরায়ণ—রোগ দ্বারা ইহারা শীঘ্র আক্রান্ত হয়। কিন্তু রক্তময়ী ও রসময়ী প্রকৃতির যদি সামঞ্জস্য হয় অর্থাৎ বক্ষ ও উদর এই উভয় প্রদেশেরই যন্ত্রগুলি যদি যথা-নিয়মে কার্য্য করে তাহা হইলে প্রাণময়ী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ হয়—শরীরের স্বাস্থ্য ও বলের বৃদ্ধি হয়। ভৌতিকের দিকে একটু বেশি টান হয় বটে—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও একটু বেশি সক্রিয় হইয়া উঠে সত্য—কিন্তু ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত বৃত্তির সংযোগ থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বেশি মাথা তুলিতে পারে না। যাহাদের প্রাণময়ী প্রকৃতি প্রবলা তাহাদের শারীরিক উদ্যমের কাজ ভাল লাগে ও তাহাদের মানসিক ক্রিয়া সকলও সহজ ও বহুপথগামিনী; দৃঢ়তা অপেক্ষা তাহাদিগের মনের স্থিতিস্থাপকতা সমধিক। ইহারা যতটা পরিশ্রমী ততটা অবিরতচেষ্ট নহে অর্থাৎ কোন বিষয় সংসাধনের জন্য ইহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে পারে না। ইহারা চট্ করিয়া একটা বিষয় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে, ইহাদের কল্পনা তেজস্বিনী, নিজ মনের ভাবও ইহারা শীঘ্র ও সহজে প্রকাশ করিতে পারে—কিন্তু ইহাদের গভীরতা অপেক্ষা চটক্ বেশি। এক বিষয়ে ইহারা অধিকক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না—কারণ, ইহারা বৈচিত্র্য ভালবাসে। ইহাদের বিপুবেগ প্রবল কিন্তু কোনও ভাবই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না—সর্ব্বদাই মেজাজের পরিবর্ত্তন হয়। ইহারা প্রফুল্ল, উচ্ছ্বাসময়, খোলা-প্রাণ, প্রিয়-দর্শন; ইহারা উপাদেয় আহারাভিলাষী, আরাম ও আয়েসের অনুরাগী। বস-প্রকৃতি লোক অপেক্ষা ইহারা সহজে কুপথগামী হইতে পারে কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির শাসনাধীনে থাকিতে পারিলে এই প্রকৃতির লোকেরা বড় সুখী হয়। যেমন নিজে

সুখী হয়—অন্যকেও তেমনি সুখী করে। যাঁহারা মনোময়ী প্রকৃতির লোক তাঁহাদের বড় মাথা, কপাল প্রশস্ত ও উন্নত—কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ও সুকুমার। তাঁহাদের মুখ আয়ত-দীর্ঘ। কপালের দিক চওড়া হইয়া মুখ ক্রমশঃ সরু হইয়া আইসে। তাঁহাদের হৃদয়ভাব ও ভাষা সমুন্নত ও সুরুচি-সম্পন্ন—যাহা কিছু স্থূল, কদর্য্য, মলিন ও ইতর তৎপ্রতি তাঁহারা সহজেই বীতরাগ। তাঁহারা হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করেন তাহা অতি জ্বলন্ত, সুস্পষ্ট ও সুতীব্র এবং তাঁহাদের ধারণা ও কল্পনা অতিশয় দ্রুতগতি; তাঁহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় যতটা সুখানুভব করেন অন্য প্রকৃতির লোক ততটা করে না। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক ব্যাপারের অনুশীলনে তাঁহারা অধিক রত। সাহিত্য, কবিতা, চারুশিল্প তাঁহাদিগের সাধের জিনিস।

মন প্রাণ বল এই ধাতুত্রয়ের এক একটি কাহারও প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় থাকিলে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাই এতক্ষণ বর্ণনা করা হইল; কিন্তু আসলে এরূপ স্বতন্ত্রভাবে উহাদিগকে দেখা যায় না; প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিতে এই তিন ধাতু বিমিশ্র ভাবে থাকে—কাহারও কোনটা কম কাহারও কোনটা বেশি। এই ধাতুত্রয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য অতি বিরল; তবে কাহারও কাহারও প্রকৃতি, সামঞ্জস্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর। এই ধাতুত্রয় তাহাদের প্রকৃতিতে এরূপ ভাবে মিশ্রিত থাকে যে বুঝা দুর্ঘট উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় তিনটির মধ্যে দুইটি প্রবল ও একটি ক্ষীণতর; এই ধাতুত্রয়ের বিভিন্ন সমাবেশ অনুসারে কাহারও বা মনোপ্রাণময় প্রকৃতি কাহারও বা বলপ্রাণময় প্রকৃতি—কাহারও বা মনোবলময় প্রকৃতি—এরূপ নানাপ্রকার

মিশ্র প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক মিশ্র প্রকৃতির আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে—তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিলে বাহুল্য হইয়া পড়ে। মোট কথা, লোক চিনিতে গেলে প্রথমত দেখা আবশ্যক যাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি সে কিরূপ ধাতের লোক। মোটামুটি তাহার প্রকৃতি জানা হইলে আরও সূক্ষ্মরূপে তাহার অবয়বাদি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ।

একটা জিনিষ যথার্থ কি অর্থাৎ সেটা কোন্ শ্রেণীভুক্ত তা' নির্ণয় করতে গেলে, তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে' দেখে' তার স্বরূপগত গুণ থেকে তার অবস্থাঘটিত গুণগুলো বিচ্ছিন্ন করে' দেখা আবশ্যক। সাহিত্য কি তা স্থির করতে গেলে তাকে ভিন্ন অবস্থায় দেখে বেছে নিতে হবে, তার কোন্ গুণগুলি নিত্য এবং কোন্ গুণগুলি ক্ষণিক। যদি কোন লেখার এমন কোন গুণ পাই যার অভাবেও আমরা তাকে সাহিত্য বলে' গণ্য করতে পারতুম তবে তাকে সাহিত্যের স্বরূপগত গুণ বলা যেতে পারে না। তুমি যাকে সাহিত্যের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধতত্ত্ব বল্‌চ সেই গুণটি সব সময়ের সাহিত্যে পাওয়া যায় কি না এটা দেখ্‌লে আমাদের মীমাংসার অনেকটা সাহায্য হতে পারে।

আমি লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন সাহিত্য বিশেষ কিছু জানিনে তাই এ বিষয়ে জোর করে' কিছু মতামত দিতে পারচিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই মূলতত্ত্বটি একটি আধু-

নিক সৃষ্টি। পুরাতন সাহিত্যে ছিল কি না সন্দেহ, আর যদিও বা থাকে আজকালকার চেয়ে ঢের কম।

অবশ্য আমি এমন কথা বল্‌তে চাইনে যে সাহিত্যের খুব আদিম সময়েও এই মূলতত্ত্ব একেবারে ছিল না। কেননা সমাজ ব্যতীত সাহিত্যের সম্ভব নয়, আর সমাজের ভিত্তিই হচ্চে নীতি—এবং নীতির মূল হচ্চে এই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান। এমন কি আমরা চখে যখন্ কোন জিনিষ দেখি তদ্দ্বারাও বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তর্প্রকৃতির একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই হিসাবে তুমি যদি বল যে সাহিত্যের মধ্যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক তাহলে ও-বিষয়ে আমার বিশেষ কোন কথা নাই—কেন না মানুষের প্রত্যেক কার্য্যে এবং চিন্তায় সেই মূলতত্ত্ব অবলম্বন থাকা চাই। চিন্তার অর্থই মনের সহিত অ-মনের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু সাহিত্যের মূলতত্ত্ব বলে' একটা বিশেষ উল্লেখ করতে গেলে এই সাধারণ মূলতত্ত্ব ছাড়াও আর একটা কিছু মনে উদয় হয়।

এই জিনিষটা ঠিকটি কি তা বোঝানো শক্ত কিন্তু আজকালকার প্রধান কবিদের লেখা পড়লে অনেকটা পরিষ্কার হব। শেলি বল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই বল, টেনিস্‌ন্‌ই বল, এমন কি বায়রণও, এঁরা সকলেই আমি কি এবং এই জগতের মধ্যে আমার স্থান কোথায়, সৌন্দর্য্য ভালবাসা ইত্যাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি এই ভাবটা নিয়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই ব্যতিব্যস্ত ভাবটাকেই তুমি বোধ হয় মূলতত্ত্ব হিসাবে ধরচ। এ ভাবটা কিন্তু আজকালই দেখা যায়। পুরাকালে সাহিত্যকারগণ আমাদের চখের সামনে সুন্দর ছবি দিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তেন—তর্জ্জমায় গ্রীক সাহিত্য যতদূর দেখেছি তাদের লেখার সঙ্গে তাদের মূর্ত্তি-

রচনার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমার বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ সরলভাবে সৌন্দর্য্যবিকাশের প্রতিই লক্ষ্য ছিল। আজকাল কিন্তু আমরা কিছু বেশি বিশ্লেষণের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমাদের দার্শনিক ভায়াদের উপদ্রবে আমরা সৌন্দর্য্যকে সুন্দর ভাবে দেখে' তৃপ্তি লাভ না করে' তার বুক চিরে তার কঙ্কাল বাহির করি। এর একটা কারণ হচ্চে আজকাল আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে এসেচে। তার সঙ্গে খানিকটা সন্দেহ মিশে গেছে। তাতেই কিন্তু বিশ্বাসের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দিয়েচে। বিশ্বাসকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হচ্চে বলে তার অস্তিত্বটা সকলের কাছে প্রবলরূপে প্রতীয়মান হচ্চে।

একহিসাবে কিন্তু সব সময়ই সাহিত্যে সেই সময়ের মূলতত্ত্ব এবং লেখকের নিজের মূলতত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পাবেই। মানুষ বর্ণনা করতে গেলেই তাকে সমাজের অঙ্গীভূত রকমে বর্ণনা করতে হবে। সুতরাং কি ভিত্তির উপর সে সমাজ স্থাপিত এবং তখনকার কি আইডিয়াল্ তা কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত হবে। লেখকও তার নিজের আইডিয়াল নিজের বিশ্বাস নিজের মূলতত্ত্ব তার মধ্যে খানিকটা প্রকাশ না করে' থাকতে পারে না। এই জন্যই এক এক যুগের সাহিত্য সেই যুগের দর্পণ। আজকাল আমাদের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করবার একটা চেষ্টা আছে তাই এই যুগের সাহিত্য থেকে ইহাকে সংশয়াপন্ন এবং অন্তর্দর্শনশীল কাল বলে' আমরা জান্তে পারি। এই হিসাবে এক এক যুগের সাহিত্য সেই সেই যুগের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে।

কিন্তু যদিও এই মূলতত্ত্ব প্রকাশ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী তথাপি তাকে সাহিত্যের স্বরূপগত বলা যেতে পারে না। মনে

ক্ষব আমি এমন সুনিপুণ সাহিত্য-জালিয়াৎ যে আমি এই উনবিংশ-শতাব্দীতে বসে' মহাভারতের সময়ের একটা বিবর নিয়ে ঠিক মহাভারতের লেখার মতন মহাকাব্য লিখতে পারতুম। তাকে কে না সাহিত্য বল্‌বে? অথচ এর মধ্যে কি মূলতত্ত্ব রইল? আমার নিজের নিত্যত্ব রইল না—থাক্‌লে সেটা দূষণীয়—আর লেখকের সমসাময়িক মূলতত্ত্ব তাও তাতে নাই—যদি কিছু থাকে তবে সেটা প্রাচীন কালের মূলতত্ত্ব।

আমি তোমাকে অনেক রকম উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টায় আছি যে নিজের নিজত্ব কিম্বা রচনাকালীন সময়ের বিশেষত্ব প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে স্বরূপগত আবশ্যকীয় নয়।

ঠাকুরঘর।

বড় ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা গায়ে পাতিয়া লয়। বিশেষতঃ যদি দুটো অপবাদের কথা থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে সকলেই মনে করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভাবি খুসি হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে—নতুবা এমন লোক আর কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহঙ্কারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে ত খুসি হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই দুই দশজন নয়

বাবু, অক্ষয় বাবু সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার নীচ শ্রেণীতে এই গানটী শুনা যায়।

বঁধু আছে উপবাসী, সরু চিঁড়ে কুটায়েছি
দুধকে পাঠায়েছি কলসী।
বঁধুকে খাওয়াব ভাত, কোথায় পাব মাগুর মাছ
কালীদহে ফেলায়েছি জাল।

এই বঁধু স্বামী না স্ত্রী না কুটুম্ব? বঁধু শব্দ প্রিয়ার প্রতি কি ব্যবহার হইত না?

মানিনি আব উচিত নহি মান।
এখনুক রাগ এহন সন লগহছি
জাগল পয় পচোবান।
জুড়ি রহনি চকমক কর চানন
এহন সময় নহি আন।
এহি অবসব পহু মিলন জেহন সুখ
জকরহি হোয় যে জান।

বিদ্যাপতি।

বঁধু ও পঁহু যে একই শব্দ ইহা বিদ্যাপতির একটী গানে স্পষ্ট দেখা যায়।

নেহুক বন্ধু স্নেহো ছুটি গেল
দুহু কব পহুক খেলাওন ভেল।

'ধ' যে 'হ'-তে এবং 'ব' যে 'প'-তে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা সকলই জানে। আমরা যাহা ধড়পড় বা ধড়কড় বলি বিহারীরা তাহাই হড়বড় বলে। আমরা আঁকুবাঁকু বলি সাঁওতালেরা হাঁকোপাঁকো বলে। রাধিকা রাই বা রাহী শব্দে পরিণত হইয়াছে, সুধায়লি সোহায়লি হইয়াছে। বন্ধ শব্দ বাহু ও বহু হইয়াছে। হিয়া শব্দ হৃদয় বা ধীরা হইতে হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না। ঝিয়ের বহিরা হইয়াছে। বধূ বহু হইয়াছে, বিধি বিহি হইয়াছে।

স্বরের ক্রমবিকাশে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয়। ক্রমবিকাশের পর্য্যায় অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালা গ্রথিত হইয়াছে। ক খ গ ঘ স্বরের ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। যেরূপ সংযোগে এক বর্ণ বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণে পরিণত হয় সন্ধিসূত্রে তাহার উল্লেখ আছে। এগুলি দেবভাষাকথক সভ্যজাতির বাগ্‌যন্ত্রের উন্নতির পরিচয় দেয়। কিন্তু অপর জাতির অনুন্নত কণ্ঠে তাহারা কি রূপ ধারণ করে এবং সংযোগের বৈপরীত্যে কিপ্রকার বর্ণসঙ্কোচন হয় তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ক স্থানে গ, প স্থানে ব কখন্ হয় ইহা পাওয়া যায় কিন্তু গ স্থানে ক ও ব স্থানে প কখন্ হয় তাহা পাওয়া যায় না। হয়ত এরূপ অপভ্রংশতা নিবারণ করিবার জন্য অথবা ব্যাবৃত্তি অপেক্ষা সঙ্কোচন বিরল বলিয়া বৈয়াকরণেরা ইহাদের প্রক্রিয়া সূত্রবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাই বলিয়া ব্যবহারে গ স্থানে ক, জ স্থানে চ, দ স্থানে ত বা ব স্থানে প নিতান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তিকা বত্তিকা বত্তী (বাতি) ও পলতি হইয়াছে।

বল্লী পল্লী হইয়াছে।

বাত (সংবাদ) পাতা হইয়াছে।

বাবা বাপ হইয়াছে।

বাবু বাপু হইয়াছে।

বারি পানি হইযাছে।

অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নাই কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

সে যাহা হউক বিদ্যাপতির বাঙ্গালা অনুবাদক প্রাচীন

মৈথিলী গ্রন্থে পঁহু শব্দ দেখিয়া তাহাই বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়াছেন। পাঁহুন শব্দ অদ্যাপি বিহারে প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি বঁধু ও পঁহু উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন, উভয় শব্দই প্রিয়তম অর্থে পুরুষ ও নারীর প্রতি ব্যবহার হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রমতে বন্ধু হইতে বঁধু, বঁধু হইতে বঁহু, বঁহু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রভুশব্দ হইতে পঁহুশব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। আমার এই বোধ হয়। কিন্তু আমার যে ভ্রম হয় নাই তাহা আমি বলিতে পারি না।

মধুপুর।
২১ জুন। ১৮৯২।

বশম্বদ
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
মান্যবরেষু।

আপনি বলিয়াছেন "অপভ্রংশের নিয়ম সকল জাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।"

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এই জন্যই বাঙ্গলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে "শব্দশাস্ত্রের কোন সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।" কিন্তু যে হেতুক বাঙ্গলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই ইহার সূত্র নির্দ্ধারণ করার কোন উপায় নাই। অতএব বাঙ্গলার আরো দুই চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি, আপনার তর্কটা এই, যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোন সংশ্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। "বন্ধু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই। যথা—ক্লক্ষ হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্ত্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্ব্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণতঃ অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই একটি শব্দ উদাহরণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—শৈবাল হইতে শেঁয়লি, শ্রাবণ হইতে সাঙন।

তবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ধ" যেমন "হ"য়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তেমনি পবর্গের চতুর্থ বর্ণ "ভ" ও অপভ্রংশে "হ" হইতে পারে এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোন মতান্তর নাই। তথাপি দুই একটা উদাহরণ দেওয়া কর্ত্তব্য—যথা, শোভন হইতে সোহন। গাভী হইতে গাই। (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই।) নাভি হইতে নাই। ("হি" হইতে "ই" হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোন ভ্রম না থাকে তবে "প্রভু" হইতে "পঁহু" শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহুর উদ্ভব হইতে আটক নাই আপনি তাহার

প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত "পঁহু" শব্দ বিদ্যাপতির কোন মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি? আমি ত গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলা-প্রচলিত পুঁথিতে কোথাও "পহু" ছাড়া "পঁহু" দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বহু, বহু হইতে পহু এবং পহু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙ্গালীর মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে ইহাই আমার নিকট অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর একটা কথা এই যে,—বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথা—"গোবিন্দদাস পহুঁ নটবর গৌর", "রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ," "নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান" ইত্যাদি। এস্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধুশব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দুই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত স্থানে দেখিয়াছি, যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই, যদি আপনার সন্দেহ থাকে ত ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়তঃ, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্বঅনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ

পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ "হ"যে এবং "ন" চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্য্যয় নিয়ম-বিরুদ্ধ হয় নাই।

নিবেদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা।

জাতির অবস্থার সহিত ধর্ম্মের যোগ অনুভব করিতে হইলে একবার বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—বিশেষতঃ বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং যে সমস্ত গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণন কিম্বা পূজাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড শাসক—তাড়না করেন, লাঞ্ছনা করেন, গঞ্জনা দেন, অকথ্য বলেন এবং খেয়াল অনুসারে কুত্তা লেলাইয়া দিয়া তামাসা দেখেন। আমরা লাঞ্ছনা সহি, গঞ্জনা সহি, গালি খাই এবং কুত্তাকে বিষম ভয় করি। রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ্ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের একশেষ। স্থানাস্থান

বোধ রাজদণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জ্জিই একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা।

যেমন রাজশাসন দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসন-তন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছে মাত্র। অপরিণত-বুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্ব্বনাশভয়ে দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্ব্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোড়াশোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।

দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগদ্বেষভয়হিংসা-বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায়। এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনও ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদ্‌শাহদেরই মত খামখেয়ালী মেজাজ—ক্ষণে কষ্ট ক্ষণে তুষ্ট—কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয় বুঝা ভার। খেয়ালবশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয় তাহাকে ধন দেন রত্ন দেন, নবাবী প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইহাঁদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয় তাহার প্রতি তেমনি দুর্জ্জয় কোপ—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অনুগ্রহনিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাকে আমল দেওয়া চলে না। এবং সেটুকু কারণও অনেক সময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক

ঘটাইয়া থাকেন। হয় ত পুরাতন ভক্তে অরুচি জন্মিয়াছে, নূতন নহিলে মন উঠে না—অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কি করেন?—ভক্তের প্রতি এক দুঃসাধ্য হুকুম জারী করিলেন। ভক্ত বেচারী প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য আদেশ পালন করিয়া মরিল; কিন্তু দেবতার মায়া ত আর সে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহার মধ্যে গোপনে একটু ত্রুটি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাহির হইয়া আসিল—দুর্ব্বল ভক্তসন্তানের এতদিনের কামনা ভক্তির চরম পুরস্কার!

এইরূপ খামখেয়ালী আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। কেবলি মানবের প্রতি নহে, ছোট দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারও এইরূপ। চণ্ডীর একবার সখ হইল, ইন্দ্রকুমার নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যে আপন পূজা প্রচার করিবেন। উপায় ঠাহরাইলেন, একটা কোন ছুতায় অভিশাপ দিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিতে হইবে। ভগবতী শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিব মহা সঙ্কটে পড়িলেন। ইন্দ্র তাঁহার একজন একান্ত অনুগত সেবক, নীলাম্বর তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র, শিবপূজার জন্য স্বহস্তে ফুল তুলিয়া আনেন—বিশেষতঃ নীলাম্বরের শরীরে তিলমাত্র পাপ নাই; কোন্ ছুতায় শিব তাহাকে অভিশাপ দিবেন? ভগবতী পরামর্শ দিলেন—তাহার আর ভাবনা কি,

যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিবা কি দোষ তোমার॥

শিব অবিলম্বে সম্মত হইলেন। এখন কেবল নীলাম্বরের মহী ইচ্ছা করার অপেক্ষা।

ভগবতী মায়াপ্রভাবে একদিন নন্দনের সমস্ত ফুল হরণ করিয়া

রাখিয়াছেন। নীলাম্বর স্বর্গলোকে ফুল না পাইয়া পৃথিবীতে ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ব্যাধ ধর্ম্মকেতু এক রূপসী হরিণের পশ্চাতে তাড়া করিয়াছে—হরিণ আর কেহ নহে, স্বয়ং ভগবতী স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। নীলাম্বরের মন এই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ফুল হইতে বিচলিত হইল এবং তিনি মনে মনে বলিলেন যে, মালাকারের মত সাজি হাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ব্যাধের জীবন ঢের ভাল। ব্যাধজন্মের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যেটুকু বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে ফুলের সহিত একটি কণ্টক সংগ্রহ করিয়া আনার, এবং দেবী-চণ্ডীর কৃপায়, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিয়েন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥

নীলাম্বর বা ইন্দ্র কেহই তাহা জানেন না। সুতরাং যখন

কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কণ্টক ভুঁকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥

মহাদেবের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ভীমমুখে তিনি ইন্দ্রকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, ফুল আমি তুলি নাই, নীলাম্বর তুলিয়াছে। নীলাম্বরের কৈফিয়ৎ তলব হইল, কিন্তু সে কৈফিয়তে কোন ফল হইল না। চণ্ডীর পরামর্শ মহাদেব ভুলেন নাই। অভিশাপ বাহির হইল—

মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
বধিতে চলহ নহী দিনু অভিশাপ॥

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মহাদেব টলিলেন না।

আর একবার চণ্ডীর সখ হইল, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে হইবে। পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিয়া তিনি ঠাহরাইলেন, ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন। রত্নমালার প্রতি হুকুম জারী হইল—হরের সভায় আসিয়া নৃত্য কবিবে। রত্নমালা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সভা পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন, রত্নমালা তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা সকলেই নৃত্যে মুগ্ধ। কিন্তু চণ্ডীর ত নৃত্য দেখা উদ্দেশ্য নয়—রত্নমালাকে মর্ত্তো পাঠাইতে হইবে, একটা কোন ছুতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়া চাহি। মদনকে দেবী টিপিয়া দিলেন, রত্নমালার প্রতি একটা বাণ হান। মদন সম্মোহন শর ছাড়িলেন। রত্নমালার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল এবং তাল ভঙ্গ হইল। চণ্ডী শাপ দিয়া বাঁচিলেন।

বিচার এবং বিবেচনা বঙ্গসাহিত্যের দেবতাদের নিকট কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। কেবলি একদল খেয়ালপরিচালিত কর্ত্তৃপক্ষ—যাহার প্রতি অনুকূল হয়েন তাহার সাত খুন মাফ এবং বিমুখ হইলে বিনা দোষেও উৎপীড়নপরাঙ্মুখ নহেন। কালকেতুর নগর বসাইতে হইবে—সেই জন্য চণ্ডী বিনা দোষে কলিঙ্গদেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রথমে ত কলিঙ্গনগরে গিয়া ঘরে ঘরে স্বপ্ন দিয়া আসিলেন যে, বীর কালকেতু যে নগর বসাইতেছেন তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর, অনেক ধনদৌলত মিলিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু স্বপ্ন সকলে শুনিল না। সুতরাং চণ্ডীকে

উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি গঙ্গা সন্নিধানে চলিলেন।

সাধিতে আপন কাম আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভাব।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজার রাজ্য কলিঙ্গ বাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজারে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা সম্মত হইলেন না। স্পষ্টই বলিলেন,

হইয়া বিষ্ণুর অংশা কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজার রাজার॥
মোরে পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অশ্রুমুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী গালি পাড়িলেন। বলিলেন, ভাবি বৈষ্ণবী হইয়াছ দেখিতেছি, যত মকর কুম্ভীর পোষা হয়, আর কাজের সময় সাধ্বী সাজিয়া বসেন, একবার রকম দেখ গা! গঙ্গাও পাল্টা গালি দিতে ছাড়িলেন না। দুই পক্ষে ছড়া কাটাকাটি বেশ জমিয়া গেল। তখন পদ্মাবতী চণ্ডীকে সমুদ্রের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। ভগবতী, সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইল। ঝড়বৃষ্টিতে কলিঙ্গ হাজিয়া গেল। কলিঙ্গের প্রজা লইয়া কালকেতু স্বনগরে পত্তন করিলেন। বেচারা কলিঙ্গরাজের যে কি অপরাধ কেহ বুঝিতে পারিল না।

চণ্ডীর মহিমা সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ রহিল না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, জাগ্রত দেবতা এই বটে। নিত্য নূতন খেয়াল উঠে এবং অবিলম্বে খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ জবরদস্ত নহিলে দেবতা কিসের? কোন্দল করিতে হইবে—আচ্ছা তাই সহি; নৌকা-ডুবি করিতে হইবে—তথাস্তু; কাহাকেও কারারুদ্ধ করাইতে কপটাচরণ করিতে হইবে—বেশ কথা; দেবী কিছুতেই পরা-ঙ্মুখ নহেন। সারাদিন বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতীর সহিত কেবল ফন্দি আঁটিতেছেন—কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, কাহার পূজা লইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিপন্ন কিম্বা লুব্ধ ভক্তের সুদীর্ঘ চৌতিশা স্তবে এক একবার দেবীর মন বিচলিত হয়; পদ্মা-বতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাকে? পদ্মাবতী গণনা করিয়া দেখেন—দেবী গতি করিয়া দেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর যেমন পদ্মাবতী ভারতচন্দ্রের অন্নদার সেই-রূপ জয়া। জয়ার সহিত পরামর্শ না আঁটিয়া অন্নদা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এবং জয়াকে তাঁহার অষ্টপ্রহরই আবশ্যক হয়। অন্নদা চণ্ডীরই বিভিন্ন সংস্করণ। খেয়ালের রকমসকমও চণ্ডীরই অনুরূপ। সখ হইয়াছে, পৃথিবীতে পূজা প্রচার করিতে হইবে; জয়ার পরামর্শানুসারে একটা ছল ধরিয়া কুবেরানুচর বসুন্ধরকে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্ত্যে গিয়া মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। বসুন্ধর দেবীর পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল। দেবী শুনিলেন না। বিষ্ণুহোড়ের গৃহে তাহার জন্ম হইল—নাম হইল হরিহোড়। দুঃখীর ছেলে হরিহোড় অল্পদিনেই বাড়িয়া উঠিল। বনে মাঠে ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই কায়ক্লেশে পিতামাতার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করে।

অন্নদা একদিন বুড়ী সাজিয়া সব ঘুঁটেগুলি একটি ঝুড়ী ভরিয়া রাখিলেন। হরিহোড় ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না। দেখিল, সব ঘুঁটে বুড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হরিহোড় ভাবিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বুড়ীর অনুগ্রহ হইল। সে হরিহোড়কে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়ী হইয়াছি, এত ভার বহিতে পারি না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বহিয়া দাও আমি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে পারি। হরিহোড় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু হরিহোড়ের কুটীর অবধি আসিয়া বুড়ী আর চলিতে পারে না—সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিহোড় বলিল, আমরা আপনার অন্নসংস্থান করিতে পারি না, অতিথিসৎকার করিব কি দিয়া? তখন বুড়ী বলিল, সে জন্য ভাবনা নাই, অন্নপূর্ণার নাম লইয়া হাঁড়ী পাড় দেখি,

হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥

তাহাই ঘটিল। হরিহোড় তখন বুড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নদা পরিচয় দিবার পূর্ব্বে হরিহোড়ের হস্তে একখানি ঘুঁটে দিলেন। ঘুঁটেখানি হেমঘুঁটে হইল। হরিহোড় অবাক্। দেবী তখন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া হরিহোড়কে বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরিহোড় কহে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে এই দেহ বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

অন্নদা তথাস্তু বলিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিয়া

ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বহুস্করে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মর্ত্যভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥

অবশেষে উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধকালে হরিহোড়কে সোহাগা নাম্নী একটি রূপসীর সহিত গৌরী বিবাহ দিয়া দিলেন। হরিহোড়ের ঘরে সোহাগীর শুভাগমন পর্য্যন্ত নিত্য কোন্দল ঝগড়া আরম্ভ হইল। অন্নদা নিজে কোন্দলপটু হইলেও পরের কোন্দল সহিতে পারেন না। হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িবার পন্থা বাহির করিলেন। হরিহোড়

একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান ধরে।
ভাব কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে।
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহর যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন, যে কয়টি দেবতা আছেন এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আগব

কিন্তু সদাগর বুলি ছাড়িল না। অবশেষে বহুদিন পরে বেহুলার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং ধনরত্ন সমুদয় ফিরাইয়া দিলেন। তখন চাঁদ বেণে মনসার পূজা করিল।

বেহুলার সেবার একটু বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবলোকের আরও কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবলোক যতটুকু দেখা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে পৃথিবীর কোন দৌরাত্ম্যেরই অভাব নাই—গালাগালি মারামারি হিংসাদ্বেষ অত্যাচার অবিচার বিভ্রমবিলাস সকলই ষোল-আনা আছে, অধিকন্তু সেখানকার ঋষিরাও নাচের মজ্‌লিসে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। মনসার ভাসানে দেবতাদের ঘরের খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেবতারা কি কাপড় পরেন, তাঁহাদের ধোপানী কে, সে কি দিয়া কাপড় কাচে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেহুলা ত এই ধোপানীর সাহায্যেই কার্য্য উদ্ধার করে। নেত ধোপানীকে সে মাসী বলিয়া ডাকে, দেবতাদের কাপড় দু'এক-খানা কাচিয়া দেয়, এমনি করিয়া ভাবসাব করিয়া থাকে। ধোপানী বেহুলার কাচা খান দুই কাপড় লইয়া গিয়া একদিন দেবসভায় উপস্থিত। সেদিন কিছু পরিষ্কার কাচা হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা বাছা, তুমি এত-দিন কাপড় কাচিয়া আসিতেছ এমন সুন্দর ত কোনও দিন হয় নাই—আজ হইল কিরূপে? নেত বলিল, আমার বোনঝি আসিয়াছে, এ কয়খান কাপড় সেই কাচিয়াছে। তখন

মহেশ বলেন নাহি দেখি এতদিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন॥
দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

পরে বেহুলাকে সে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় লইয়া গেল। সেখানে বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। এখন মনসাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হয়। নেত ধোপানী মনসার প্রিয়সখী—অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া মনসাকে দেবসভায় লইয়া আসিল। দেবতারা পাঁচজনে বেহুলার হইয়া ওকালতী করিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর ফল ফলিল। কিন্তু মনসার তরফে ইনাইয়া বিনাইয়া ন্যাকামি করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই বলা বাহুল্য। একে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, তাহাতে আবার নারী!

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড় কর্ত্তাটির অপকীর্ত্তি ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত 'খেলো' অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ—যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন। নেত ধোপানীর সহিত 'ইয়ারকি' দিতে হইলে সম্ভ্রম বজায় রাখা বোধ করি কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। চরিত্রের বল থাকে না। অন্নদামঙ্গলের শিব মদনের একবাণে একেবারে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য। মদনকে ভস্ম করিয়াছেন নিতান্তই যেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরোধে।

ভাগ্যে ভাগ্যে নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নারদ গৌরীর সন্ধান দিলেন।

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।

নারদ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।

"বাবা" সেদিন চলিলেন না—তাঁহার ত আর দায় নয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিবাহের সব স্থিরস্থার হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার—হুলাহুলির ধুম। এদিকে বাঘছাল খসিয়া পড়ে—শিবের হোষ নাই। মেনকা নারদের উদ্দেশে গাল পাড়িতে সুরু করিলেন,

হাত নাড়ি গলা তাড়ি ভাক ছাড়ি কয়।
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্র ভরসা দিয়াছেন—

কোন্দলের অভাব কি শারদ ঘটক।

যাহা হৌক, বিবাহ করিয়া শিব গৌরীকে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধিঘোটনের ধুম পড়িয়া গেল। তাহার পর হরগৌরীর কথোপকথন। শঙ্কর দেবীকে বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি বঙ্গে॥

গৌরী পুরুষজাতির একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বলিলেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবতাদের এই অবস্থা! পুরুষ মহলে ভাঙ্‌টুকু ধুতুরাটুকু খাওয়া আছে, মজলিসে নাচটা আশটা দেওয়া আছে, এবং আনুষঙ্গিক দোষেরও ত্রুটি নাই; স্ত্রীমহলে ঝগড়া কোন্দল—এখানকার প্রতিনায়া পাড়াকোন্দলীরাও তাহার নিকট হার মানেন।

দেবলোকে সবই আছে—নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগস্বীকার, কোনরূপ উচ্চ আদর্শ। না থাকিবারই কথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণে আমাদের সমস্ত হৃদয় তখন জোড়া—উচ্চ আদর্শ ঠাঁই পাইবে কোথায়? রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র শিথিল—কেবলি রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এবং সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ। সামাজিক আদর্শও এই শাসন-নীতিরই প্রভাবে গঠিত।

এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ এক-ছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি। বিচিত্র বিভিন্ন শক্তি এক বৃহৎ শক্তিতে নিমগ্ন এবং এক মূল শক্তি সহস্র বিরোধী শক্তিকে নিয়ত নিয়মিত করিতেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজতন্ত্রও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। উপধর্ম্ম এবং উপদেবতার প্রভাব প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সার লেপেল্ গ্রিফিন্।

কুকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোন

প্রকার গাম্ভীর্য্য অথবা গৌরব নাই—কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার্ লেপেল্ গ্রিফিন জুন মাসের ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনি হৌক্, বাঙ্গালীদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোন ফল না হউক্ আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই-রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট্ করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কন্‌গ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানা কারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজে দেখে। এজন্য গ্রিফিন্ সাহেব ধন্য।

তিনি আরো ধন্য যে, তিনি কোন যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপক্কতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরাজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্ব্বল

ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কে গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি জিনিষটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে বেচারার কিচিমিচিপূর্ব্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। গ্রিফিন্ যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙ্গালীর কোন স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙ্গালী জিলাশাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙ্গালী মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোন অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূল তত্ত্ব গড়া যায় কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরাজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোন কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে

একটা সংযত আত্মমর্য্যাদা থাকে; কারণ, যে লোক সৌভাগ্যবান্ এবং ক্ষমতাবান্ তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মত যাহারা দুর্ভাগা, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরাজি বড় কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন্ বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্ব্বে নিজেদের পার্লামেণ্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরাজ মন্ত্রীসভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে—এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন।

ভারতবর্ষের কৃষক প্রজাদিগের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ তদন্ত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট সম্প্রতি একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। গত মে মাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় রাজা উদয় প্রতাপ সিং এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, সম্ভ্রান্ত বুনিয়াদী জমিদারদিগের অধঃপতন এবং উকীল মহাজন প্রভৃতি "হঠাৎ জমিদার"দিগের দ্রুত উত্থানই

যে প্রজাদিগের এই দারিদ্র্যের মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই হঠাৎ জমিদারেরা বারোমাস সহরে বাস করেন। নিজ প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। কেবল অত্যাচার এবং অবিচারে ইঁহারা সবিশেষ পটু। সুতরাং ফল যে এইরূপ শোচনীয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এখন গবর্মেণ্ট যদি বুনিয়াদী জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে আশা করা যায়।

গবর্মেণ্ট যতদিন রীতিমত খাজনা পান, ততদিন জমিদারেরা যে শ্রেণীর লোক হৌক না কেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। লেখক বলেন, এই মতটি সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের দেশে জমিদারেরাই যখন গবর্মেণ্ট এবং প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে, তখন উকীল মহাজন প্রভৃতি দ্বারা কি এই সম্বন্ধ সুরক্ষিত হইতে পারে! যাহাদিগের অর্থলিপ্সা রাজভক্তি অপেক্ষা বলবতী এবং প্রজাদিগের সহিত যাহাদিগের কেবল স্বার্থসম্বন্ধ, কোন বিচক্ষণ গবর্মেণ্টও কি তাহাদিগের উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে! যাহাদিগের যুগপ্রবাহিত কুলমর্য্যাদা আছে এবং যাহারা প্রাণ অপেক্ষা মানকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করে কেবল তাহাদেরই দ্বারা নিমকহারামী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উদাহরণস্বরূপে লেখক বলরামপুরের মহারাজা এবং রাজা দেবীবক্স সিংএর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন ব্রিটিশ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তখন ইঁহাদের মধ্যে একজন নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কতক-

গুলি ইংরাজ বন্ধুকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অপরজন বিপন্ন গবর্মেণ্টের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিয়া তবে নিজে বিদ্রোহে যোগ দান করেন। লেখক বলেন, বংশানুক্রমে বীজ সঞ্চিত হইয়া তবে এইরূপ মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়।

সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশের প্রতি সাধারণের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে লর্ড ক্যানিংএর মন্তব্য তুলিয়া লেখক তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। লর্ড ক্যানিং বলেন, অযোধ্যায় যখন বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন, পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া সমগ্র প্রজামণ্ডলী তালুকদারের আদেশে গবর্মেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। প্রজারা জমিদারকেই যে প্রকৃত রাজা বলিয়া সম্মান করে এই ঘটনা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সম্মতিআইন পাশ হইবার সময় এবং রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকালে ইতর সাধারণের উপর উচ্চকুলের যে জয়লাভ হয় লেখক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন প্রকাশ্য আন্দোলন উঠিবার বহুপূর্ব্বে গবর্মেণ্ট উচ্চকুলোদ্ভব জমিদারদিগের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।

এই উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে লেখক তাহারও তিনটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) এইরূপ আইন গঠন করা যাহাতে জমিদারেরা ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা অর্থ কর্জ্জ লইবার নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে না পারে।

(২) যে সকল জমিদার প্রাইমোজেনিচার অর্থাৎ অগ্রজই বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী এইরূপ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী তাহাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা।

(৩) যাহাতে ঋণগ্রস্ত জমিদারেরা সুব্যবস্থার জন্য সম্পত্তি গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে পারে তাহার সুবিধা করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, ইংরাজি আইনে যাহাকে এণ্টেল-স্বত্ব (দানবিক্রয়-ক্ষমতাশূন্য হইয়া পুরুষানুক্রমে কেবল উপভোগ-স্বত্ব) বলে, ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক না হইলেও পরিবর্ত্তিতাকারে ভারতবর্ষের পক্ষে যে ইহা ঠিক উপযোগী হইবে তাহার অনেক সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ডে জমিদারেরা ভূসম্পত্তির উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করে। আমাদের দেশের জমিদারেরা কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মণভোজন, শ্রাদ্ধ বাইনাচ প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষুধিত মহাজনের উদরপূরণ করে। আইন দ্বারা এই অনিষ্ট দূর করা ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় নাই।

এণ্টেল স্বত্ব আমাদের দেশে যে সম্পূর্ণ নূতন নহে লেখক তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। রাজপুতানায় এই প্রকারের স্বত্ব কতকটা প্রচলিত আছে এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক বিষয়ে পিতাপুত্রের সমকালীন স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ পুত্রের অমতে পিতা সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনরূপে নষ্ট করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে ইহাতে প্রচলিত হিন্দুপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যেখানে প্রচলিত প্রথা দেশের উন্নতি এবং সংস্কারের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে গবর্মেণ্ট এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এক আইনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে অযোধ্যার এক শ্রেণীর তালুকদার ইচ্ছা করিলেই প্রাইমোজেনিচার আইন অনুসারে

কার্য্য করিতে পারে। এখন এই অধিকার আর একটু বিস্তৃত করা, কথা এই বৈ ত নয়।

তৃতীয় উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, সম্পত্তির ব্যবস্থাভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্মেণ্টের এখনও আছে, কিন্তু এই ক্ষমতা যাহাতে যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে না পারে সেই জন্য আইনবন্ধন আবশ্যক।

প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে বুদ্ধিমান এবং মূর্খ দুই দল লোক থাকে। মূর্খের দমন করিতে গিয়া আইন দ্বারা বুদ্ধিমানের উন্নতির পথ বন্ধ রাখা গবর্মেণ্টের পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইবে সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে।

লেখক উকীল এবং মহাজনদিগের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের নিকটে ন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। বুনিয়াদী জমিদারদিগের দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু ইঁহারা সকলেই যে রাজভক্তি এবং মহত্ত্বের এক একটি মূর্ত্তিমান আদর্শ এবং হঠাৎ জমিদারেরা সকলেই যে এক একটি আত্মসম্মান-বিবর্জ্জিত রাজদ্রোহী সেটা লেখকের কল্পনামাত্র।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ। লয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। প্রাইভেট্ টিউটার। পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোট গল্প।

গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয়, একটা দুটা আত্মহত্যা, নয়, সমাজ-বিদ্রোহ, নয়, কোন রকমের একটা উৎকট কাণ্ড আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক্, লেখক এমত ভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁদা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণতঃ নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক—একদিকে হৃদয়ের টান, আর একদিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর—একটুখানি উপন্যাসের ধরণে প্রেমচর্চ্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা সখ মাত্র, কিন্তু শাম্‌লা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত সখের নহে, ঐটেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোন রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরাণী নহে, সে উপন্যাসের নায়ক—কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব। বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ়। কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে—তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি

সাধনা।

স্বর্ণমৃগ।

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিকের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবন-সমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যা-ভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে বরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার এক পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল

কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ খুড়ি লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না। পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডিমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলমকাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অভিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠির প্রসাদে শক্রর মুখে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যানাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, রেনারসী সাড়ি, কথাবর্ত্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না! নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসু-

করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই। একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।" সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে

লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল। ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরের ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধ-ভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল; দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল "কাল সোনার রং ধরিবে।" সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই—পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই। সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারিদিক হইতে সোনার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহ-প্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়। মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই। অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কি আনিয়াছি বল দেখি!" স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!" বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া দিয়া কাগজের ধূলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট্ ষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন। গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন "আ মরে' যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ

বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না। গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণপ্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানু-

পড়িল না। দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না। দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবতঃ এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিঃশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন। জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শূন্যলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল। আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান। কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলের ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন। শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?" বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল। ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির কাছে গিয়া বলিল "সেই নাপিতের গল্প বল্।" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে

শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল "বাবা!" তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল। পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশীগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথকে দেখিতে পাইল না।

পরশ-পাথর।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা, ধূলায় কাদায় কটা
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে।

নাহি যার চাল চূলা গায়ে মাথে ছাই ধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোণারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার!
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা জীবে খুঁজে' ফিরে পরশপাথর!

নাহি যার চাল চূলা গায়ে মাখে ছাই ধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোণারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার!
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে;—
কাব্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশপাথর!

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোণার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ;
মিলি' যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ;
বহুকাল স্তব্ধ থাকি' শুনেছিল মুদে' আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে' খুঁজে' ফিরে পরশপাথর !

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা !
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত !

যত করে হায় হায়, কোনকালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর!
সেইমত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর!

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকিও দেখি!
সোণার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোণা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন!
ললাটে হানিয়া কর বসে' পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় ভাগুনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!
কেবল অভ্যাসমত মুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, মুড়ি ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর!

তখন গেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোণার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগন্ত দেখে সোণার স্বপন!

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে' হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ!
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ পুনঃ করিতেছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর!

লোক-চেনা।

প্রকৃতি-লক্ষণ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে অবিমিশ্র প্রকৃতি-ত্রয়ের লক্ষণ বর্ণনা করা গিয়াছে। আর একবার উহা সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক। বলময়ী অর্থাৎ অস্থিপেশীময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—বলবতী ইচ্ছা-শক্তি; স্থির বিবেচনাশক্তি; অক্লান্ত উদ্যম; অসীম সাহস; অবিরতচেষ্ট সঙ্কল্প; দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বলালসা; অবিচলিত আত্ম-নির্ভর। প্রাণময়ী অর্থাৎ দৈহিক পুষ্টি সাধনোপযোগিনী প্রকৃতির লক্ষণ—দৈহিক স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি, আবেগ-বশবর্ত্তিতা, উৎসাহ, আগ্রহ, সুখ-লালসা, বৈচিত্র্যানুরাগ, আরাম-বাসনা,

ভোগলালসা, দ্রুত ও চটকদার বুদ্ধি, উদ্দেশ্যের অস্থিরতা, সৌম্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। মনোময়ী প্রকৃতির লক্ষণ—জ্ঞানস্পৃহা, মনস্বিতা, সুরুচি, ভব্যতা, উচ্চস্পৃহা, উন্নত কল্পনা, তীব্র অনুভাব, সাহিত্য শিল্পানুরাগ ইত্যাদি। এই তিন প্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্যই পূর্ণাবয়ব চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত লোকসমাজে অতি বিরল। প্রায়ই দেখা যায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রে দুইটি প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রবল, অপরটি ক্ষীণতর। আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুসারে এই মিশ্র প্রকৃতিকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি।
২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।
৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।
৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি।
৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি।
৬। মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি।

এই মিশ্র প্রকৃতির নামকরণ দেখিলেই বুঝা যায় উহার প্রত্যেকটিতে কোন্ ধাতুর বিশেষ প্রভাব। অপেক্ষাকৃত যাহার অধিক প্রভাব তাহাকেই প্রথম আসন দেওয়া হয়। যথা, যে স্থলে প্রাণ অপেক্ষা বলের কিঞ্চিৎ প্রাধান্য, সে স্থলে বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি বলা যায় এবং যে স্থলে বল অপেক্ষা প্রাণের প্রাধান্য সে স্থলে প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি বলা যায়।

১। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি। পাশব বলের পক্ষে এই প্রকৃতি অতীব উপযোগী। অস্থি-পেশী বেশ পরিপুষ্ট; স্কন্ধদেশ চওড়া; বক্ষদেশ প্রশস্ত; জীবনীশক্তি যথেষ্ট; দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অবিচলিততার সহিত কর্ম্মশীলতা জড়িত। এই প্রকৃতিতে

একটু আনাড়িপনা থাকিতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, কঠোর শ্রমশীলতা এই প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা বুদ্ধি বিদ্যার পক্ষে তেমন উপযোগী নহে—শিল্প সাহিত্য আলোচনার পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকদিগের সহজ বিষয়বুদ্ধি সতেজ—বিষয়কর্ম্মে তাহারা বেশ স্থিরবুদ্ধি। অনেক সচ্চরিত্র লোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়—আবার অনেক বদ্‌মাইশ অপরাধীও এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। উচ্চ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে, এই প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্য আকার ধারণ করে। রাগ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রিপুসকল প্রবল হইয়া এই প্রকৃতিকে কুৎসিৎ করিয়া তোলে। লড়াকা পালোয়ান, খালাসী, সেপাহি, কৃষক প্রভৃতি—মুক্তবায়ুতে যাহা-দিগের দৈহিক শ্রম করিতে হয়—প্রায় তাহাদিগেরই মধ্যে এইরূপ প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

২। বল-মনোময়ী প্রকৃতি।—যে প্রকৃতিতে বলের ভাগ বেশি, মনের ভাগ তার নীচে এবং প্রাণের ভাগ সকলের নীচে। এই মিশ্রণফলে বুদ্ধিশক্তি এবং তাহার সহিত দৈহিক বল, কঠোরতা ও সহিষ্ণুতা উৎপন্ন হয়। বল-প্রাণময়ী প্রকৃতি অপেক্ষা দেহ যদিও কিছু সরু—কিন্তু পেশী অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ় এবং এই প্রকৃতির লোক অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্যমশীল হইয়া থাকে। উহারা দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়, দ্রুতভাবে ও উদ্যমসহকারে পদ-চারণ করে এবং উহাদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সবল। এই-প্রকার মিশ্র প্রকৃতির লোকেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশীল, কার্য্যে সাহসী, উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী। ইহাদের দুর্দ্দান্ত রিপু-সকলও কতকটা উচ্চ ধর্ম্মবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-বৃত্তির অধীনে থাকে। গভীর বিদ্যা, অকপট কার্য্যোৎসাহ, ব্যবহারিক বিষয়-বুদ্ধি,

উচ্চাভিলাষ, কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভের বাসনা, এই সকল লক্ষণ এই প্রকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যোদ্ধা, নবদেশানুসন্ধায়ী, যন্ত্রশিল্পী—জাহাজনেতা নাবিক প্রভৃতি অধিকাংশ এই প্রকৃতির লোক। ইহারা চিন্তাশীল ও কাজের লোক উভয়ই।

৩। প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতি।—বৃহৎ চওড়া শরীর, স্কন্ধ প্রশস্ত, ঘাড় মোটা, পেশী-বহুল দেহ, সবল অস্থি-সন্ধি—কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সুগোল—এবং মুখাবয়বসকল বহিরুন্মুখ ও আশু-পরিলক্ষ্য; মুখের ভাব একটু কর্কশ; পদচারণ সজোর ও দ্রুত—কিন্তু সে চলা-ফেরায় শ্রীর অভাব।—এই সমস্ত প্রাণ-বলময়ী প্রকৃতির লক্ষণ। যাহাদিগের এইরূপ প্রকৃতি তাহারা কঠিন শ্রমে কাতর নহে, মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম ও অঙ্গ-চালনা করিতে ভালবাসে এবং তাহারা কোনপ্রকার আটক বা বন্ধন সহ্য করিতে পারে না। প্রাণ-ধাতুর প্রাধান্যবশতঃ তাহারা বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ও আবেগ-বশবর্ত্তী; কিন্তু অস্থি-পেশীতন্ত্রেরও কতকটা প্রভাব থাকায়, তাহারা মনের উচ্ছ্বাসকে একটু সংযত করিয়া রাখিতে পারে। এই প্রকৃতির লোকেরা চটুল কিম্বা চটকদার হয় না; ইহারা কাজের লোক; সাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। ইহাদের বেশ সহজ বুদ্ধি; কাজকর্ম্ম বেশ চালাইতে পারে; ইহারা সফরী-ফর্ফর-বৎ ভাসা-ভাসা নানা বিদ্যার অধিকারী হয় না। উচ্চ ধর্ম্ম-বৃত্তির বল না থাকিলে, ইহাদের প্রচণ্ড রিপুবেগ ইহাদিগকে সহজেই বিপথে লইয়া যাইতে পারে।

৪। প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতি। এই মিশ্রণের ফল;—মোটা-সোটা সুগোল গঠন; মুখ বড় ও পরিপুষ্ট; মুখাবয়ব সুশ্রী, বেশি বহিরুন্মুখ নহে, কিন্তু বেশ স্পষ্টরেখাঙ্কিত ও সমবিন্যস্ত।

অনেক স্ত্রীলোকের এইরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। স্ত্রী-উপযোগী অনেক বাঞ্ছনীয় মনোরঞ্জন গুণ এই প্রকৃতিতে বর্ত্তে। যথা, স্নেহ মমতা, দয়া, ভালবাসা, সৌম্যতা, প্রফুল্লতা এবং তাহার সঙ্গে দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য। এই প্রকৃতি কতকটা আমোদ-প্রিয় প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে কতকটা ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে না রাখিতে পারিলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই প্রকৃতির পুরুষেরা বাহিরের কাজের উপযোগী। ভাল শিক্ষা পাইলে, ইহারা উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারে; ইহারা কোন সার-গর্ভ বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারে না; গভীর চিন্তা কিম্বা কোন বিষয়ে তন্নতন্ন অনুসন্ধান ইহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ইহারা একটু চটুল ও চটকদার; ইহাদের নূতনত্ব কিম্বা উদ্ভাবনী বুদ্ধি তেমন নাই। ইহাদের লেখা ও বক্তৃতা বেশ অনর্গল-প্রবাহী, প্রায়ই অলঙ্কারপূর্ণ এবং কখন কখন অতিপ্রাচুর্য্যদোষে দূষিত। ইহারা দ্রুতগামী, চলাফেরায় শ্রীবিশিষ্ট এবং কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৫। মন-বলময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতির লোকে একটু লম্বা ও ঈষৎ পাতলা ধরণের; অবয়ব-রেখা একটু কোণবিশিষ্ট—একটু খোঁচ্‌বিশিষ্ট; কিন্তু ইহাদের আকার-প্রকার বেশ সম্ভ্রান্ত ও দৃষ্টি-আকর্ষক; ইহাদের দাঁড়াইবার ভাবে বেশ একটু ঋজুতা আছে; মুখাবয়ব সকল একটু বহির্ন্মুখ কিন্তু পাথরে খোদা মূর্ত্তির ন্যায় বেশ স্পষ্ট রেখাবিশিষ্ট ও চাঁচা-ছোলা; মুখের ভাব গম্ভীর; কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, উচ্চ-গ্রাম-স্পর্শী ও সুনম্য; চলাফেরা বেশ দৃঢ় ও স্থিরলক্ষ্যানুবর্ত্তী। এই মন ও বল-ধাতুর সহিত কতকটা প্রাণ-ধাতুর সংযোগ হইলে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হয়। যাহাদের এইপ্রকার প্রকৃতি তাহাদের বুদ্ধিশক্তির সহিত

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, মন-বলময়ী ও মন-প্রাণময়ী এই দুই মিশ্র প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অধিকাংশ বড়লোক এই দুই প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথিবীতে যত বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সমঞ্জসীভূত প্রকৃতি। তবে, মন প্রাণ বল এই তিন ধাতুর মধ্যে কোন দুইটির প্রভাব যেন চরিত্র-বিশেষে অপেক্ষাকৃত একটু স্পষ্টরূপ লক্ষিত হয় এই মাত্র। কেন না, পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায়ই কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—একটু উনিশ বিশ হইয়াই থাকে। যেমন মনে কর, ব্রাইট্ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্। এই দুই জনেরই প্রকৃতিতে উল্লিখিত তিন ধাতুর প্রায়ই সমঞ্জসীভূত সমাবেশ আছে। তবে ব্রাইটের প্রকৃতিতে প্রাণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-প্রাণ-প্রকৃতির কোটায় ফেলা যায়, আর গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাতে তাঁহার প্রকৃতিকে মন-বল-প্রকৃতির সামিলে আনা যায়। যাঁহারা এই দুই জনের প্রতিকৃতি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের প্রকৃতি-গত প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উভয়েরই প্রশস্ত ও উন্নত ললাট—কিন্তু ব্রাইটের প্রকৃতিতে পুষ্টিতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আধিক্য ও গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রকৃতিতে অস্থিপেশীতন্ত্রের আধিক্য। ইহাঁদের চরিত্র ও বক্তৃতাতেও এই প্রভেদ বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। ব্রাইটের বক্তৃতা পড়িয়া দেখ, উহা বেশ প্রাঞ্জল, সুললিত, জলবত্তরল—উহাতে ঘরো কথার আধিক্য। এবং গ্লাড্‌ষ্টোনের বক্তৃতার বাক্যসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল, গভীর ও ওজস্বী। ইহাতে একজনের হৃষ্টপুষ্ট মুখের আমেজ্ পাওয়া যায়—আর একজনের দৃঢ় কঠোর অস্থি-পেশীর আভাস উপলব্ধি হয়। ইহাঁদের বক্তৃতা দিবার ধরণেও এই

প্রভেদ অনুভব হয়। শুনিয়াছি ব্রাইট্ যখন বক্তৃতা করিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সহিত সহৃদয়-ভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন; কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোন্ যেন প্রতি কথা নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া সবলে বাহির করেন—এবং তাঁহার এক একটি ওজস্বী কথা যেন শ্রোতাদিগের মধ্যে হাতুড়ির ঘায়ের মত আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া দৃঢ়তা, উদ্যম, শ্রমশীলতা, অবিরত-চেষ্টতা—যাহা বল-প্রকৃতির লক্ষণ, তাহা ব্রাইট্ অপেক্ষা গ্লাড্‌ষ্টোনে শতগুণ অধিক।

আমাদের দেশের দুই একটা ঘরো দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার এজ্‌লাসি কাজকর্ম্ম সত্ত্বেও যে এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিয়াছেন—তাহা কেবল অস্থি-পেশীতন্ত্রের প্রভাবে—যদি তাঁহার বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের প্রভাব বেশি হইত তাহা হইলে পারিয়া উঠিতেন কি না সন্দেহ। আমাদের অক্ষয় বাবুর (অক্ষয়কুমার দত্ত) দৈহিক প্রকৃতিতে বল-ধাতুর অভাব থাকায়, তিনি গোটাকতক ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই অচিরাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লেখায় যে পালিত্য, সুন্দর বাক্যবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার প্রাণময়ী প্রকৃতির গুণে বলা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর প্রকৃতিগত প্রাণধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখায় ভাবের এত সরসতা—এবং তাঁহার প্রকৃতিগত বল-ধাতুর প্রভাবে তাঁহার লেখনীর এত প্রখরতা। এই জন্য তাঁহার লেখা "প্রখরে মধুরে" বেশ মিশিয়াছে। এই জন্য বঙ্কিম বাবুর লেখায় যুক্তির এত বাঁধুনি ও ফাল্‌ত বাজে-বকুনির অভাব। যাঁহাদের প্রকৃতিতে বলাংশ অপেক্ষা প্রাণাংশের আধিক্য, অর্থসঙ্গতি রক্ষা করা অপেক্ষা ললিত বাক্যবিন্যাসের দিকে তাঁহাদের অধিক টান।

তাঁহাদের লেখায় একটু শব্দবাহুল্যও হইয়া পড়ে। বাক্যকে সুশ্রাব্য করিবার জন্য হয়তো একই ভাব তাঁহারা ভিন্ন কথায় তিনবার করিয়া ব্যক্ত করিবেন। তাঁহাদের লেখায় যুক্তির ভাগ কম, উচ্ছ্বাসের ভাগ একটু অধিক। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যতটা গর্জ্জন ততটা বর্ষণ নহে—যতটা শব্দঘটা, ততটা সার নাই। আর এক দৃষ্টান্ত, আমাদের চন্দ্রনাথ বাবু। ইনি সুলেখক বটে, কিন্তু ইহাঁর লেখায় যেন প্রাণ-ধাতুর অংশ একটু বেশি মাত্রায় আছে বলিয়া বোধ হয়—একটু যেন অস্থি-পেশীর অভাব। বঙ্কিম বাবুর মন-বলময়ী প্রকৃতি; চন্দ্রনাথ বাবুর মন-প্রাণময়ী প্রকৃতি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁরা মন-বলময়ী প্রকৃতির জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত যত পাই ততই আশার সঞ্চার হয়। আমাদের সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কেও বোধ হয় এই কোটায় ফেলা যাইতে পারে—তাঁহারও শ্রমশীলতা ও উদ্যম য়ুরোপীয়-সুলভ।

আমাদের বঙ্গদেশে প্রাণ-ধাতুরই একটু বেশি প্রাদুর্ভাব! প্রাণ-ধাতু সম্পূর্ণাবয়ব হইলে মন্দ নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণের দুই উপাদান রস ও রক্তের মধ্যে রসাংশটিই বাঙ্গালীর দৈহিক প্রকৃতিতে বেশি দেখা যায়—তাহাতে তমোগুণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া আলস্য ও জড়তা উৎপন্ন হয়। যে দেশের জলবায়ু আর্দ্র সেই দেশের জনসাধারণের প্রকৃতি এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের প্রাণধাতুর আধিক্য ও বলধাতুর অভাব থাকায় আমরা সহজে হুজুকে মাতিয়া উঠি—বৈদেশিকদিগের টিট্‌কারি সহ্য করিতে না পারিয়া হয় আমাদের নিজত্ব সহজে ছাড়িয়া দিই—অথবা সমাজের ভয়ে জড়সড় হইয়া বাস্তবিক কোন অশুভ প্রথাও

পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। আমরা কোন বৃহদ্ব্যাপার সমাধা করিয়া তুলিতে পারি না—যাহাতে অবিরত চেষ্টা অবিশ্রান্ত শ্রমের প্রয়োজন এরূপ কার্য্যে আমরা সফলতা লাভ করিতে পারি না। যে সকল কার্য্যে উপস্থিতমত বাহবা পাওয়া যায় এইরূপ কার্য্য করিতেই আমরা ভালবাসি—আমরা খুব চটক্ লাগাইয়া দিতে পারি কিন্তু কোন সারবান্ স্থায়ী কার্য্য আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। অতএব মনোময়ী ও বলময়ী প্রকৃতির যাহাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য—তাহার প্রধান উপায় জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা, উপযোগী আহার ও ব্যায়াম-চর্চ্চা। মন, বল, প্রাণ—আর এক কথায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাব—কিম্বা দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনের সাম ঞ্জস্য না হইলে মানব-চরিত্রের কখনই পূর্ণতা লাভ হয় না।

জাহাজের কাহিনী।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

১৩অক্টোবর। জিব্রল্টার পৌঁছন গেল। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্চে।

আজ ডিনারটেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং কুনো গোঁফওয়ালা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওয়ালার গল্প করছিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ নাসিকেশ নাকীস্বরে বল্লেন—পাখাওয়ালারা রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বল্লে তার একমাত্র প্রতিবিধান হচ্চে লাথি কিম্বা লাঠি। এবং পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এই ভাবে আন্দোলন চল্‌তে লাগ্‌ল। আমার বুকে হঠাৎ যেন একটা

তপ্ত শূল বিঁধ্‌ল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে এক সময় একটা দিশী দুর্ব্বল মানব-বিড়-ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে' দেবে তার আর বিচিত্র কি? আমিও ত সেই অপমানিত জাতের একটা লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সুখে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে' খাই এবং একত্রে দন্তোন্মীলন করি!—শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্য্যন্ত এল, কিন্তু একটা কথা বহুচেষ্টাতে সে জায়গায় এসে পৌঁছল না। বিশেষতঃ ওদের ঐ ইংরাজী ভাষাটা বড়ই বিজাতীয় রকমের ভাষা—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও ভাষাটা আর কিছুতেই মনের মত কায়দা করে' উঠ্‌তে পারিনে—তখন মাথার চতুর্দ্দিক হতে রাজ্যের বাঙ্গলা কথা চাক-নাড়া মৌ-মাছির মত মুখদ্বারে ভিড় করে' ছুটে আসে। ভাব্‌লুম এত উতলা হয়ে উঠ্‌লে চল্‌বে না, একটু ঠাণ্ডা হবে ছুটো সাবটে ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরিজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। ঝগ্‌ড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভাল হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিতমত ভাবটা ইংরাজিতে রচনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

কথাটা ঠিক বটে মশায়! পাখাওয়ালা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুল্‌লে অত্যন্ত অসুবিধে হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়ে পড়ে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যে লোক তোমার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম খপ্ করে' তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা; অভদ্রতার চেয়ে বেশি!

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল সেটা একটা

প্রাকৃতিক সত্য—সে আর আমাদের অস্বীকার করবার যো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড্ড বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান!

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্ব্বের বিষয়, যে, মনুষ্যত্বকে তার নীচে আসন দেওয়া হয়!

তোমরা বলবে, কেন, আমাদের আর কি কোন শ্রেষ্ঠতা নেই?

থাক্‌তেও পারে। কিন্তু যখন একজন অস্থিজর্জ্জর অর্দ্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং সুকুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে' ঠাহর করা যায় না।

বেচারার অপরাধ কি দেখা যাক্! ভোরের বেলা আহার করে' বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আরো দুটো পয়সা বেশি উপার্জ্জন করবার আশায় রাত্রের বিশ্রামটা তোমাকে দু'চার আনায় বিক্রয় করেচে। নিতান্ত গরীব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়সাহেবকে ঠকাবার জন্যে সে ষড়যন্ত্র করেনি।

এই ব্যক্তি রাত্রে পাখা টান্‌তে টান্‌তে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বল্‌তেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মত বসে' বসে' পাখা টান্‌তে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আস্‌বেই। সাহেব নিজে একবার পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান

করে, কারণ, তখনি তার একটি প্রতিলাথি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে' থাক যে, "তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোন স্বাধীন অধিকারপ্রাপ্তির যোগ্য নও।"

কিন্তু তার চেয়ে এ কথা সত্য যে,—যে জাত নিরাপদ দেখে' দুর্ব্বলের কাছে "ভেরিয়া"—অর্থাৎ তোমরা যাকে বল "বুলি"—যার কোন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবতঃ আসে কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা কোন বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু'রকমের আছে—ধর্ম্মতঃ এবং কার্য্যতঃ। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকার্যতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্ব্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিকগুণের দ্বারাই সে কার্য্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

তুমি কেবল প্রহারের জোরে পিতার কর্ত্তব্যসাধন করতে পার কিন্তু পিতৃস্নেহ এবং মঙ্গল-ইচ্ছা ব্যতীত ধর্ম্মতঃ পিতৃত্বের অধিকার জন্মে না।

কিন্তু ধর্ম্মের শাসন সদ্য সদ্য দেখা যায় না বলে' যে, ধর্ম্মের রাজ্য অরাজক তা' বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্চে, একসময় এরা তোমাদেরই শিরে ভেঙ্গে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য করে' যাই, প্রতিকারের কোন ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেই জন্য অনেক ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরাজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যকৃৎই তার একমাত্র কারণ নয়; যকৃতের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ডরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সে অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্যেই তার রাত্রে ঘুম হয় না। যে সৌভাগ্যবানের দ্বারে অর্গল আছে চোরের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের প্রতি তার তাদৃশ আগ্রহ দেখা যায় না—অর্গলটাই তার আশু উপকারে দেখে।

লাথির পরিবর্ত্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম্মভয় দেখান যদিচ দেখ্‌তে অতি মনোহর হয় বটে, কিন্তু লাথির পরিবর্ত্তে লাথি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে মাত্র বল সঞ্চার করেচেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতিকথা শোন!

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এই জন্য তারা পেটের উপরে ইংরাজ প্রভুর নিতান্ত

"পেটার্নাল্ ট্রীট্‌মেণ্ট্"-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজের পিলে কিরকম অবস্থায় আছে এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তার কোন পরীক্ষাই হয় নি।

আমাদের ভারতবর্ষীয়দের বিশ্বাস, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকেরই পিলে এত অতিশয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে যে বুটসমেত সজোর লাথি বেশ নিরাপদে সহ্য করতে পারে!

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্চে না; পিলে ফেটে যে আমাদের অপঘাত মৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যেরকম তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে' বলা হয় যে, তোমাদের আমরা মানুষ জ্ঞান করি না। তোমাদের দুটো চারটে যে থামকা আমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে তোমাদের পিলের দোষ! পিলে যদি ঠিক থাক্‌ত তা হলে লাথিও খেতে, বেঁচেও থাক্‌তে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার থাবার অবসর পেতে।

যা হোক্, ভদ্রনাম ধরে' অসহায়কে অপমান করতে যার সঙ্কোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অপমান সহ্য করে দুর্ব্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে' থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পারিনে। ইংলণ্ডে ত তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিণী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি করে' নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিম্বা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হতভাগ্য দেশে সেই ইংরাজের ঘর থেকে কি একটি মেয়েও আসেন না, যিনি উক্ত বাহুল্য করুণরসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে' মনোভার

কিঞ্চিৎ লাঘব করে' যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেচি, যেমন মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার। তিনি ত আমাদের মুরুব্বি ছিলেন না, যথার্থই পিতা ছিলেন। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে কেবল নাচগান করেন, বিবাহ করেন, এবং কথোপকথনকালে সুচারু নাসিকার সুকুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে' আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কি অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদেব ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে' সৃজন করেন নি!——

যাই হোক্, স্বগত উক্তি যত ভালই হোক্ ষ্টেজ্ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদেব কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশতঃ মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গোঁফ্ওযালা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠ্‌ল চোর তখন পালিয়েচে—তারা পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েচে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই ধিক্কাব দিতে লাগ্‌লুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগ্‌চে ভাল। অল্পবয়স, মন খুলে' কথা কয়, কারো সঙ্গে বড় মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট্ করে' বনে' গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অষ্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাঁদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক; কোনপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলেন "They are not at all smart!" বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরাজমেয়ে দেখা যায় তারা বড়ই

smart—বড্ড চোকমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খর-তর হাসি, বড্ড চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভাল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোট ছোট নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেম্‌নি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে' সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে' একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল; হঠাৎ এই বাঙ্গলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। আমি দেখ্‌লুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মাল্টা দ্বীপে পৌঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে' নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল।

সমুদ্রতীর থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠ্‌লুম। অনেকগুলি গাইড্‌-পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত না!—আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, একজন ইংরাজভিক্ষুক এবং একজন ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুক ঠিক এক শ্রেণীর নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষাবৃত্তির অগৌরব না থাকাতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা অবলম্বন করে তার আত্মসম্মান দূর হয় না। আমাদের দেশে মানুষের দয়া এবং দানের উপর মানুষের অধিকার আছে; দাতা এবং ভিক্ষুক, গৃহস্থ এবং অতিথির মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধন নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিক্ষার মধ্যে সেই হীনতা নেই। আমাদের মহাদেব ভিখারী। ইংলণ্ডে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুর উপরে নির্ভর করা হীনতা, সুতরাং ইংরাজ "বেগর" ঘৃণার পাত্র।

ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত

ইতিহাসপরম্পরা যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি তাহলেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!

'যাণ্টা' সহরটা দেখে' মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠ্‌চে একবার নীচে নাম্‌চে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক্ আছে সেইখানে ব্যাণ্ড্ বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে' আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না—আমাদেরই দোষ! আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে বোধ করি বিষয়বুদ্ধির চিহ্নমাত্র ছিল না। এরকম মুখশ্রী দেখ্‌লে অতি বড় সৎলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হোক্ মাল্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে' এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনারটেবিলে "স্মাগ্লিং" সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্ত্তি রটনা করছিলেন। গবর্ণমেণ্টকে মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এঁরা যেন কিঞ্চিৎ গৌরবের বিষয় মনে করে। আর যাই হোক্, তেমন নিন্দা বা

যেন এখনো এই পৃথিবীর আমোদে তাহার আমোদ বোধ হয়।

কিন্তু যখন সন্ধ্যার আগমনে বৃক্ষতল অন্ধকার ও শীতল হইত, যখন সেই প্রস্তর-মূর্ত্তিশোভিত সঙ্কীর্ণ পথে ও মন্দিরের আশপাশে যেন সহসা একটা ভীষণ দৈবরহস্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তখন এই বৃদ্ধ স্বামীজী নিতান্তই অবসন্ন বোধ করিত। দিবসের শ্রান্তি যেন তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করিয়াছে, তাহাদের বলিরেখা আরও গভীরাঙ্কিত, তাহাদের শুষ্ক চর্ম্ম অধিকতর লোল; তাহাদের মুখে কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর কষ্ট এবং আসন্ন মৃত্যুর কাতরতা বিরাজমান।

তাহাদের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বৃক্ষশাখায় শত শত দীপ প্রজ্বলিত হইল, এবং মন্দিরের সোপানোপরি উপাসকমণ্ডলী সমবেত হইতে লাগিল। একদিকে এই জনতার বিচিত্র ও চঞ্চল আমোদের গুন্‌গুন্ ধ্বনিতে মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও পবিত্র গম্বুজ পূর্ণ, অপরদিকে চিরহাস্যবিকশিত নিশ্চল দেবরক্ষক প্রস্তরমূর্ত্তি, ভীতিজনক ও অজ্ঞানিত চিহ্নসকল এবং নিশীথের অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা। দীপালোকে উৎসব চলিতে লাগিল, তাহা যেন পূজা না হইয়া আকাশের দেবতাগণের প্রতি একটা প্রকাণ্ড উপহাসের ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু সে উপহাসে বিষ নাই, সে উপহাস সরল, উদার ও আনন্দপূর্ণ।

কিন্তু যাহাই হৌক, একবার সূর্য্য অস্ত গেলে এই দুই মনুষ্য-দেহাবশেষকে আর কিছুই সজীব করিয়া তুলিতে পারিত না; তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভয়ঙ্কর দেখিতে হইত, জড়সড় হইয়া ক্ষুধা কুকুর বা বৃদ্ধ জীর্ণ বানরের ন্যায় তাহারা একপার্শ্বে পড়িয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নকণা ভক্ষণ করিত। এই সময়ে তাহাদের মৃতপ্রায়

মুখে ওরূপ ব্যাকুল উদ্বিগ্ন ভাব কেন? তাহারা কি কোন গভীর অনন্ত তত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন?—কে বলিবে এই বৃদ্ধ মস্তকের অভ্যন্তরে কি হইতেছে? হয়ত কিছুই নহে। তাহারা কেবলমাত্র প্রাণধারণচেষ্টায় প্রাণপণ যুঝিত, তাহারা পরস্পরকে স্নেহসহকারে সাহায্য করিয়া তাহাদের ছোট ছোট ভাতের কাঠি দিয়া খাইত; পাছে শীত করে, পাছে হিম লাগে, সেই ভয়ে তাহারা গায়ে কাপড় মুড়ি দিত; পরদিন যাহাতে জীবিত থাকিয়া একজন অপরকে টানিয়া সেই ভ্রমণে বাহির হইতে পারে, এই ইচ্ছায় তাহারা সাধ্যমত আপনার প্রতি যত্ন করিত।

সেই ক্ষুদ্র গাড়িটিতে, শুদ্ধ কাকাসান নহে, তাহাদের গৃহস্থালীর সকল দ্রব্যই থাকিত, ভাত রাখিবার কতকগুলি নীল কাঁচের ভাঙ্গা পিরীচ, কতকগুলি ছোট ছোট চায়ের পেয়ালা, এবং একটি লাল কাগজের লণ্ঠন, সেটি তাহারা সন্ধ্যাবেলায় জ্বালাইত।

সপ্তাহে একবার করিয়া অন্ধ টোটোসান যত্নপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর কেশরঞ্জন ও কবরীবন্ধন করিয়া দিত। জাপানী কেশবিন্যাসে যে পরিমাণে হস্তোত্তোলন আবশ্যক, তাহা কাকাসানের সাধ্যাতীত, সুতরাং টোটোসান শিখিয়া লইয়াছিল। কাকাসান অলসভাবে তাহার স্বামীর নিকট মস্তক সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, টোটোসান তাহা লইয়া কম্পিতহস্তে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া নাড়াচাড়া করিত, ইহা দেখিয়া বানরগণের যোড়ে যোড়ে পরস্পরকে সাজানো মনে পড়িয়া দুঃখ হইত। কাকাসানের চুল অতি অল্প, সেই হলুদবর্ণ কাগজসদৃশ, শীতকুঞ্চিত ফলের মত মস্তকে টোটোসান আঁচড়াইবার বড় বেশি কিছু

লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দূষণীয় জ্ঞান করে না সে কথা বলাও অন্যায়। মানুষ এম্‌নি জীব! একজন ব্যারিষ্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পুরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সে জন্যে যদি সে হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না—কিন্তু ঐ মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌঁসুলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরাজী করে' বলেন "রাইটিয়াস্ ইণ্ডিগ্নেশন্।" সর্ব্বনাশ!—

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হল। এই বৃষ্টিতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে' দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে' রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালার মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে' দুটো খালিপা ইটালিয়ান্ ছোক্‌রা ফিগ্ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি না—আমরা বল্লুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা কলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্-শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাবপ্রকাশ চল্‌তে লাগ্‌ল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ

ডেকের উপরে বসে' গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখ্‌লুম, দু'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ এবং অর্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে' নিয়ে চলেছে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং শাদা পাগ্‌ড়ি দেখা যাচ্চে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিচ্ছুক উট্‌কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব মরুভূমির একখণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্—কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো এ নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরীশালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেশন করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগম্ভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই। আমি এর ইতিহাস কিছুমাত্র জানি নে—কিন্তু যে সব রমণী চিত্তজয়োৎসাহে মত্ত হয়ে উগ্র উত্তেজনায় জীবনের সমস্ত সহজ-সুখের প্রতি অনেক পরিমাণে বীততৃষ্ণ হয়েচে, তাদের বয়স্ক অবস্থা কি শূন্য এবং শোভাহীন! আমাদের মেয়েরা এই

উদগ্র আমোদমদিরার আস্বাদ জানে না—তারা অল্পে অল্পে অতি সহজে স্ত্রী থেকে মা, এবং মা থেকে দিদিমা হয়ে আসে। পূর্ব্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বা বিচ্ছেদ নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেখ! কুমারী-দ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে। আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই,—সচেতন পুত্তলিকা—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর।

২৫ অক্টোবর।—আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে' দরজার সাম্‌নে অপেক্ষা করে' দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ্ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জম-পুঙ্গব অম্লান-বদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে' ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমেই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে' পড়ি, কিন্তু শারীরিক দ্বন্দ্বটা অত্যন্ত হীন এবং রূঢ় বলে' মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। সুতরাং অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লুম, নম্রতা গুণটা খুব ভাল হতে পারে কিন্তু খৃষ্টজন্মের উনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবীর পক্ষে অনুপযোগী এবং দেখ্‌তে অনেকটা ভীরুতার মত। নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যে খুব বেশি সাহসের আবশ্যক ছিল তা নয় কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংস-বহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রূঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমন সঙ্কোচজনক মনে হল। স্বার্থপরতা অনেক সময় এই জন্যই জয়লাভ করে—বলিষ্ঠ বলে' নয়—অতিমাংসগ্রস্ত কুৎসিৎ বলে'!

মইনু।

১

তন্ময় হ'য়ে খেলিছে নীরবে
চারি বছরের মেয়ে!
মৃণ্ময় তার ছোট ঘরখানি
ধূলি শাঁক পাতা লয়ে!
মুগ্ধনয়নে সহোদর কাছে,
বসি সে নেহারে খেলা,
পিতা বসি দূরে, ভাবেতে মগন
মসী-সমরেতে ভোলা!

২

ধূলি অন্ন রাঁধি ডাকি সহোদরে
কহিছে মোহিনী মেয়ে,
"খেতে বোস দাদা, মিছামিছি করে'
জল আসি আমি নিয়ে!"
ক্ষুদ্র গাগরী ধরিয়া কাঁখেতে
আঙ্গিনার পানে ধায়,
শূন্যে পুরিয়া মিছার সলিল
হাসিয়া ফিরিয়া চায়!

৩

দূর যেন কোন বাঁশরীর তান
পিতার শ্রবণে পশে,
বিস্মৃত যেন স্বপনের স্মৃতি
মরমে ফিরিয়া আসে!

"কি বলিলি মাগো জানা আছে তোর
এসব মিছার খেলা,
স্নেনে শুনে মোরা, ভুলে থাকি যত
বহে' তত যায় বেলা!"

৪

আদরের ডাকে, মইনু হাসিয়ে
ঝাঁপিয়ে কোলেতে ধায়!
স্নেহরাগভরে, বদন চুমিয়ে,
জনক কহিছে তায়।
"মিছা খেলা তোর, মিছা সব যদি
হাসিও কি মিছা তোর!
কন্যারূপিণী জননী আমার,
প্রেমের কোমল ডোর!"

বুড়া ও বুড়ির কথা।

(জাপানের গল্প)

(আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের লোটির "করুণা ও মরণের কথা" নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।)

টোটোসান ও কাকাসান স্বামী ও স্ত্রী। তাহারা অতি, অতি বৃদ্ধ; সকলেই তাহাদের চিরকাল জানিত; এমন কি, নাঙ্গাসাকির প্রাচীনতম অধিবাসীদেরও মনে পড়ে না যে, কখনো তাহাদের যৌবনকাল দেখিয়াছে।

তাহারা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। কাকাসান পঙ্গু-

ঘাতগ্রস্ত, টোটোসান অন্ধ; সে একখানি ছোট বাক্স-গাড়িতে তাহার স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া বেড়াইত।

পূর্ব্বে ইহাদের নাম ছিল হাটোসান ও উমেসান (শ্রীযুক্ত পায়রা ও শ্রীমতী পেয়ারা) কিন্তু সে নাম আর কাহারো মনে ছিল না।

নিপনী ভাষায় টোটো ও কাকা অতি মিষ্ট শব্দ, ছেলেদের মুখে তাহার অর্থ "বাবা ও মা।" তাহাদের বয়সের আধিক্যহেতু সম্ভবতঃ সকলে এই বলিবা ডাকিত; এবং এই দেশের আত্যন্তিক ভদ্রতাবশতঃ এই দুই ডাক-নামের পর লোকে 'সান' শব্দ বসাইত, তাহার অর্থ সম্মানসূচক, যথা, মহাশয় বা ঠাকুরাণী (বাবামহাশয় ও মাঠাকুরাণী); জাপানী শিশুগণও শিষ্টতার এই সকল নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করে না।

তাহাদের ভিক্ষা করিবার প্রণালী ভদ্রোচিত ও সুসংযত; তাহারা কাতর অনুনয় দ্বারা লোকদের বিরক্ত করিত না, কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র হস্ত প্রসারণ করিত, সেই লোলচর্ম্ম হস্ত যেন ইহারই মধ্যে ইজিপ্টের সুরক্ষিত মৃতদেহের ন্যায় বলি-রেখাঙ্কিত। তাহারা ভিক্ষাস্বরূপ ভাত, মাছের মুড়া ও উচ্ছিষ্ট ঝোল পাইত।

সকল জাপানী মেয়ের ন্যায় কাকাসান নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি; বহুকাল এই বাক্স-গাড়িতে বসিয়া বসিয়া তাহার শুষ্ক অর্দ্ধমৃত দেহ যেন তাহাতে লীন হইয়া গিয়াছে।

তাহার গাড়িটি চাকার উপর ভালরূপ বসানো হয় নাই; সুতরাং সহর ভ্রমণকালে তাহাকে খুব ঝাঁকানি সহিতে হইত। তবু তাহার বৃদ্ধ স্বামী আস্তে আস্তে কত সাবধানে কত সন্তর্পণে চলিত। কাকাসানের কণ্ঠস্বর অনুসারে চালিত হইয়া টোটো-সান নিবিষ্টচিত্তে কর্ণপাত করিয়া তাহার চির-অন্ধকার পথ

অতিবাহিত করিত; সম্মুখস্থ পথ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার হস্তে বাঁশের লাঠি, স্কন্ধে গাড়ি টানিবার চর্ম্মখণ্ড।

সিঁড়িতে উঠিবার বা কোনরূপ নালানর্দ্দামা পার হইবার আবশ্যক হইলেই বড় গোল বাধিত, কিরূপে টোটোসান এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে? তখন বুড়ি বেচারীর দিকে চাহিয়া দেখ, বাক্সের ভিতরে বসিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কালের দৌরাত্ম্যে যদিও তাহার চক্ষু বাষ্পাবৃত তথাপি বিপদাশঙ্কায় তাহার সেই চক্ষু জ্বলিতেছে, তাহার মুখের ভাব ব্যাকুলতাপূর্ণ। এই পড়িবার ভয়ই যে তাহাকে শেষদশায় অধিকতর ক্ষীণ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

এই যে দুই বুড়াবুড়ি পরস্পরকে এত ভালবাসে, ইহাদের মস্তিষ্কমধ্যে না জানি কি ভাবের উদয় হয়? সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জনে বসিয়া দুইজনে কি গল্প করে? রাত্রিকালে যখন কাকাসান মাথায় তাহার নীল রুমাল বাঁধে ও দুইজনে ঘুমাইবার নিমিত্ত কোন আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহারা যৌবনের কোন্ স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলে? আগামী কল্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিরূপে তাহারা পরামর্শ করে—সেদিনও ত ঠিক গতকল্যেরই অনুরূপ হইবে, অন্নের জন্য সেই একই চেষ্টা, সেই ভগ্নদশা, সেই দুঃখকষ্ট। তাহাদের কি এখনও কোন সুখ, কোন আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে? তাহাদের কি আজিও চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান? কেন তবে তাহারা বাঁচিতে এত দৃঢ়সঙ্কল্প, যখন পৃথিবী তাহাদের গ্রহণ করিবার জন্য, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া এই জীবন্মৃত্যুকে প্রকৃত মৃত্যুতে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত?

মন্দিরে সকল ধর্ম্মোৎসবের সময়ে টোটাসান ও কাকাসান উপস্থিত থাকিত।

মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণের বড় বড় কালো সিডার বৃক্ষের ছায়ায় কোন প্রাচীন বিকট প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে তাহারা সকাল সকাল গিয়া বসিয়া থাকিত,—তখনও ভক্তবৃন্দের কেহই আসে নাই। যতক্ষণ পূজা চলিত, অনেক যাত্রী আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইত। পুত্তলী-বদনা বিড়ালনয়না যুবতীগণ তাহাদের উঁচু কাঠের জুতা টানিয়া চলিয়াছে; নিপুণী বালক-বালিকা অদ্ভুত বিবিধ বর্ণখচিত লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া পূজা করিতে আসিয়াছে; কেশবিন্যাসনিপুণা হাবভাবপরিপূর্ণা সুন্দরী রমণীগণ পূজা করিতে ও হাসিতে গাগোডাতে যাইতেছে; দীর্ঘকেশ কৃষক, বৌদ্ধ পুরোহিত বা বণিক, এই ক্ষুদ্রকায় আমোদপ্রিয় জাতির অন্তর্গত সকলপ্রকার পুত্তলিকা কাকাসানের সম্মুখ দিয়া যাইত; এখনো তাহার এ সকল দেখিবার শক্তি ছিল, টোটোসানের সে শক্তি রহিত। সকলেই তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিত, কোন কোন দল হইতে একজন আসিয়া তাহাদের ভিক্ষা দিত; এমন কি অনেকে তাহাদের অভিবাদনও করিত, ঠিক যেন তাহারা খুব উচ্চশ্রেণীর লোক। এই রাজ্যের লোক এতই ভদ্র, এবং এই বৃদ্ধ দম্পতি এমনই সুপরিচিত।

এই সকল দিনে, যখন আকাশ পরিষ্কার ও বাতাস অনতিশীতল থাকিত, যখন তাহাদের জরাজনিত যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশম হইত, তখন তাহারাও উৎসবের হাসিতে যোগ দিত। কাকাসান চতুর্দ্দিকের আনন্দময় হাস্যধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া তাহার কাগজের পাখাখানি লইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীদের ন্যায় ভাবভঙ্গী করিত, এমন ভাব ধারণ করিত যেন এখনো তাহার জীবন উপভোগ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে,

পাইত না। তবু সে কোনপ্রকারে অলকগুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া নিপনী রুচি অনুসারে সাজাইত; কাকাসান আগ্রহসহকারে একটি আরসীতে এই সজ্জার পরিণাম নিরীক্ষণ করিত, "আর একটু উঁচু হইবে, টোটোসান! আর একটু ডানদিকে, আর একটু বাঁদিকে।" অবশেষে যখন টোটোসান দুটি শিংনির্ম্মিত কাঁটা দিয়া এই কবরীর শোভা সম্পূর্ণ করিত, তখন কাকাসানকে আজিও বেশ ভব্যযুক্ত বুড়িটি বোধ হইত, যেন জাপানী কুল-দানিস্থিত চিত্রের ন্যায় দেখাইত।

তাহারা নিয়মিতরূপে স্নানাদিও করিত—জাপানীরা অতিশয় পরিচ্ছন্ন।

এত বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয় যে স্নানকার্য্য বারম্বার করিয়া আসিতেছে তাহা যখন পুনর্ব্বার সমাপন হইত, মৃত্যুর আসন্নতায় যে বেশবিন্যাসক্রিয়া দিন দিন অধিকতর নিষ্ফল হইতেছে তাহা যখন সমাধা হইত, তখন সেই নির্ম্মল শীতল জলে কি তাহাদের কিছুমাত্র সতেজ বোধ হইত, বিমল প্রভাতে কি তাহারা এখনো কিয়ৎ পরিমাণে জীবনের সুখ অনুভব করিত? কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! প্রতিদিন প্রাতে দুইজনে উঠিয়া আপনাদিগকে নির্জ্জীব-তর রুগ্নতর ক্ষীণতর অনুভব করা, তাহা সত্ত্বেও প্রাণপণে জীবন-ধারণের প্রয়াস, রৌদ্রে আপনার জরাজীর্ণতা বিস্তার, চিরদিন সেই টানাগাড়িতে ভ্রমণ! সেই ধীরগতি, সেই ঘড়ঘড় শব্দ, সেই ঝাঁকানি, সেই শ্রান্তি; চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ানো—পথে পথে, মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, উৎসবের দিনে সুদূর-পল্লিস্থিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত দেবালয়ে।

একদিন সকালে, মাঠের মাঝে, দুটি রাজপথের সন্ধিস্থলে, মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আসিয়া বৃদ্ধা কাকাসানকে আক্রমণ করিল।

সুন্দর বসন্তপ্রভাত, সূর্য্যকিরণপ্লাবিত, পত্রপুষ্পশোভিত।

এই কিউ-সিউ দ্বীপে বসন্তকাল য়ুরোপীয় বসন্ত অপেক্ষা গরম এবং অচিরাগত। ইহারই মধ্যে এই উর্ব্বরা ভূমি সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজপথদ্বয়ের চতুর্দ্দিকস্থ কোমল ধান্যক্ষেত্র মৃদু সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া সবুজ মখমলসম ছায়ালোকে শোভিত। ঝিল্লির গানে আকাশ পূর্ণ। জাপানে এই পতঙ্গের স্বর অতি তীব্র।

এই চৌমাথায় কতকগুলি স্বতন্ত্র উন্নত সিডার-বৃক্ষতলে, ঘাসের মধ্যে দশবারোটি সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে; কতকগুলি কেবলমাত্র চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড, কতকগুলি বুদ্ধদেবের পদ্মাসীন প্রস্তরমূর্ত্তি। ধান্যক্ষেত্রের পরপারে বন দেখা যাইতেছে, তাহা অনেকটা য়ুরোপীয় ওক্-বনের ন্যায়—কিন্তু ইতস্ততঃ যে শাদা বা গোলাপী পুষ্পগুচ্ছ রহিয়াছে সেগুলি ফুটন্ত কামেলিয়া, এবং ঐ অতি সুকুমার পল্লবগুলি বাঁশবৃক্ষের; আরও দূরে ক্ষুদ্র গম্বুজ বা মিনার-আকার পর্ব্বত নীলাকাশের অঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক কিন্তু অতি সুশ্রী গঠন চিত্রিত করিয়াছে।

এই শান্তিময় শ্যামল স্থানে কাকাসানের গাড়ি থামিয়াছিল, এবং ইহাই তাহার শেষ বিশ্রাম। কতিপয় কৃষক ও কৃষক-পত্নী, পরিধানে ঘননীল লম্বা সুতার পাগোডাকৃতি আস্তিনযুক্ত পোষাক, প্রায় বিশজন ক্ষুদ্রকায় দয়াশীল নিপনী সেই টানা-গাড়িটির চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে বৃদ্ধা মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীরভাবে ক্ষীণ হস্ত চালনা করিতেছে। টোটোসান তাহাকে তীর্থদর্শনার্থে কানন দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে সহসা এই বিপদ উপস্থিত হইল।

যাহারা কৌতূহল এবং দয়াপরবশ হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে যত্নবান হইল। তাহার

মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই কানন দেবীর—স্নেহকরুণার অধিষ্ঠাত্রীর—উৎসব দেখিতে যাইতেছিল।

বেচারি কাকাসান! তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আশায় একপ্রকার ধান্যের আরক খাওয়ানো হইল, সুগন্ধ পত্রদ্বারা তাহার গাত্রমর্দ্দন করা হইল, নদীর শীতল জল তাহার স্কন্ধদেশে সিঞ্চন করা হইল।

টোটোসান তাহাকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করিল, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। সে কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার অন্ধ হস্তচালনে অন্যদের কার্য্যের ব্যাঘাত করিল, শোকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা সঘনে কাঁপিতে লাগিল।

শেষ চেষ্টাস্বরূপে, বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা লিখিত অব্যর্থ মন্ত্রপূর্ণ কাগজখণ্ডের গুলি পাকাইয়া কাকাসানকে খাওয়ান হইল। একটি হিতৈষিণী রমণী তাহার আপন আস্তিনমধ্য হইতে এই কাগজ বাহির করিয়া দিল।

বৃথা চেষ্টা, কাকাসানের পরমায়ু শেষ হইয়াছিল; মৃত্যু সেখানে অদৃশ্যরূপে অবস্থিতি করিয়া এই সকল নিপনীদিগকে উপহাসপূর্ব্বক তাহার সুদৃঢ় করকবলে বৃদ্ধাকে নিপীড়ন করিতেছিল।

আর একটি অন্তিম দারুণ অঙ্গআক্ষেপ—তাহার পর কাকাসান এলাইয়া পড়িল, তাহার মুখ খোলা, তাহার অর্দ্ধশরীর বাক্সের বাহিরে একপার্শ্বে হেলানো, তাহার হস্তদ্বয় লম্বমান, যেন পুতুলনাচ সমাপনান্তে একটি পুতুল বিশ্রাম করিতেছে।

যে ক্ষুদ্র ছায়াস্নিগ্ধ সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখে এই শেষ দৃশ্য সমাপ্ত হইল, তাহা বোধ হইল যেন দেবতা-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, এবং মৃত্যুদ্বারা অনুমোদিত।

কেহ আর ইতস্ততঃ করিল না। রাস্তার কুলি ডাকাইয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে খনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তীর্থদর্শনে বঞ্চিত হইতেও তাহারা অনিচ্ছুক, অথচ এই বৃদ্ধা বেচারীকে সমাধিবিহীন রাখিয়া যাইতেও নারাজ, বিশেষতঃ যখন দিনটা গরম হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং মক্ষিকাগণ ইহারই মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে কবর প্রস্তুত হইল। মৃতদেহের স্কন্ধ ধরিয়া তাহাকে বাক্স হইতে তুলিয়া, যে ভাবে চিরকাল বসিয়া থাকিত সেইরূপ ভূমে বসানো হইল। অরণ্যবৃক্ষতলে শিকারীগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ বিশুষ্ক বানর দেখিতে পায়, ইহাও সেইরূপ।

টোটোসান সব কার্য্য আপনি করিতে চেষ্টা করিল, তাহার মাথার ঠিক ছিল না; কঠিনহৃদয় কুলিগণ বাধা পাইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল; সে শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরব তুলিল এবং তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে হাতড়াইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল যে, নিদেনপক্ষে কাকাসানের চুলের অবস্থা অনন্তধামে উপস্থিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট পরিপাটি আছে কি না, তাহার কেশগুচ্ছ যথাক্রমে বিন্যস্ত রহিয়াছে কি না, এবং তাহার উপর মাটি নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে বড় বড় কাঁটাগুলি তাহার কবরীতে বসাইয়া দিতে চাহিল।

বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হইল; কাকাসানের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মা তাহার প্রেতরাজ্য আগমনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে।

সেই আবর্জ্জনাপূর্ণ বাক্স দেখিয়া কুলিগণের ঘৃণা হইল, তাহারা এ সকল জঞ্জালও কবরমধ্যে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিল; সেই গাত্রবস্ত্র, পরিধানের জীর্ণচীর এবং ছোট ছোট পেয়ালা ও লণ্ঠন, এমন কি বাক্সখানা সমেত,—তাহারা বলিল উহাতে মৃত্যুর বীজ আছে।

তখন টোটোসান, তাহার এই সকল স্মৃতিচিহ্ন লোপ পাইবে দেখিয়া দুঃখে নৈরাশ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল; রোদন করিতে করিতে একান্ত অবসন্নভাবে সে তাহাদের নিষেধ করিবার নিমিত্ত বাক্সের উপর শয়ন করিল।

কিন্তু আর একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উৎসবক্ষেত্রে যাইতেছিল। টোটোসানের উপর তাহার দয়া হইল, সে বলিল "আমি নদীর জলে এই সমস্তই ধুইয়া দিব।"

যে সকল লোক জড় হইয়াছিল তাহারা এই দুই ভিখারীকে সেই ঝিল্লিরবধ্বনিত শ্যামল নিরালায় একত্রে রাখিয়া পুনর্ব্বার দেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিল।

নির্ম্মল স্রোতের জলে ভিখারিণী বাক্সসমেত সকল দ্রব্য সযত্নে ধৌত করিল। তাহার পর চীরগুলি বৃক্ষশাখার উপরে উজ্জ্বল রৌদ্রে বিছাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সব উত্তমরূপে শুখানো গুছানো ও ভাঁজ করা হইল, এখন টোটোসান আবার তাহার ভ্রমণে বাহির হইতে সমর্থ।

সে আপনাকে বাক্সে যুতিয়া আবার চলিল, একটা কিছু টানিয়া লইয়া বেড়ানো তাহার এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পশ্চাতে, ক্ষুদ্র গাড়িটি শূন্য। যে তাহার বন্ধু, তাহার মন্ত্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার চক্ষুস্বরূপ ছিল, তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া টোটোসান দিক্‌ভ্রষ্ট ভাবে ভ্রমিতে লাগিল। সে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীন কৃপাপাত্র, তাহার আয়ুঃশেষ

পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে নিতান্তই একেলা; প্রগাঢ়তর অন্ধকারে, বিক্ষিপ্তচিত্তে তাহার আশাহীন লক্ষ্যহীন পথে চলিয়াছে।

তারার আলোতে চৌদিকের শ্যামলতা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল, এবং তাহার মধ্য হইতে ঝিঁঝি পোকা মুক্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিল। অন্ধকে ঘিরিয়া যখন প্রকৃত অন্ধকার নামিতে লাগিল, তখন প্রভাতে গোর দিবার সময় বৃক্ষপত্র মধ্য হইতে যেরূপ মর্ম্মরধ্বনি নিঃসৃত হইয়াছিল আবার তাহা শ্রুত হইল। ইহা সেই প্রেতাত্মাদের মৃদুস্বর। তাহারা বলিতেছে "শান্ত হও, টোটোসান, সে এখন আমাদের ন্যায় মধুর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে, তুমিও শীঘ্র সে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; সে বৃদ্ধও নহে রুগ্নও নহে, কারণ সে মৃত; দেখিতেও কুশ্রী নহে, কারণ সে ধরণীগর্ভের বৃক্ষমূল মধ্যে সুপ্রচ্ছন্ন; কাহারো ঘৃণার পাত্রীও নহে, কারণ এখন সে ভূমির সারজনক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্তিকায় সংশোধিত হইয়া তাহার দেহ পবিত্র হইবে; কাকা-মান কামেলিয়া, সিডারশাখা, বাঁশঝাড়, প্রভৃতি সুন্দর জাপানী বৃক্ষে পরিণত হইবে ... ...।"

মানবপ্রকাশ।

তুমি লিখ্‌চ যে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে' তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত না। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তুমি বল্‌তে চাও যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ।

এর থেকে বেশ দেখা যাচ্চে তোমাতে আমাতে কেবল ভাষা নিয়ে তর্ক চল্‌চে। আমি যাকে মূলতত্ত্ব বল্‌চি তুমি সেটা ঠিক গ্রহণ কর্‌তে নি—এবং অবশেষে সে জন্য আমাকেই হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদিও মূলতত্ত্ব শব্দটাকে বারম্বার ব্যাখ্যা করতে আমি ত্রুটি করিনি। এবারকার চিঠিতে ঐ কথাটা পরিষ্কার করা যাক্।

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যে-রকম ভাবে দেখ্‌ত, আমরা ঠিক সে ভাবে দেখিনে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে, যাতে করে' সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর, ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বনম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই, বৈদিক কালের ঋষি যে ভাবে উষাকে দেখ্‌তেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

প্রাচীনকাল এবং বর্ত্তমানকালে প্রধান প্রভেদ হচ্চে এই যে, প্রাচীনকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল—গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে তার সমস্ত পাপ্‌ড়িগুলি যেমন আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্রবিন্দুতে আপনাকে উন্মুখ করে' রেখে দেয় তেমনি। তখন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায় নি। তখনকার অখণ্ড জীবনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সূর্য্যকিরণের মত শুভ্র নিরঞ্জনভাবে ব্যক্ত হত। এখনকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। তার সাত রং কেটে বা'র হয়েছে। ক্লাসিসিস্‌ম্ এবং রোমাণ্টিসিস্‌মের মধ্যে

সেই জন্য প্রভেদ বাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসিক্ শুভ্র এবং রোমান্টিক্ পাঁচরঙা।

কিন্তু প্রাচীন পিতামহদের অবিশ্লিষ্ট মনে সংসারের সাত রং কেন্দ্রীভূত হয়ে যে এক একটি সুসংহত শুভ্র মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পেত তার একটা কারণ ছিল। তখন সন্দেহ প্রবল ছিল না।

সন্দেহের প্রথম কাজ হচ্চে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। আদিমকালে বিশ্বাসের কনিষ্ঠ ভাই সন্দেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই—সেই জন্যে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ হয়ে যায় নি। কিম্বা সন্দেহ তখন এমনি নাবালক অবস্থায় ছিল যে, সংসারের প্রত্যেক জিনিষের উপর নিজের দাবী উত্থাপন করবার মত তার বয়স ও বুদ্ধি হয় নি। বিশ্বাসের তখন একাধিপত্য ছিল। তার ফল ছিল এই যে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্য্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে' মনে করতে পারতুম না। এমন কি, যে সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশ মাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা এই মনুষ্যত্ব আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে' থাকি, কিন্তু তখন এটা অলঙ্কারের স্বরূপ ছিল না। বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে তখন সমস্তই জীবন্ত হয়ে জেগে উঠ্‌ত। বিশ্বাস কোনরকম খণ্ডতা সহ্য করতে পারে না। সে আপনার সৃজনশক্তির দ্বারা সমস্ত বিচ্ছেদ বিরোধ পূর্ণ করে', সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন করে' ঐক্য নির্ম্মাণের জন্যে ব্যস্ত।

অনেকে বলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে বেশি

মাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল। অর্থাৎ মানুষ তখন আপনাকেই সর্ব্বত্র সৃজন করে' বসত। তখন মানুষ আপনারই সুখ দুঃখ বিরাগ অনুরাগ বিস্ময় আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে' তুলেছিল। আমি বরাবর বলে' আস্‌ছি, মানুষের এই আত্ম-সৃজন পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিষ মানুষ হয়ে উঠ্‌তে। এই জন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্চে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধিকার হারিয়ে চলে' আস্‌চে। নিজের যেসকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে' দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে' আস্‌চে। পূর্ব্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল—দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত এখন তা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্চে।

যাই হোক্, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে। বরঞ্চ প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আমার কথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু "তত্ত্ব" শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুস্কিলে পড়েচি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে' কাজ করচে, তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না। যেটা আমাদের গোচর হয়েচে তাকেই তত্ত্ব বলা যেতে পারে। সেই মানসিক পদার্থকে কেউ বা আংশিক ভাবে জানে, কেউ বা জানে না অথচ তার নির্দ্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে' যায়।

সে জিনিষটা ভারি একটা মিশ্রিত জিনিষ—তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাটবাঁধা নয়। সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূল দেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব্ব ঐক্য লাভ করেছে—সাহিত্য সেই অতি দুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ, সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয় কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্য্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনি তার নিত্যতা দেখ্‌তে পান তখনি তাকে নিয়ম নাম দেন।

আমি যে মিলনের কথা বল্‌ছি সেটা যত মিলিতভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনি তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। তখনি বুঝ্‌তে পারি আমার সংস্কার এক জিনিষ, বাস্তবিক সত্য আর এক জিনিষ, আবার আমার কল্পনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তখন আমাদের একান্নবর্ত্তী মানসপরিবারকে পৃথক করে' দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।

কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে' মানুষ হয়েছিল, পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দসঙ্গমের ভাষা। পূর্ব্বের মত সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই, কেন-না এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি, তার পরে একসময়ে

সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করি। পূর্ব্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েচে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এই জন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এখনই সাহিত্যের বড় বেশি আবশ্যক এবং তার আদরও বেশি।

এখন এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে যতটা দূর যাওয়া যায় তার বেশি অগ্রসর হতে পারিনে। চুট্‌কি হাসি এবং খুচ্‌রো কথার মধ্যে আপনাকে আবৃত করে' রাখি। মানুষ সাম্‌নে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এম্‌নি সহজে স্বভাবতই আত্মসম্বৃত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে, কিম্বা একটা অতি প্রবল আবেগের দ্বারা সর্ব্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রবৃত্ত আভাস নিজে পাইনে। শেক্‌স্‌পিয়রের সময়েও এরকম সব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্ভব হতে পারত, এবং বিদ্যুৎ-আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া এক পলকে দৃষ্টিগোচর হত; এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আস্‌চে, এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আট্‌কা পড়ে' পোষমানা ভাল্লুকের মত নিজের নখদন্ত গোপন করে' সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে; যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ঐ বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলচে না!

সাহিত্যের মধ্যে শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে, জর্জ্‌ এলিয়টের

নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়ভাঙ্গা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এই জন্যে শেক্সপিয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, "জে.ণা" অশ্লীল—কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

আর একটু খোলসা করে' বলা আবশ্যক।—

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না—সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে' মান্‌তে আমাদের আপত্তি নেই। ভালবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি; এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেন না এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে;—এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভাল এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা করে' সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মান্‌বে? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য? সেটা কি আমাদের অনেকানেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণব্যাপী নয়? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি—এই

জন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু কোন "জোলা" যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ৎ দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেম্‌নি; তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস; তারা দুর্ব্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে' নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখন কোথাও কোন্ স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি—সমাজে তাদের চরম এভোল্যুশন্ হচ্চে, কেবল করাসী রান্না এবং ফরাসী নভেল।

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে "জোলা"র নভেলে কোন দোষ দেখ্‌তুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোন অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ডজিনিষকে খণ্ডভাবেই দেখায়। আর, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোন একটা অংশের অবতারণা করে তখন তাকে একটা বৃহতের একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায়, এই জন্যে আমাদের মানসগ্রামের বড় বড় মোড়ল-গুলিকেই সে নির্ব্বাচন্ করে' নেয়।

কথাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঠিক সমরেখায় পড়ল কি না জানিনে। কিন্তু আমি যেটা বল্‌তে চাচ্চি সেটা এর দ্বারা কতকটা পরিস্ফুট হবে বলেই এর অবতারণা করা গেছে।

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা। শেক্সপিয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক একটা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে'

গুপ্তমানুষকে দেখ্‌তে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাসক্রমে সে লুকিয়ে পড়ে। এই জন্যে আজকালকার লেখায় প্রায় লেখকের বিশেষত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখা দেয়। কিম্বা খণ্ড খণ্ড আভাসকে কল্পনাশক্তির দ্বারা জুড়ে' এক করে' গড়ে' তুল্‌তে হয়। অন্তররাজ্যও বড় জটিল হয়ে পড়েছে, পথও বড় গোপন। যাকে ইংরাজিতে ইন্‌স্পাইরেশন্ বলে সে একটা মুগ্ধ অবস্থা; তখন লেখক একটা অর্দ্ধচেতন শক্তির প্রভাবে কৃত্রিম জগতের শাসন অনেকটা অতিক্রম করে— এবং মনুষ্যরাজার যেখানে খাস দরবার সেই মর্ম্মসিংহাসনের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক্, আর অন্যের-সুখ-দুঃখের দ্বারাই হোক্, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক্ আর মনুষ্য-চরিত্র গঠিত করেই হোক্ মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর সমস্ত উপলক্ষ্য।

প্রকৃতিবর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোন মাথাব্যথাই নেই—কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন কি, ভাষা তা ছাড়া আর কিছু পায়ো না। চিত্রকর যে রং দিয়ে ছবি আঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয় নি—কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের হৃদয়ের দোলায় লালিত-পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত করে' নিছক্ বর্ণনা-টুকু রেখে' গেলে যে কাব্য হয় একথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্য্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

হ্যাম্লেটের ছবি সৌন্দর্য্যের ছবি নয়, মানবের ছবি—ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য্য কি গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিষ যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এই জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে যতই সচেতন হব, প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই ত কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সে ত বর্ণনীয়। কিন্তু সেও মানবের হৃদয়ের জিনিষ, প্রকৃতির জিনিষ নয়। অতএব, এমন কোন বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, যা সুন্দর নয়, শান্তি-ময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম্ম নেই কিম্বা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকটসম্পর্কে বদ্ধ নয়।

আমার বোধ হচ্চে আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজস্ব প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম, যে, সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এইরকম বুঝিয়ে গেছে। আমার সেই সামান্য আদিম অপরাধ তুমি কিছুতেই মার্জ্জনা করতে পারচ না; তার পরে আমি যে কথাই বলি না কেন তোমার মন থেকে সেটা আর যাচ্চে না। আদম যেমন প্রথম পাপে তাঁর সমস্ত মানব-বংশসমেত স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন তেম্‌নি আমার সেই প্রথম ত্রুটি ধরে' আমার সমস্ত সংস্কার ও যুক্তি-পরম্পরাসুদ্ধ আমাকে মতচ্যুত করবার চেষ্টায় আছ।

আমার বলা উচিত ছিল লেখকের নিজস্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকা-

এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল)। কখন নিজত্ব দ্বারা, কখন পরত্ব দ্বারা। কখন স্বনামে কখন বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। আমার গোড়াকার চিঠিতে যদি এ কথা প্রকাশ হয়ে না থাকে তা হলে জেনো সেটা আমার অনিপুণতাবশতঃ। একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মত লোক তার ব্যাখ্যাকারক। কথা আছে, একে বোবা তাতে আবার বোলতায় কাম্‌ড়েছে—একে গোঁ গাঁ করা বই আর কিছু জানে না তার উপরে কামড়ের জ্বালায় গোঁগাঁনি কেবল বাড়িয়ে তোলে।

আমি যে এই আলোচনা করচি এ যেন মানসিক মূর্চ্ছা করচি। একটা জীবন্ত জিনিষের পশ্চাতে ছুটোছুটি বেড়াচ্চি—পদে পদে স্থানপরিবর্ত্তন করচি, কখনো পর্ব্বতের শিখরে কখনো পর্ব্বতের গুহায়। এই জন্য আমার সমস্ত আলোচনায় যদিও লক্ষ্যের ঐক্য আছে কিন্তু হয় ত পথের অনৈক্য পাবে। কিন্তু সে সমস্ত মার্জ্জনা করে' তুমিও যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, যদি আমার পাশাপাশি ছোট, তা হলে আমার মৃগটি যদি বা সম্পূর্ণ ধরা না পড়ে নিদেন তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তোমাকে বোঝাতে ভুল করে' থাকি তুমি নিজে ঠিকটা বোঝ। অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে মাছটি ধরে' দিতে না পারি, আমার পুকুরটা ছেড়ে দিচ্চি, তুমিও জাল ফেল! কিন্তু, কিছু উঠ্‌বে কি? সে কথা বল্‌তে পারিনে—সে তোমার অদৃষ্ট, কিম্বা আমার অদৃষ্ট, যাই বল!

কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। তুমি

আমারই কথাটাকে কেবল খুঁটি ধরে' টেনে টেনে বের করছ—নিজের কথাটিকে বরাবর বেশ চেকেচুকে সাম্‌লে রেখেছ। আমি যেন কেবল একটি জীবন্ত তলোয়ারের সঙ্গে লড়াই করচি—কেবল খোঁচা খাচ্চি, কাউকে খোঁচা ফিরিয়ে দিতে পারচিনে। আমি বার বার যতই বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দাঁড়াচ্চি তোমার ততই আঘাত করবার সুবিধে হচ্চে। কিন্তু এটাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলে?

আমি ব্রাহ্মণ—কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাইনে। আসল কথাটা কি তাই জান্‌তে পারলেই চুপ করে' যাই। আমি ত বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে' তোলা। তুমি কি বল?—

কিন্তু তুমি শুন্‌চি কলকাতায় আস্‌চ—আমিও সেখানে যাচ্চি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখ্‌চি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মোকাবিলায় নিষ্পত্তি কুইনাইন্ দিয়ে জ্বর ঠেকানোর মত। হয়ত চট্ করে' ছেড়ে যেতে পারে নয় ত গুমরে গুমরে থেকে যায়, আবার কিছুদিন বাদে কেঁপে কেঁপে দেখা দেয়। ইতি।

স্বরলিপি।

("মায়ার খেলা" হইতে)

রাগিণী দেশ—কাওয়ালি।

প্রমদা।— দেলো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে
সাধের বকুল ফুলহার।

আধফুট' যুঁইগুলি
যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভারে!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারে বার!

সখি।— আজি এত শোভা কেন!
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে,
সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

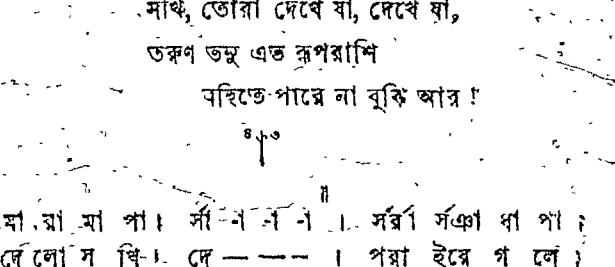

। র্সর্রা র্সঞ্রা র্সর্সা ঞ্রধা। পা -ন্ -রা -রমা॥ মা পা লা না।
। কপো লে,প ড়িছে বারে। বা — — র্ ॥ আ জি এ ত।

। {র্সা নর্সর্রা র্সনা র্সা। র্সা র্সর্রা র্সা না। র্সা নর্সর্রা র্রা র্রাঙ্ঞা।
। {পো ভা কে ন। আ ন ন্দে, বি। ব ণা হে ন।

। (র্সর্রা র্সা র্রর্সা না)।} র্সা না র্সা র্সা। র্সর্রা র্সঞ্রা ধা ঞ্রধা।
। (আ জি এ ত)।} বি স্বা ধ রে। হাসি নাহি ধ রে।

। পা ধপা মা ধা। ধা ঞ্রধা পা ধপা। মা মধা পা মগা।
। লা ব ণ্য, ঝ। রি ম্মা প ড়ে। ধ রা ত লে।

। রগমা মা মা মগা। রগা গা গা -রা। সরা রা রা -া।
। স খি তো রা। দে খে যা — । দে খে যা —।

। রমা রা মা পা। র্সা -ন্ -ন্ -ন্। র্সর্রা র্সঞ্রা ঞ্রধা পা।
। ত রু ণ, ত। নু — — —। এত রূপ রা শি।

। পধা পমা ধপা মগা। রা -ন্ -ন্ -মা॥॥
। বহি তে,পা রেনা বুঝি। আ — — — র্॥॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্ত সুর।

২। ।=এক মাত্রার চিহ্ন। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার দিলে দুইটি অর্দ্ধমাত্রার সুর কিম্বা কতকগুলি ভগ্নমাত্রিক সুর একমাত্রায় সামিলে আসিল এইরূপ বুঝায়; যথা পধা, রগমা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার পৃথক্ চিহ্ন হচ্চে বিসর্গ যথা, সঃ। দেড়মাত্রা=াঃ; যথা, সাঃ।

৩। উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের উপর রেফ্।

খাদ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের নীচে হসন্ত।

৪। ঞ=কোমল ন।

পাশের যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় ও থামিয়া অন্তরা প্রভৃতি অন্য কলি ধরিতে হয় সেইখানে মাথার উপর যুগল ছেদ বসে।

গুম্ফ-বন্ধনী=বিশেষ-পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। যেখানে এইরূপ } বিমুখী গুম্ফ-বন্ধনী দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী যেস্থানে এইরূপ { প্রমুখী গুম্ফ-বন্ধনী আছে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি হইবে। পুনরাবৃত্তিকালে যেখানে এইরূপ ( ) বক্র-বন্ধনী দেখিবে সেই বন্ধনীর অন্তর্গত সুরগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহার পরের সুরগুলি ধরিতে হইবে। যথা, এই গানের অষ্টম পংক্তিতে "আজি এত"র পরে ছাড়িয়া দিয়া (সপ্তম পংক্তি) "শোভা কেন" হইতে ফের ধরিতে হইবে। এবং ফের যখন "আজি এত"র কাছে আসিবে তখন "আজি এত" একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তৎপরবর্ত্তী পদের সুর "বিম্বাধরে" হইতে সুরু করিবে।

"কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়।" *

ভৈরবী—একতালা।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)!
কেন মন কেন এমন করে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে!
চারিদিকে সব মধুর নীরব,
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে!

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত গান।

যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে ভারি অযতন প্রাণের পরে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে না গো
তবু মনে পড়ে!

৩।৩

। রা ঙ্গা -রমা ॥ ঙ্গা -ন -লা। -সা ঞ্দা -পদা। ঞ্া -সাঃ ঙ্গঃ।
। কে ন —॥ ন — য়। — ন —। আ — প।

॥

। ঙ্গাঃ -লঃ -সা। সা -লা -ঙ্গমঙ্গা। -লা -ঙ্গা লা। সা -ন -ন।
। নি — —। ভে — — । — — সে। যা — য়।

। রা ঙ্গা -রমা ॥ -ন সা সঞ্া। সা -ন সা। -দা দা -পদপা।
। (জ লে) —॥ —কে ন । ম — ন। — কে — ।

। মা -ন -ন। ঙ্কা -ন -মঙ্কমা। ঙ্গা -রা ঙ্গা। -রমা ঙ্গা -রা।
। ন — —। এ — —। ম — ন। — ক —।

। ঙ্গা -রঙ্গা -সা। ঙ্গা রঙ্গা -মা ॥ । সা সঞ্া। সা -ন সা।
। রে — —। (কে ন) —॥ যে ন। স — হ।

। -দা পা -ন। পা -দা ঞ্া। -ন -র্সা -ন। ঞ্র্সা -র্সা র্সা।
। — সা —। কি — ক। — থা —। ম — নে।

। -ন র্সা -ঞ্া। ঞ্া -দা দা। -পা পা -মা। পা -দা -পদা।
। — প —। ড়ে — ম। — নে —। প — ড়ে।

। -ঞ্া ঞ্াপা। মা -ন মা। -ঙ্কা ঙ্কা -মা। ঙ্গা -রা ঙ্গা।
। — না —। গো — ত। — বু —। য — নে।

{-রমা ঙ্গা -রা। ঙ্গা -রঙ্গা -সা। ঙ্গা -রঙ্গা মা॥ । । । ।
।— প — । ড়ে — —। (কে — ন)॥ ।

। সা -। সা। -লসা লা -। {ঙ্গা -। মা। -। মা -। মা -। ঙ্কা।
। চা — রি। — দি —। {কে — স। — ব —। ম — ধু।

। -ঃমঃ ঙ্গা -। মা -। ঙ্গা। (-লঙ্গলা সলা -ঙ্গমা। ঙ্গা -লঙ্গা লা।
। — র —। নী — র। {— ব —। চা — রি।

। -সা সা -লা)।} -লঙ্গলা সা -। -। -। । সা সঞ্।
। — দি —)।} — ব —। — — —। কে ন ।

। সা -। সা। -দা পা -। পা -দা ঞা। -। র্সা -। ।
। আ — মা। — রি —। প — রা। — ণ —।

। ঞর্সা -র্লা র্সা। -। ঞা -। দঞা -দা পা। -। পা -মা।
। কেঁ — দে। — ম —। রে, — কে। — ন —।

। পা -। পা। -দা পদা -ঞা। দা -পদপা মা। -ঙ্কা ঙ্কা -মা।
। ম — ন। — কে —। ন — এ। — ম ।

। ঙ্গা -রা ঙ্গা। -রমা। ঙ্গা -রা। ঙ্গা -। -সা। ঙ্গা -রঙ্গা মা॥
। ন —কে। — ন —। রে — —। (কে — ন)॥

।। সা সা। সা -। সা। -লসা লা -। ঙ্গা -। মা।
। যে ন। কা — হা। — র —। ব — চ।

। -। মা -। মা -। ঙ্কা। -ঃমঃ ঙ্গা -। । মা -। ঙ্গমঙ্গা।
। — ন —। দি — য়ে। —ছে —। বে — দ ।

। -লা সলা -ঙ্গমা। ঙ্গা -মা ঙ্গা। -লঙ্গলা সা -লা। ঙ্গা -। রঙ্গা।
। — ন —। কা — হা। — র —। ব — চ।

। -মা মা -। মা -। ঋদদ্ধা। -ঃমঃ ঙ্গা -। মা -। ঙ্গা।
। — ন —। দি — য়ে। — ছে —। বে — দ।

। -লঙ্গলা সা -। -। -। -। । সা সঞ্। {{সা -দা দা।
। — ন,—। — — —। যে ন। {{কে — ন্দি।

। পা পা -। পা -। পা। -ঞ্চপো -মা। পা -দা পদা।
। — রে —। গি — য়ে। — ছে —। অ — না।

। -এা দা -পা। (মা -পদা -ঙ্গা। মা -ঙ্গলা সা)।}} মা -। মা।
। — দ —। (রে — —। যে — ন)।}} রে, — বা।

। -ঙ্গা ঙ্গা -মা। ঙ্গাঃ -রঃ ঙ্গা। {{{-। ঙ্গা -বা। ঙ্গা -রা ঙ্গরা।
। — জে —। তা — রি। {{{— অ —। ব — ত।

। -মা ঙ্গা -লঙ্গা। সা -ঙ্গা ঙ্গা। মঙ্গা লা -ঙ্গলা। (সা -। রা।
। — ন —। প্রা — ণে। র প —। (রে— বা।

। -। ঙ্গা -রা। ঙ্গা -রণা মা)।}}} সা -। -॥
। — জে— । তা — রি)।}}} রে,— — ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। ঞ=কোমল ন; ল=কোমল র; দ=কোমল ধ; ঙ্গ=কোমল গ; ঙ্ক=কড়ি ম।

২। গানের মধ্যে ক্ষণিক বিশ্রামের নাম বিরাম। একমাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন হচ্চে হাইফেন্-বিবর্জ্জিত আকার। যথা, এই গানের পঞ্চম পংক্তিতে। । । । । । পূর্ব্বে আমরা ঐ স্থলে শূন্য বসাইতাম। এইক্ষণে তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। এই গানটির স্বরলিপি সা-খরজে বসান হইয়াছে কিন্তু মা-খরজে গাইলে ভাল শুনায়।

গোবিন্দদাস।

যাঁহারা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের নাম তাঁহাদের নিকটে সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা-সম্পর্কিত অনেকগুলি পদাবলীতে গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসভণিত কোন কোন কবিতা এতই মধুর যে তাহা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাসের পদাবলী একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, গোবিন্দদাস অনেকস্থলে বিদ্যাপতির ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছেন। এই গোবিন্দদাস সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন গোবিন্দদাস নামে চারিজন ব্যক্তি পদরচয়িতা ছিলেন; কেহ বলেন ছয়জন। আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তির মতে একজন গোবিন্দদাস, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। ১২৮২ সালের "বান্ধব" পত্রিকায় "গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত প্রকটিত হইয়াছে, যাহাতে গোবিন্দদাসের প্রকৃত ইতিহাস অধিকতর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শন আবশ্যক। বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ও অন্যান্য পদাবলী আলোচনা করিয়া গোবিন্দদাস সম্বন্ধে আমরা

যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা "সাধনায়" প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রবন্ধলেখক বলেন, "গোবিন্দদাস নামে সর্ব্বশুদ্ধ নয় ব্যক্তির নাম বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ছয়জন পদাবলীরচয়িতা।" এই ছয়জনের প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন "আষাঢ়ে গল্প"-মূলক প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "কাঠগড়ের (কাটোয়ার) উত্তরস্থিত প্রসিদ্ধ ঝামটগ্রামের নিকটবর্ত্তী বনপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহারই ঔরস পুত্র।" এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকেই প্রবন্ধলেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদায় প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে কাটোয়ার নাম "কণ্টক নগর" লিখিত হইয়াছে; "কাঠগড়" কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ "ঝামট" নামে কোন গ্রামের বিষয় আমরা অবগত নহি। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মভূমির নাম "ঝামটপুর" এবং তাহা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমকালীন লোক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে লেখক একটী অদ্ভুত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"গোবিন্দদাস কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থেরও প্রণেতা, উক্ত গ্রন্থখানি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলীর ন্যায় যে অত্যন্ত প্রাচীন ও গৌরাঙ্গের প্রিয়বস্তু ছিল নিম্নলিখিত কবিতা তাহার প্রমাণ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।'

চৈতন্যচরিতামৃত।

"কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ ভক্তবর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চৈতন্যদেব যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে কৃষ্ণা নদীতীরে উপনীত হয়েন, সেই সময়ে তত্রত্য বৈষ্ণবগণের নিকটে "ব্রহ্মসংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ দেখিতে পান এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া লয়েন।* "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের স্থানে স্থানে কর্ণামৃতের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের আর একটী যুক্তি এই যে, বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতার শেষে গোবিন্দদাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাঁহার মনে সহসা এই বিশ্বাসেরই উদয় হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে "অনেক পদ একত্রে রচনা করিয়াছেন।" লেখক গোবিন্দদাস নামযুক্ত বিদ্যাপতির এই কয়েকটী পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তুবি
পূরল ইহ রস ওর।"

পুনশ্চ

"বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর।"

গোবিন্দদাসের আরও দুইটী কবিতাতে রাজা বৈদ্যনাথ ও রূপনারায়ণের নাম সংযুক্ত দেখা যায়।

---

* তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবিন্নাতীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল॥
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যখণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।

"কমল নীত চরণকমল মধু
পাওবে যো সোই সুস্থান।
রাজা বৈদ্যনাথ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস-অনুমান॥"

"লোচন খঞ্জন জগতজনরঞ্জন
কুলবতী যুবতী বরত ভবভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ণ
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥"

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন; এই কারণে তাঁহার কবিতাতে হিন্দী ও হিন্দীসম শব্দের অধিকতর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কেবল গোবিন্দদাস নহে, পরবর্ত্তী প্রায় সমুদায় বৈষ্ণব কবিই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভণিতাসম্বলিত উপরোক্ত কবিতাগুলি গোবিন্দদাসের রচিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রায়বসন্ত ও গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত

"রায়বসন্ত মধুপ আনন্দিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"
"রায়বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।"

এই পদাংশ দেখিয়া লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, "অনেকে বিদ্যাপতি ও রায়বসন্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহাই হউক বা উঁহারা সমসাময়িকই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।" সুতরাং লেখক মহাশয়ের মতে গোবিন্দদাস নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির সমকালীন ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রায়বসন্ত ও বিদ্যাপতি যে এক ব্যক্তি না

ও তাঁহাদিগকে সমসাময়িক হইতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; বোধ হয় পাঠক মহাশয়গণ তাহা স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু প্রবন্ধলেখক মহাশয় গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে এতই ব্যতিব্যস্ত যে, যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, ইহাঁরা সকলেই একস্থানবাসী, এক সময়ের লোক এবং ইহাও অসম্ভব নয় যে, সকলেই এক রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বোধ হয় তন্মধ্যে বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাসদ্, এবং গোবিন্দদাস রূপনারায়ণ ও বৈদ্যনাথের সভাসদ ছিলেন। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরগ্রাম, আর বিদ্যাপতি মিথিলানিবাসী। পরন্তু শিবসিংহ ও রূপনারায়ণ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি নহেন, শিবসিংহের পূর্ণ নাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যক বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতবর ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাপতির জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশস্থ বাসপী গ্রামে বাস করিতেছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

লেখকমহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, "অতএব আমরা এই প্রস্তাবে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" তিনি কিরূপ "যথার্থ তত্ত্ব প্রকটন" করিয়াছেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

গোবিন্দানন্দ ভাগবত, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ এই তিন ব্যক্তিকেই লেখক মহাশয় এক একজন স্বতন্ত্র পদকর্ত্তা

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদের কেবল নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত বিশেষ বিবরণ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গনে নিশাকীর্ত্তন ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনের পর নীলগিরিতে সপ্ত সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্ত শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। গোবিন্দানন্দ একজন মহাভাগবত ও গোবিন্দদত্ত প্রধান কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। বাসু ঘোষের ন্যায় ইঁহারা স্বরচিত পদ গান করিতেন কি না তাহার কোনও প্রমাণ নাই, অথচ লেখক দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রথমটী গোবিন্দানন্দের ও দ্বিতীয়টী গোবিন্দদত্তের বলিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "গোবিন্দানন্দ চৈতন্যের প্রেমোন্মাদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া কহিতেছেন, 'পুলকে পূরল তনু নিশ্বগুণ শুনি' ইত্যাদি। এবং "ইনি (গোবিন্দ দত্ত) একজন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, ইহাঁর স্বরচিত অনেকগুলি পদও মনোহর, কিন্তু তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী অনুপ্রাসপূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এরূপ করিবার কারণ পদটী পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।" লেখকের অভিপ্রায় কি আমরা তাহার কিছুই মর্ম্মবোধ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক পদটীর ভণিতাটুকু আমরাও উদ্ধৃত করিতেছি।

০

গোরস গাহি গিরীশ্বরনন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ।

এই ভণিতায় গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দের নাম আছে, সুতরাং ইনি যে একজন গানরচয়িতা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপ-

উক্ত দুইটী পদ গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দদত্তের রচনা, লেখক তাহা কি উপায়ে জানিতে পারিলেন ?

তৎপরে গোবিন্দ ঘোষ। লেখক ইহাঁকেও একজন গোবিন্দদাস নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইহাঁরা তিন ভাই,—গোবিন্দ, মাধব ও বাসুঘোষ চৈতন্যের প্রিয় সহচর ছিলেন। নীলাচলে সংকীর্ত্তনের সময় গোবিন্দ ঘোষ একটী গায়কসম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যের আদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থ নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিলে মাধব ও বাসুঘোষ তাঁহার সঙ্গে আইসেন; গৌরগতপ্রাণ গোবিন্দ নীলাচলে প্রভুর নিকটেই ছিলেন। ইহাঁরা তিনজনে সঙ্গীত সংকীর্ত্তনের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বাসুঘোষের রচিত চৈতন্যলীলা সঙ্গীত তৎকালে ভক্তসমাজে আদরপূর্ব্বক গীত হইত। গোবিন্দ ঘোষ রচিত দুই চারিটী কবিতা বা গান শুনিতে পাওয়া যায়। লেখক তাহার একটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদটীর শেষ চরণ এই—

শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরে বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইব মরিয়া।

"এ গোবিন্দ ঘোষে কয়" ইত্যাদি বাক্যে রচয়িতা গোবিন্দ ঘোষ নামে স্পষ্টরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্দেশে ইনি "ঘোষঠাকুর" নামে প্রখ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার জন্মস্থল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত যৌগ্রামকুলীনগ্রাম। যেখানে হউক, বৃদ্ধাবস্থায় ইনি অগ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অগ্রদ্বীপে প্রতিবর্ষে "ঘোষঠাকুরের" তিরোভাব উপ-

মাঘে মেলা হইয়া থাকে। অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। * এই সকল কারণে অন্যান্য বৈষ্ণব-বাবাজী অপেক্ষা বরাবর ইঁহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইনি স্বনাম-বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও সাধু বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গোবিন্দ আচার্য্যকে প্রবন্ধলেখক অন্যতম গোবিন্দদাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "মালী-হাটী গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনিও গৌরাঙ্গের পরমভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।" শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে লেখক এপ্রকার ভ্রমে পতিত হইতেন না। "নরোত্তমবিলাস" ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে ইঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাগীরথী-তীরস্থ চাখুন্দিয়া গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা চৈতন্যের অনুগত ভক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে ইনি কাটোয়ার অন্তঃপাতী জাজিগ্রামে মাতামহাশ্রয়ে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পিতৃসন্নিধানে গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব অবগত হইয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্যদেব যখন জীবনের শেষাবস্থায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্ত-মণ্ডলীতে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য ভক্ত বৈষ্ণবগণের পরামর্শে শ্রীনিবাস চৈতন্যচরণ দর্শনের জন্য বহির্গত হয়েন, এবং কিয়দ্দূর গমন করার পর পথিমধ্যে গৌরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করেন। চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে ইনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও ভক্ত-

* ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাহায্যে রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আইসেন। তিনি অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়া ঘোষঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাসের বিদ্যাবুদ্ধি ও ভগবন্নিষ্ঠাতে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের পর শ্রীনিবাস বিবাহ করেন। ইঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ ও গীতগোবিন্দ। গৌড়লীলা সমাপ্তির বহুদিন পরে অবধূত নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী জাহ্নিগ্রামে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসের এই পুত্রগণকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের এই গীতগোবিন্দ নামক পুত্রকেই লেখক চৈতন্যের সমকালীন ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য বলিতেছেন। টিপ্পনীতে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের একটী কবিতাতে "প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত" এইটুকুমাত্র পাঠ করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "উৎকলাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য গৌরাঙ্গের আশ্রয় লইতে অনেক যত্ন করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া নৃপতির সহিত গৌরাঙ্গ কোন সংস্রব রাখিতে চান না। অনেক সাধ্যসাধনার পর তৎপ্রতি নিত্যানন্দের কৃপা হয়। এবং গৌরাঙ্গের অকৃপাতে যখন প্রতাপাদিত্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন, তখন নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের দ্বারা গৌরাঙ্গের এক বহির্ব্বাস লাভ করিয়া চৈতন্যের কৃপায় চিহ্নস্বরূপ উহা প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। এই বহির্ব্বাস পাইয়া প্রতাপাদিত্য আপাততঃ প্রাণধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেই অবধি গোবিন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত সখ্য জন্মে। শ্রীনিবাসসুত গোবিন্দ প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এবং স্বীয় কোন কোন পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়া গোবিন্দও তৎপ্রতি প্রচুর দয়াপ্রকাশ করিতেন।" বোধ হয় লেখক অবগত নহেন যে, তদানীন্তন উৎকলাধিপতির নাম

প্রতাপাদিত্য নহে। গজপতি প্রতাপরুদ্র নামক গঙ্গাবংশীয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দাচার্য্যের নিকট হইতে প্রতাপরুদ্রের জন্য চৈতন্যের বহির্ব্বাস চাহিয়া লয়েন নাই, ঈশ্বরপুরীর প্রেরিত চৈতন্যের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ভৃত্য গোবিন্দই নিত্যানন্দকে বহির্ব্বাস দিয়াছিলেন।* সুতরাং এইসূত্রে প্রতাপরুদ্রের সহিত গোবিন্দাচার্য্যের বন্ধুতার কথা লেখকের কল্পনা মাত্র। লেখক গীতগোবিন্দের স্বীয় পরিচয়াত্মক পদটী প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভণিতায় আছে—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসসুত
গীতগোবিন্দচিত ভোররে॥

এই কবিতাতে শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইনি গোবিন্দদাস নামে আপনাকে আর কোথাও পরিচিত করেন নাই। এদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবার (শিষ্য) বলিয়া যাঁহারা আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা আচার্য্য নামেই গুরুবংশের উল্লেখ করিয়া থাকেন। উক্ত কবিতার "শ্রীনিবাসসুত গীতগোবিন্দ ভোররে" এই ভণিতাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে গীতগোবিন্দ নামে একজন স্বতন্ত্র বৈষ্ণব কবি ছিলেন। আমরা কোন কোন প্রাচীন বৈষ্ণবের প্রমুখাৎ শুনিলাম গীতগোবিন্দের রচিত আরও দুই চারিটী পদ আছে। সুতরাং ইঁহাকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করিবার কোন কারণ নাই।

---

* তবে নিত্যানন্দ গোঁসাই গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা ষাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় করিতে বলেন। দেবীর বাক্যে গোবিন্দের চৈতন্য হয়। তখন অনুতাপ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে দৈন্যোক্তি করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইবামাত্র রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া বুধরীতে আসিলেন। গোবিন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অতিকষ্টে হাতযোড় করিয়া আচার্য্যকে অস্ফুট গদগদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বক্ষস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীনিবাস গোবিন্দকে 'হরিনাম মহামন্ত্রে' দীক্ষিত করিলেন। কথিত আছে তৎক্ষণাৎ গোবিন্দের শান্তি হইল, এবং তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া এই পদটী রচনা-পূর্ব্বক ভক্তগণকে শুনাইলেন।

ভজহঁ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দু।
দুরলভ মানুষ জনমে সতসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু॥
শীত আতপ রাত বরিষনে এ দিন যামিনী জাগি।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লাভ লাগি॥
এ রূপ যৌবন ভবন ধনজন কি আছে ইথে পরতীত।
কমলদলজল জীবন টলমল ভজহ হরিপদ নিত॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস।
পূজন সখীগণ আত্মসমর্পণ গোবিন্দদাস অভিলাষ॥ *

ভক্তমালের বর্ণনানুসারে এই পদটীই গোবিন্দদাসের সর্ব্বপ্রথম রচনা। দীক্ষার পর হইতে ইনি "গোবিন্দদাস ঠাকুর" নামে বিখ্যাত হন। এবং রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসসিঞ্চিত প্রেমলীলা ও অপরূপ গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বিস্তর পদ রচনা করেন।

গোবিন্দদাস ক্রমশঃ "সঙ্গীতমাধব" নামে নাটক ও "গীতা-

* এই পদটীর নানারূপ পাঠান্তর আছে। আমরা তিন চারিখানি পুস্তক মিলাইয়া লিখিলাম।

খৃত্ত" গ্রন্থ রচনা করেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবন গমন করিলে, তত্রস্থ ভক্তগণ তাঁহার কাব্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করেন। জীবগোস্বামীপ্রমুখ বৃন্দাবনবাসী প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে গোবিন্দদাসের আসন অতি উচ্চ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কবি বলিয়া বিশেষ সম্মানিত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দদাসরচিত "সঙ্গীতমাধব" ও "গীতামৃত" গ্রন্থ এখন অতীব দুষ্প্রাপ্য। "পদামৃতসমুদ্র," "পদকল্পতরু," "পদরত্নলতিকা" প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সংগ্রহ-পুস্তকে গোবিন্দদাসের পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত একান্নটী পদসংযুক্ত "একান্নপদ" গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

গোবিন্দদাসের জীবনী সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু আমরা জানিতে পারি নাই। লেখক মহাশয়ও বেশী কিছু বলেন নাই। লেখক একস্থানে বলিতেছেন, "ইনি চৈতন্যের জন্মের ৮২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাব্দায় বা ১৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।" আমাদের বিবেচনায় চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের অল্পদিন পরেই গোবিন্দদাসের জন্ম হইয়াছিল। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দদাসের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং "নরোত্তমবিলাসে" লিখিত আছে, বৃন্দাবনে ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৫৩৭ শকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ হয়। * এই সময়ে কৃষ্ণদাস

* শাকে সিন্ধ্বগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অতিশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাসকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমকালীন লোক বলিয়া স্থির করিলে, শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ ১৪৮০ শকাব্দায়, কি তাহার দুই চারি বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সনাতন গোস্বামী "বৈষ্ণবতোষণী" গ্রন্থ ১৪৭৬ শকাব্দায় রচনা করেন। * ইহার পরেও তিনি কিছুদিন সম্ভবতঃ ১৪৯০ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রিয়সুহৃৎ নরোত্তম ঠাকুর যখন যৌবনের প্রথম অবস্থায় বৃন্দারনে ভক্তমণ্ডলীতে আসিয়া মিলিত হন, তৎপূর্ব্বেই রূপ ও সনাতন গোস্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে ১৫০০ শকাব্দায়—কি ২।৪ বৎসর অগ্রপশ্চাৎ সময়ে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পদাবলী রচনাতে নিযুক্ত হন বলা যাইতে পারে। কেবল গোবিন্দদাস কেন, জ্ঞানদাস, শিবরামদাস, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শুন শুন নিবদয়হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই—ইত্যাদি।

যে পদটী টিপ্পনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তে

প্রতাপ আদিত এবসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।

এই ভণিতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, গোবিন্দদাস নামে কোন কবি যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। কোন কোন কবিতার শেষে "রায় বসন্ত মধুপ আন-

* "সজ্জনতোষণী" ২য় খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যা।

ক্ষিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ" ইত্যাদি ভণিতা পাঠ করিলে এই অনুমান যে নিতান্ত অমূলক তাহা বোধ হয় না। রায় বসন্ত বা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন;ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই বসন্তরায় একজন কবি ছিলেন, এরূপ প্রবাদও শ্রুত হওয়া যায়। "নরোত্তমবিলাস" পাঠে জানা যায় মহাকবি বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। * ইঁহাকে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় বলিয়া অসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতে পারে, এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। গোবিন্দদাসের কবি-জাতে প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের নাম এবং বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাসস্বরূপ নরহরিদাসপ্রণীত নরোত্তমবিলাসে মহাকবি বসন্তরায়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তরায় ও বুধরী-নিবাসী গোবিন্দদাস এক সময়ের লোক ও উভয়ে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন।

"ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "প্রতাপাদিত্য, স্বীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় পুত্রকেও হত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্ঞী নানা কৌশলে ঐ যুবকের জীবন রক্ষা করেন। একবার কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়াতে, তিনি কচু রায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অবশেষে কচু রায় পলায়ন করিয়া সম্রাটের শরণাগত হইলেন। তৎকালে সম্রাট জাঁহাগির দিল্লির রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপা-

* জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্তরায়।
সদামগ্ন যাঁহাকৃষ্ণ চৈতন্যলীলায়॥
নরোত্তমবিলাস, দ্বাদশ বিলাস।

দিত্যের নৃশংস ব্যবহারে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার দমনার্থে রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন।" * এই সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দার নানা প্রকারে রাজা মানসিংহের সহায়তা করায় মানসিংহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৪টী পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর উক্ত জমিদারীর ফরমাণ বা রাজসনন্দ ভবানন্দকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ফরমাণের তারিখ হিজরী ১০১৫ খৃষ্টাব্দ ১৬০৬ † ১৫২৮ শকাব্দ। ইহার পূর্ব্বে বৃদ্ধাবস্থায় বসন্তরায় নিহত হইয়াছিলেন। বসন্তরায় ও গোবিন্দদাসকে সমসাময়িক বলিয়া ধরিলে ১৫০০ শকাব্দার কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দদাস পদরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাপতির ন্যায় গোবিন্দদাসের পদাবলীতে হিন্দীশব্দের অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মাধুর্য্য, শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং বর্ণনার সৌন্দর্য্যে তাহা অতিশয় প্রীতিপ্রদ; অনেকস্থলে ভাবের গভীরতাও যথেষ্ট আছে।

লেখক মহাশয় অপর তিনজন গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে গীতরচয়িতা বলেন নাই; সুতরাং আমরা তাঁহাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিলাম। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা আর দুইজন গোবিন্দের নাম পাইয়াছি। একজনের নাম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ভবনে ভক্তসহবাসে থাকিয়া নাম সংকীর্ত্তন সাধনভজন করিতেন, এইমাত্র জানা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম গোবিন্দ-

* ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত অন্নদামঙ্গল দেখ।
† ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত ৮০ পৃষ্ঠা।

দাস। ইঁহার নিবাস উত্তর রাঢ়। রথযাত্রার সময়ে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রতিবৎসর চৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করিতেন। এ ব্যক্তি সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধেও আর কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। *

আমাদের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমরা এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে,—(১) চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে গোবিন্দদাস নামে কোন বঙ্গীয় কবি ছিলেন না। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গীতগোবিন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রধান কীর্ত্তনগায়ক গোবিন্দঘোষ পদরচয়িতা হইলেও তাঁহারা স্বীয় স্বীয় নামেই আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে গোবিন্দদাস নামে অভিহিত করা যায় না। (৩) চৈতন্যের অন্যতম সঙ্গীতশিষ্য গোবিন্দানন্দ ভাগবত ও গোবিন্দ দত্তকে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলা যাইতে পারে এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে গিরীশ্বরনন্দন গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত একটী পদ দেখিয়া অনুমান হয়, ইনি একজন গানরচয়িতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। (৪) বুধরীনিবাসী শ্রীনিবাসশিষ্য গোবিন্দ কবিরাজই দেশবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস। (৫) রায়বসন্ত গোবিন্দদাসের সমকালীন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রধান কবি ছিলেন, ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

আমরা অনেক পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে যৎসামান্য যাহা জ্ঞাত হইতে পরিয়াছি, সহৃদয় পাঠকদিগের নিকটে তাহা উপস্থিত করিলাম। প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এদেশে চিরকাল কল্পনার

* প্রেমানন্দ দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্ক।

অন্ধকার গহ্বরে প্রচ্ছন্ন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যদি কেহ আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব।

ডাক্তার বাবু।

রামদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধিতে ভট্টাচার্য্য, বয়সে নবীন, ব্যবসায়ে ডাক্তার। নিজ বল্লভপুরে এবং তাহার আশেপাশে, রামদাসের ভারি পশার, ও অঞ্চলে নাকি তার জোড়াটী মিলে না। কিন্তু কেবল ডাক্তারীই তার ওজরান নয়, সে বহুরূপী। যখন হুঁকাহাতে, খালি পায়ে, শুধু পারে, "মাঠ ভাবকে" বাহির হয় তখন সে দাদাঠাকুর, যখন কপালে চন্দন, কাঁধে নামাবলি, হাতে নৈবেদ্য, তখন "পুরুত ঠাকুর, আবার যখন পোষাক আঁটা, ঘোড়ায় চড়া তখন ডাক্তার বাবু! তার আরও রূপ আছে, যখন ঢুলু ঢুলু নয়নে, স্খলিত বসনে, চঞ্চল চরণে কেলুয়ার দোকান হইতে বাহির হয়, তখন সে অপরূপ!

কিন্তু এহেন রামদাস চরিতামৃতের আস্বাদ সম্পূর্ণরূপে লইতে গেলে একটু পূর্ব্বাভাষের প্রয়োজন। রামদাসের পিতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস নয় বৎসর বয়সেই পিতার সহকারীরূপে ব্রতী হন। দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং রামদাস। বল্লভপুরের "গুরুমশায়" যখন আনাইলেন, রামদাসকে আর তিনি পাঠশালায় রাখিতে পারেন

না, ত্রিলোচন তখন পুত্রের পরিণাম চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন; এইরূপে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অকস্মাৎ সম্মুখে কূল দেখিতে পাইলেন। তাঁর এক যজমানের বন্ধুর জামাতা, সুকুমার মৈত্র কলিকাতায় ডাক্তারী করেন। সুকুমার বাবু শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন, শ্বশুরের অনুরোধে, ত্রিলোচনের আশীর্ব্বাদে বদ্ধ হইয়া, রামদাসকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন; সুকুমার বাবুর ক্ষুদ্র পরিবার—বন্দোবস্ত হইল, রামদাস তাঁর বাসায় রাঁধিবে, আর সুবিধা ও সাবকাশমত পড়াশুনা করিবে। রামদাস এ প্রস্তাবে মহাখুসী, পাড়াগাঁয়ের যে মজা সে ত তা লুটিয়াছে, এখন সহরের আস্বাদটা আর বাকি থাকে কেন? মহা উৎসাহে রামদাস নিজের ক্ষুদ্র পুঁটুলীটী কোমরে বাঁধিয়া সবে এই সত্তের বৎসর মাত্র বয়সে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল। নিজের কালি হুঁকাটী লইতে ভুলিল না, কিন্তু মনের আনন্দে, বাপ ভাইকে বিদায়ের প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।

সুকুমার বাবু রামদাসের গুণগ্রামের পরিচয় কিছু পূর্ব্বে পান নাই, একে একে তিনি দেখিলেন, রামদাস বিনা লবণে দাল রাঁধিতে পারে, ঝাল ব্যতীত মাছের ঝোল রাঁধে, তেল না হইলেও ভাজাভুজিতে তার আপত্তি নাই। প্রায়ই যেখানকার ঝালমসলা লবণ সেখানেই পড়িয়া থাকে, রামদাস এদিকে অবাধে ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া যায়। এইরূপে ডাক্তার বাবুর দিনে দিনে আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা শাপভ্রষ্ট নলরাজা, প্রচ্ছন্ন বেশে পাচকরূপে, তাঁহাকে ছলিতে আসিয়াছেন!

সুকুমার বাবু তাঁর পুত্র বিমলচন্দ্রকে বলিয়া দিলেন যেন তিনি রামদাসকে কিছু কিছু পড়ান। বিমল তাহাকে বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠা পড়াইতে পড়াইতে দেখিলেন, তাঁহার ছাত্রের বিশেষ-

রূপে বোধোদয় হইয়াছে। উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "কেন কেঁচো"। উত্তর শুনিয়া বিমল হাস্য সম্বরণ করিতে না পারায় রামদাস তর্ক ধরিল, বুঝাইল, যাহা মাটী ভেদ করিয়া উঠে, তাহাই যদি উদ্ভিদ, তবে কেঁচো কেননা উদ্ভিদ হইবে?

আজ যাহা পড়িল, কাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "বিলক্ষণ, ও যে পুরোনো পড়া"। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে রামদাস বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি পড়িয়া ফেলিল, এদিকে বিমল ক্রমে তাহার ছাত্রের বিদ্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। নিজের বিলসরকারী কাজটী দিলেন। নূতন পাচক নিযুক্ত হইল। রামদাসের উন্নতি হইল। বেতন তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকায়, বয়স সতের হইতে উনিশে, নেশা তামাক ছাড়াইয়া—ছাড়িয়া নয়—মদে উঠিল। তাহার সেই পল্লীগ্রামের চক্ষু, পক্ষীকুলায়ের ডিম্বের মত, এতদিন কলিকাতার বাসায় আবদ্ধ ছিল, অকস্মাৎ বাহিরের তাপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে এখন চটি ছাড়িয়া বুট ধরিয়াছে, চাদর রাখিয়া সার্ট পরিয়াছে, বেড়ি ফেলিয়া ছড়ি ধরিয়াছে। এইরূপে বিলসরকারী করিতে করিতে অকস্মাৎ তার সেই উর্ব্বর মাথায়, আলবার্টের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ফন্দি জাগিয়া উঠিল। সে তখন নানা উপায়ে কম্পাউণ্ডারের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা পাইল, চেষ্টা বিফল হইল না। সে একে একে কয়টা ঔষধের নাম জানিয়া লইল, ফিবার মিক্শ্চার, কুইনাইন মিক্শ্চার, তাও করিতে শিখিল। মাস কয়েকের মধ্যে সে বুঝিল, ডাক্তারী শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে আর তাহার বড় বাকি নাই।

ইহার মধ্যে একদিন শুনা গেল, ডাক্তার বাবুর একশেট অস্ত্র, একটা ষ্টিথস্‌কোপ, আর একটা থরমোমেটর পাওয়া যাইতেছে না!

... ...

পিতার সংশয়াপন্ন অবস্থা জানিয়া—হঠাৎ রামদাসকে বাটী যাইতে হইল। সে গিয়াই পিতার নাড়ি টিপিল—তার পর মুখ গম্ভীর করিয়া, দাদাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, কেন তাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল না; সে নিজে ডাক্তার থাকিতে, তাহার পিতাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইল, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? রামদাস তবু হাল ছাড়িল না, সে কাগজ কলম লইয়া, তাড়াতাড়ি বাঙ্গলায় প্রিস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিতে বসিল, দশ ক্রোশ দুর হইতে ঔষধ আনাইতে হইবে। ত্রিলোচন, এই অন্তিম কালে ডাক্তারী ঔষধ সেবনে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে রামদাস "প্রেজুডিস" বলিয়া, নাক সিট্‌কাইয়া, অধিকতর গম্ভীরভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিল। ত্রিলোচন অনিমিষলোচনে পুত্রের সেই পাণ্ডিত্য-গর্ব্বিত বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—ছেলে আমার ডাক্তার হয়েছে তবে আর "করে' খাবার" ভাবনা নাই! তখন বৃদ্ধের আনন্দাশ্রু বহিল, পার্শ্বে ও নিকটে যজমান যে দুচারি জন ছিল, তারা ভাবিল, "ছোটদাদা ঠাকুর আমাদের ডাক্তারীতে ভারি লায়েক হয়েছে।"

অর্দ্ধ ঘন্টা যাইতে না যাইতে ত্রিলোচনের শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইল, ঔষধ আনিবার নিমিত্ত লোক গ্রামের বাহির হইতে না হইতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল!

তার পর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রামদাস আবার কলি-

সে ধড়া আঁটিয়া চেন ঝুলাইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়। রামদাস যখন রোগীর নাড়ি টিপিয়া, দর্শনে অধর পীড়িত করিয়া, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে রোগীর বিবরণ শুনে, তখন কাহার সাধ্য ঠিক করে, ইনি এম-বি, কি এম-ডি! রামদাস বোতল বোতল ঔষধ দেয়, সময়ে সাবু মিছরিও যোগায়, কিন্তু দামের বেলায়, রামদাসের কড়াকড়ি নাই। কেহ আট দশ গণ্ডা পয়সা, কেহ পাঁচ সাত পালি চাল, কেহ ধান, কেহ গুড়, যে যা দেয়, রামদাস হাসিহাসি মুখে তাহাই লয়! রোগী যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, রামদাস তখন তাহার সাক্ষাতে সোডা এসিড তৈয়ার করিতে বসে! ফোস ফোস শব্দ মাত্র রোগীকে উল্লেখ করিয়া বলে, ভাইরে যেমন জোর দেখ্‌চো, ভিতরে গিয়েও ঔষধের এমনি জোর ধরিবে। শুনিয়া রোগী অবাক হইয়া যায়, দেখিয়া দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত হয়। কাহারো হাত কি পা ভাঙ্গিয়া গেলে রামদাস তৎক্ষণাৎ হ্যাণ্ডব্রাকসেন হয়েছে, ফ্রাকসান করিলেই ভাল হইবে বলিয়া জলগটি বাঁধিয়া দেয়! অস্ত্রবিদ্যাতেও রামদাস বিশেষ হাত দেখাইতে লাগিল। এইরূপে অচিরাৎ রামদাসের প্রসারে দেশ ছাইয়া উঠিল; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে একটা ধিধি, একটা চিচি পড়িয়া গেল!

রামদাস আর না ডাকিলে যায় না, টাকা বৈ সিকি আধুলি লয় না! চাল ধান গুড়ে আর তার তেমন রুচি নাই!

সুকুমার বাবুর শ্বশুরবাটী যে গ্রামে, একদিন সেখান হইতে রামদাসের একটা ডাক আসিল। রামদাসের আর একটা ডাক ছিল, সেইটা সারিয়া আসিতে তার কিছু বিলম্ব হইল। তার পর রামদাস সেই রোগীর বাড়ী গিয়া দেখে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে, সর্ব্বনাশ, স্বয়ং সুকুমার বাবু!

হঠাৎ পকেটস্থ ষ্টিথস্‌কোপ ও থারমোমেটারের দিকে রামদাসের নজর পড়িল, বুঝি, প্রাণটা তার কেমন করিয়া উঠিল!

সম্মুখে তীব্র-আলোক দেখিলে উদ্ধফণা অহিবিষ যেমন থমকিয়া দাঁড়ায়, অথবা অজাগর সম্মুখে পক্ষীকুল যেমন নিস্পন্দ হইয়া যায়,—প্রথম সাক্ষাতে সুকুমার বাবুর সম্মুখে রামদাসেরও সেই দশা ঘটিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যপুত্র রামদাস একেবারে বোকা বণিবার পাত্র নহে, সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, ষ্টিথস্‌কোপটাকে পকেটের এক প্রান্তে রাখিল। তারপর তাড়াতাড়ি, হাসিহাসি মুখে সুকুমার বাবুকে সাহেবি ধরণে নমস্কার করিল, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেও কসুর করিল না। সুকুমার বাবু অভ্যাসবশতঃ প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু হঠাৎ রামদাসকে বড় একটা চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না, তারপর যখন চিনিলেন—তখন বলিয়া উঠিলেন—"আরে কেরে, রামদাস, তুই কোথা থেকে রে"—পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল—"এজ্ঞে উনি আমাদের বল্লভপুরের ডাক্তার বাবু।"

সুকুমার বাবু নির্জ্জনে রামদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাঁহার কাছছাড়া হইয়া রামদাস কোথাও ডাক্তারী কিছু শিখিয়াছিল কি না তাও সুধাইলেন; রামদাস দুই চারিটা কথা লুকাইয়া সমস্তই জানাইল; আরও বলিল, আপনার কম্পাউণ্ডারের নিকট যে দুই একটা রোগের চিকিৎসা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই রোগ কটার চিকিৎসার সময়ই একটু একটু গোল বাধে, মনে হয়, যেন ভুল হইতেছে, কিন্তু বাকি সকল রোগের চিকিৎসাই চক্ষু বুজিয়া অনায়াসে করিয়া যাই। সুকুমার বাবু যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন "যাই করিস্ দেখিস্ যেন বাড়ীর বা আত্মীয় বন্ধুর চিকিৎসা করিস্‌নে"—তার উত্তরে রামদাস

হৃদয়ের গান যেথা জড় প্রতিঘাতে
কাঁদিয়া আসে না ফিরে ;
অচেতন জড় বাধা না পারি ভাঙ্গিতে,
কাঁদে না হৃদয়তীরে ?
আছে কি সে স্থান যেথা অসীম আকাঙ্ক্ষা
ক্ষুদ্র অসীমের মাঝে
প্রতি পদে বাধা পেয়ে, চির কারারুদ্ধ,
আপন মর্ম্মে না বাজে ?

২

মাঝে মাঝে একদিন না জানি কেমনে
কোন্ মায়াবী কুহকে,
কোথা হতে হৃদিমাঝে সৌন্দর্য্য পশিয়া
ভরিয়া দেয় পুলকে !
প্রেয়সীর করস্পর্শ যেন দেহপরে
স্বপনে পড়ে গো আসি',
প্রেয়সীর প্রেমদৃষ্টি বিরহী নয়নে
সহসা আসে গো ভাসি'।
যেমন লুকান প্রেম ফুলের হৃদয়ে
লাগি' সন্ধ্যার বাতাস
মধুর সৌরভরূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে
নিজেরে করে প্রকাশ।
এ কুহকবলে মোর অন্ধকারাগার
আপনি টুটিয়া যায় ;
উন্মুক্ত পরাণ মোর সঙ্গীত আকারে
জগৎ প্লাবিয়া দেয়।

মহাকাশ ব্যাপ্ত করি' ভরি' চন্দ্রালোক
ভ্রমি' তারায় তারায়,
আলোকের বহির্দ্দেশে মহাশূন্য যেথা
অশ্রান্ত ছুটি বেড়ায়।

৩

সহসা ভাঙ্গিয়া যায় কুহক ক্ষমতা
স্বপনের মায়াসম,
সহসা আবার দেখি জড় কারাগারে
আবদ্ধ হৃদয় মম।
মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ বিদ্যুৎ যেমন
সব টুটি' বাহিরায়,
এক মুহূর্ত্তের তরে জগৎ চমকি'
অন্ধকারে মিশে যায়,
তেমনি এ প্রাণ মম ক্ষণেকের তরে,
না জানি কিসের বশে
সকল বন্ধন ভাঙ্গি বাহিরিয়া হায়,
পুনঃ কারাগারে পশে।
আবার আবার হায় সেই কারামাঝে
রুদ্ধ এ পরাণ মোর,
আশাহীন প্রাণ শুধু অনুভব করে
ভীষণ আঁধার ঘোর।
মাঝে মাঝে ভ্রম হয় জড় ছাড়া বুঝি
জগতে কিছুই নাই,
আমি যেন আমি নই জড়ের পীড়নে
জড় মাঝে মিশে যাই।

৪

কবি,

তোর এই দেহমাঝে জড় কারাগারে
অবরুদ্ধ যে পরাণ,
তোরেও শুধাই আমি জানিস্ কি তুই
কেমনে কে গাহে গান ?
অশরীরী হয়ে যবে কামরথে চড়ি'
তুলিস্ স্বর্গের ফুল,
বলিতে পারিস্ তুই কাহার কুহকে
ছাড়ি' সীমাবদ্ধ কূল
অসীমের রাজ্যপানে উড়ে চলে যাস্
অনন্তে হইতে হারা!
সৌন্দর্য্যের রাজ্যমাঝে প্রবেশি, হইতে
প্রেম মদে মাতোয়ারা ?

কবি,

বীণার (ই) মতন্ তুই! কেমনে কে জানে
কোন্ নিরুদ্দেশ হতে
কাহার কুহক তোরে ভাঙ্গি' কারাগার
নিয়ে যায় স্বর্গপথে!

সাময়িক সারসংগ্রহ।

সম্মোহন-তত্ত্ব।

আজকাল সম্মোহন-তত্ত্ব লইয়া য়ুরোপে খুব আন্দোলন চলিতেছে। প্রথম, মেস্‌মের্ নামক একজন পণ্ডিত এই বিষয়ের

আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন, একপ্রকার তরল পদার্থ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেই পদার্থ মানব-দেহেও বর্ত্তমান। এই পদার্থ যাহার শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আছে, সে আপন অপেক্ষা হীনতর ব্যক্তির উপর প্রভাব প্রকটন করিয়া তাহাকে বশ করিতে পারে—সেই প্রভাবের নাম তিনি "প্রাণীদেহের চুম্বক-শক্তি" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এ কথা বড় মানিতে চাহেন না—মেস্‌মেরিজমে যে একটা রহস্যময় আবরণ ছিল, সেই আবরণটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া, ভেল্কির রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া, উহাকে তাঁহারা চলিত ঘটনার সামিলে আনিতে চাহেন। তাই মেস্‌মেরিজমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা হিপ্‌নটিজম এই শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হিপ্‌নটিজমের ঠিক্ অনুবাদ—সুপ্তিতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার ইহাও তদনুরূপ। ফলতঃ ইহা একপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে নিদ্রা বা স্বপ্ন প্রবর্ত্তন করা। এ নিদ্রা একপ্রকার সজাগ নিদ্রা এবং ইহা কতকটা স্নায়ু-বিকারের ফল। তাই হিপ্‌নটিজমের অনুবাদে উপসুপ্তিতত্ত্ব বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেস্‌মেরিক সম্মোহনে, মুখের সাম্নে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রা আকর্ষণ করাই চলিত পদ্ধতি—কিন্তু আধুনিক উপসুপ্তি প্রবর্ত্তকেরা এ পদ্ধতিটি বড় অবলম্বন করেন না।

উপসুপ্তি সঞ্চার করিবার তাঁহাদের দুইপ্রকার প্রণালী আছে। দুইটি পরীক্ষা-বিবরণ এস্থলে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন সেই দুই প্রণালী কিরূপ। জর্ম্মান পণ্ডিত মল পরীক্ষা করিতেছেন।

(১) "২০ বৎসর বয়স্ক একটি যুবকের উপর পরীক্ষা করিতেছি। তাহাকে একটা চৌকিতে বসিতে বলিলাম এবং তাহার হস্তে একটা বোতাম দিয়া বলিলাম—এই বোতামটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক। তিন মিনিটের পরে তাহার চোখের পাতা ঢলিয়া পড়িল; হাজার চেষ্টা করিয়াও চোখ খুলিতে পারিল না। এতক্ষণ বোতামটি সে খুব শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল—এক্ষণে তাহার হস্ত শিথিল হইয়া হাঁটুর উপর এলাইয়া পড়িল। আমি তাহাকে বলিলাম তুমি কিছুতেই চোখ্ মেলিতে পারিবে না—সে চোখ্ মেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু পারিল না—ইত্যাদি।

(২) "একজন ৪১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি চৌকিতে বসিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ক্রমাগত এই ভাবো যে তোমার ঘুমাইতে হইবে—এ ছাড়া আর কিছু ভাবিও না। এখন তোমার চোখ বুজিয়া আসিতেছে; তোমার চোখের পাতা ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। তোমার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছে—তোমার সমস্ত দেহে শ্রান্তি বোধ হইতেছে, একটা ভার বোধ হইতেছে, একটা ঘুমের ভাব আসিতেছে—এই তোমার চোখ্ বুজিল; তোমার মাথায় জড়তা আসিতেছে—তোমার চিন্তা সকল ক্রমশঃ গোলমেলে হইয়া আসিতেছে। আর তুমি ঘুম চাপিতে পারিতেছ না—এই তোমার চোখ্ বন্ধ হইল—এখন ঘুমাও। সে চক্ষু বুজিলে আমি তাহাকে বলিলাম, এখন চোখ খুলিতে পার কি? (চোখ্ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু পারিল না) আমি তাহার বাম হস্ত তুলিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলাম। (হাত সেইখানেই রহিল, হাজার চেষ্টাতেও হাত নাবাইতে পারিল না)।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘুমাইয়াছ কি? উত্তর—হাঁ ঘুমাইয়াছি। একেবারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছ?—উত্তর—হাঁ। ঐক্যতান বাদ্য শুনিতে পাইতেছ কি? উত্তর—"পাইতেছি বৈকি"। একটা কাল কাপড় তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম—এইটা যে কুকুর হাত দিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছ তো? উত্তর "স্পষ্ট পারিতেছি"। এখন তুমি চোখ্ খুলিতে পার—চোখ্ খুলিলে কুকুরকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহার পর তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ না আমি বলিব ততক্ষণ আর উঠিবে না। (সে চোখ্ খুলিল, কল্পিত কুকুরের পানে তাকাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল) আমি সেই কাল কাপড়টা তাহার হাত হইতে লইয়া মাটিতে বিছাইয়া দিলাম। (সে দাঁড়াইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে লাগিল।) তাহার পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, সে এক্ষণে পশু-শালার উদ্যানে আছে—যদিও আমার ঘরে ছিল, সে তাহাই বিশ্বাস করিল—বৃক্ষাদি দেখিতে লাগিল ইত্যাদি।"

অতএব দেখা যাইতেছে প্রথম প্রণালীতে একটা বস্তুর উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোনিবেশ করিতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে ঘুমের ভাব কথার দ্বারা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের যোগীরা ভ্রূমধ্য-বিন্দুতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া আপনাকে আপনি এইরূপে সম্মোহিত করিতেন—ইহাকে স্বকৃত-উপসুপ্তি বলা যাইতে পারে। উপসুপ্তিতত্ত্বের মূলমন্ত্র হচ্চে উপসুপ্তাবস্থায় কোন উপায়ে কল্পনা উত্তেজিত করিয়া দেওয়া—কথা কিম্বা ভাব-ভঙ্গির দ্বারা কোনপ্রকার ধারণা মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তৎকালে মনে যে ধারণার উদ্রেক হয় তাহাতেই ধ্রুববিশ্বাস জন্মে— এবং উপসুপ্ত ব্যক্তি সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে।

উপসুপ্ত ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের কথার নিতান্ত বাধ্য—তিনি যাহা বলেন সে তাহাই করে। স্বকৃত উপসুপ্তির আর এক দৃষ্টান্ত—মন্দির-প্রাঙ্গণে রোগী ব্যক্তির স্বপ্নৌষধ-লাভ। আমাদের এখানে ভাড়কেশ্বরের মন্দিরে রোগীরা হত্যা দেয়—হত্যা দিয়া কখন কখন স্বপ্নৌষধি লাভ করে। সেই স্বপ্নৌষধিতে যে উপকার হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। পুরাকালে গ্রীকদিগের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রোগী ব্যক্তি নিরশন থাকিয়া এক মনে আপনার শারীরিক অবস্থার বিষয় ভাবিতে থাকে—অধিক কাল নিরশন থাকিলে একটু না একটু স্নায়ু-বিকার স্বভাবতই উপস্থিত হয়—তাহার উপর আবার একাগ্রচিন্তা—ইহাতে করিয়া উপসুপ্তাবস্থা সহজেই উৎপন্ন হয়; এই সময়ে যে ঔষধির বিষয় স্বপ্ন দেখা যায় তাহাতে সহজেই ধ্রুব বিশ্বাস জন্মে। এইরূপে যে ঔষধ ধ্রুববিশ্বাসের সহিত সেবন করা যায় তাহাতে রোগ আরোগ্য হইবারই কথা। আজকাল য়ুরোপের ডাক্তারেরা উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তন দ্বারা অনেক রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। যে সকল রোগ স্নায়ু-ঘটিত তাহাই বিশেষরূপে এই পদ্ধতির দ্বারা প্রশমিত হয়। অনেকের পানরোগ এই পদ্ধতির দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধারণা উদ্রেক করিয়া দেওয়াই উপসুপ্তি-তন্ত্রের 'মূলমন্ত্র—সেই ধারণা যে শুধু উপসুপ্তাবস্থাতেই থাকে তাহা নহে—উপসুপ্তি ভাঙ্গিয়া গেলেও সেই ধারণা কাজ করে। মনে কর, উপসুক্তি-প্রবর্ত্তক উপসুপ্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তোমার মদ ভাল লাগে না—না?—সে বলিল "না"। তুমি জাগ্রত হইলেও তোমার মদ ভাল লাগিবে না—না? সে বলিল "না"। বস্তুবিকও সে জাগিয়া উঠিয়া এই ধারণানুসারেই কাজ করে।

তাহার মদ খাইতে আর ভাল লাগে না। উপসুপ্তিতত্ত্বে এইরূপ ধারণার উদ্রেককে উত্তর-ধারণার উদ্রেক বলে। যাহার প্রকৃতিতে ধারণার উদ্রেক-শীলতা অধিক, সেই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার অনুকূল পাত্র। সকল প্রকৃতিতে উপসুপ্তি সমানরূপে কার্য্যকরী হয় না। অনেকে মনে করে, যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের ইচ্ছায় জোর নাই তাহারাই বুঝি সহজে উপসুপ্তির অধীন হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। যাহারা মনস্থির করিতে পারে, একাগ্রচিত্ত হইতে পারে তাঁহাদের উপরেই বরং এই প্রক্রিয়া অধিক ফলবতী হয়। উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা যেরূপ লোকের মনকে ভালর দিকে লইয়া যাওয়া যায় সেইরূপ খারাপ দিকেও প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এই উপসুপ্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা য়ুরোপে মধ্যে মধ্যে বদ্‌মাইসিও হইয়া থাকে। আদালতের বিচারে অনেক সময়ে প্রকাশ হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি উপসুপ্তি-প্রবর্ত্তকের আদেশক্রমে কোন বদ্‌মাইসি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্বেচ্ছাক্রমে সে কাজ করে নাই। কিরূপ আইন করিলে এই প্রকার ঘটনা নিবারণ হইতে পারে সেই বিষয়ে য়ুরোপে আজ কাল আন্দোলন চলিতেছে। সম্মোহন-তত্ত্বকে এখন আর গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জর্ম্মনি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় সেইরূপ উপসুপ্তিতত্ত্ব বিষয়েও রীতিমত বক্তৃতা হইয়া থাকে।

ভাষা শিখিবার হদিশ।

মসিয়ো গুয়্যা নামক এক জন ফরাসিস পণ্ডিত, "ভাষা শেখা ও শিখাইবার হদিশ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া

ছেন। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তিনি বলেন, দুই তিন বৎসরের শিশুরা যে-কোন বিদেশীয় ভাষা ছয় মাসের মধ্যে শিখিতে পারে। তাহারা ব্যাকরণ পড়ে না, বর্ণমালাও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না, কথা বানান করিতে পারে না—কিন্তু চলন-সই কথা কহিতে পারে ও বুঝিতে পারে। নিতান্ত অবোধ শিশু যদি ছয়মাসের মধ্যে একটা বিদেশীয় ভাষা শিখিতে পারে, তবে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে কেন না শিখিতে পারিবে? তাহার সহজ উত্তর এই। শিশু কান দিয়া কথা শেখে এবং চোখ্ দিয়া যাহা দেখে তাহার সহিত শোনা-কথাগুলি মিলাইয়া লয়। শিশু ঘটনাগুলি চক্ষে দেখে এবং তদর্থবাচক কথাগুলি কানে শোনে; এবং এই দুই প্রকরণ একত্র হওয়ায় আনুষঙ্গিকতার নিয়মানুসারে, কথা কহিতে ও বুঝিতে সহজেই সমর্থ হয়। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহার ঠিক্ উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহারা চক্ষুর সাহায্যে বস্তুর প্রতিরূপ মনোমধ্যে গ্রহণ না করিয়া চক্ষের দ্বারা কথার প্রতিরূপটি মনোমধ্যে বসাইবার চেষ্টা করে। তাহারা কেবল চোখ্ দিয়া কথাগুলি গ্রহণ করে—ইহাতে কান তাহাদের বড় একটা কাজে আইসে না। অতএব শিশুর পদ্ধটিই ভাষা শিখিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি—গ্রন্থকার ইহা স্থির করিয়া শিশুরা কিরূপে ভাষা শিক্ষা করে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন আলোচনা করিয়া কতকগুলি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত করিলেন। এই মূল সূত্রের উপর তাঁহার ভাষা-শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তিনি বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছেন।

সেই মূল সূত্রগুলি এই :—

(১) শিশুরা কতকগুলি ছাড়া-ছাড়া কথার দ্বারা ভাষা শিক্ষা করে না, পরন্তু পূর্ণাবয়ব বাক্যপরম্পরা দ্বারা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে।

(২) বাক্যের দ্বারা যদি ভাষা শিখিতে হয়, তবে ক্রিয়া-পদের উপরেই বেশি ঝোঁক্ দেওয়া আবশ্যক। কারণ ক্রিয়া-পদটিই প্রত্যেক বাক্যের প্রাণস্বরূপ।

(৩) কতকগুলি বাক্যপরম্পরা মনে রাখিবার জন্য শিশু তদর্থবাচক ঘটনাগুলি যেরূপ পরে পরে ঘটিতে দেখে তাহারই ছবি মনোমধ্যে স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়া লয়।

ভাষা-শিক্ষার এই রহস্যটি কি করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল গ্রন্থকার তাহারও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তিনি জর্ম্মণ ভাষা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, জর্ম্মণ ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিলেই তিনি জর্ম্মাণ ভাষা শিখিতে পারিবেন। এই উদ্দেশে তিনি জর্ম্মাণ ভাষার ব্যাকরণ দশ দিনের মধ্যে একরূপ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু হ্যাম্‌বর্গের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার আচার্য্যদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। যে ব্যভিচারী ক্রিয়া-পদ-গুলি এত কষ্টে তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি বক্তৃতার মধ্যে ধরিতে পারিলেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, ভাষার মূল ধাতুগুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই অভিপ্রায়ে জর্ম্মাণ ভাষার ধাতুগুলি তিনি বিলক্ষণরূপে আয়ত্ত করিলেন। মনে করিলেন এইবার ভাষা-শিক্ষার হদিশ পাইয়াছেন। এক্ষণে উৎফুল্ল হইয়া আবার সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখেন

এখনও পূর্ব্ববৎ—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অতঃপর, এই সমস্ত পদ্ধতি ছাড়িয়া দিয়া, তিনি নাপিতের দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, সেখানকার খদ্দেরদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দুই চারিটা দস্তুরমত ভদ্রতার বুলি শিখিলেন, কিন্তু কতকগুলি খাপ-ছাড়া বুলি শিখিয়া বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না। এক্ষণে তিনি অভিধানের সাহায্যে গেটে ও শিলরের রচনাবলী হইতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতেও বিশেষ কোন কাজ হইল না। বিরক্ত হইয়া অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এবার "অলেণ্ডর্ফ" ধরিলেন। একমাসের মধ্যে অলেণ্ডর্ফের সমস্ত পাঠগুলি শেষ করিলেন, শেষ করিয়াও দেখেন কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতেছেন না—সে বিষয়ে এখনও ঠিক পূর্ব্ববৎ। তিনি সমস্ত অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্যও হইলেন। তবুও ভাষার হদিশ পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া ক্লাসে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার একটি আড়াই বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে খুব কথা জুড়িয়া দিল। পাকা পাকা কত কথাই বলিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, এ যেমন অনর্গল ফরাসি ভাষায় কথা কহিতেছে, আমি যদি ইহার মত জর্ম্মাণ ভাষায় কথা কহিতে পারি, তাহা হইলে কি সুখেরই বিষয় হয়। এই ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, জীবনের কোন একটি নূতন ঘটনা প্রকাশ করিবার সময় এই শিশুটি কি-প্রকার প্রণালী অবলম্বন করে, তলে তলে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। একদিন তাহার মাতা, তাহাকে যাঁতা-কলের কারখানায় লইয়া যান—শিশুটি তাহার আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল ও তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বাড়ি

ফিরিয়া আসিল। আমি তাহার উপর চোখ্ রাখিলাম, মনে করিলাম, না জানি উহার মনে কিরূপ চিন্তা চলিতেছে, দেখা যাক্ কি করিয়া আপনার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। এক ঘণ্টা পরে যাহা যাহা দেখিয়াছিল তাহা সকলের নিকটে বর্ণনা করিবার জন্য সে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার গল্প বার-বার করিয়া সকলকে বলিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে কথা একটু আধটু বদল হয়—দুই একটা খুঁটিনাটি ভুলিয়া যায়—মনে করিবার জন্য আবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আইসে। এই প্রকারে, একটা তথ্য হইতে তথ্যান্তরে, একটা বাক্য হইতে বাক্যান্তরে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে উপনীত হইতে লাগিল। "তার পর" "তার পর" বলিয়া এক একবার থামিতেছে আর এই অবকাশে কথাগুলা মাথার মধ্যে গুছাইয়া লইতেছে; এবং গুছাইয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাগুলা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে। দেখা গেল, একটি পদের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া থামিতেছিল—সেই পদটি ক্রিয়া-পদ। গ্রন্থকারের হঠাৎ মনে হইল, এইবার ভাষা-শিক্ষার যথার্থ হদিশ পাইয়াছেন। এই হদিশটি তিনি মনোমধ্যে বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া আবার জর্ম্মনি দেশে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া একটি ভদ্র পরিবারের গৃহে বাসা লইলেন এবং সেই পরিবারের ছেলেদিগকে তিনি ফরাসি শিখাইতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে জর্ম্মণ ভাষায় তাঁহার কথা কহিতে হইত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন এবং এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন যে, একটা দুরূহ উৎকট দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে পারিলেন।

দন্ত-রক্ষা।

ডাক্তার মিলার, কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ দন্তরোগ চিকিৎসক, দন্ত সম্বন্ধে একটী পুস্তক বাহির করিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে, আমাদের পিতামহদের আমলে এইরূপ বিষয় লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করিবার বড় সার্থকতা থাকিত না; সেকালে দন্তরোগ বড় একটা জানা ছিল না। কিন্তু আজকাল সংবাদপত্রে এতপ্রকার 'দন্তচূর্ণে'র বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশেও দন্তের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় এ সম্বন্ধে মিলার সাহেবের বক্তব্য প্রকাশ করিলে নিতান্ত নিষ্ফল না হইবার সম্ভাবনা। ইহাঁর ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আছে আমরা তাহাই সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি।

আসল কথাটা যাহাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় সেই নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব মনুষ্য-দন্তের গঠন সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়াছেন। দন্ত নিম্নলিখিত কয়টি উপাদানে গঠিত—১। এনামেল (enamel); দন্তের যে ভাগ মাড়ির বাহিরে থাকে, ইহা তাহারই উপরিভাগের শ্বেতচিক্কণ আবরণ। ২। এই আবরণের অন্তর্ভাগে ডেণ্টীন (dentine) নামক আসল দন্ত্য পদার্থ। এই ডেণ্টীনের মাঝখানটা ফাঁপা এবং উহার মধ্যের গর্ত্ত হইতে চতুর্দ্দিকে এনামেল পর্য্যন্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র প্রসারিত। ৩। এই গর্ত্তের মধ্যে দন্তের স্নায়ব অংশটুকু (pulp) রক্ষিত। এই অংশ শুধু মধ্যের গর্ত্তে আবদ্ধ নহে; পূর্ব্বোক্ত সরু সরু ছিদ্র দিয়া সমস্ত ডেণ্টীন ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং মাড়ির ভিতর দিয়া শরীরের অন্যান্য স্নায়ুর সহিত ইহার যোগ আছে। ৪। মাড়ির

মধ্যে দন্তের যে অংশ আছে তাহার আচ্ছাদনের নাম সিমেণ্টম (cementum)।

দন্তের কার্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার মিলার যাহা বলিয়াছেন তাহা বাহুল্য বিবেচনায়, ডিঙ্গাইয়া একেবারে প্রকৃতপ্রস্তাবে উপনীত হওয়া যাক।

শুধু আমাদের দেশে নহে, সকল দেশেই দেখা যায় যে যত কাল যাইতেছে দন্তের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে মনুষ্যশরীরেরও এইরূপ দিন দিন অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং ইহার জন্য সভ্যতাকে দোষ দিয়া থাকেন। মিলার সাহেব বলেন যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে, রোগ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা কোন কাজের কথা নহে। এইরূপ মনে হইবার কারণ এই যে পূর্ব্বে যাহারা শারীরিক অপটুতা বশতঃ মোটেই টিঁকিতে পারিত না তাহাদের আজকাল, চিকিৎসা বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হওয়াতে, রুগ্ন অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা হইতেছে। এই জন্যই সভ্যতার প্রভাবে রোগের কারণ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইলেও রোগীসংখ্যা বাড়িতেছে।

কিন্তু দন্ত-রোগ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে উহা বাস্তবিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে বাড়িতেছে। য়ুরোপের মধ্যে স্পানিষ পর্তুগীজ প্রভৃতি যে জাতিসকল সভ্যতা-শৃঙ্খলে ভালরূপ ধরা দেয় নাই তাহাদেরই মধ্যে এখনো অক্ষুণ্ণ দন্তপাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ বা মার্কিন, যাহারা আজকাল সভ্যতাক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাহাদের শত জনের মধ্যে একজনের সমস্ত দন্ত নির্দ্দোষ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—সভ্যতার অবিশ্রাম ঝঞ্ঝটে অনেকগুলি কার্য্য করা হইয়া উঠে না যাহা দন্ত রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কি কি আবশ্যক তাহা দন্তরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ দুই প্রকারের—১। পিতামাতা হইতে আমরা যাহা কৌলিকসূত্রে লাভ করিয়াছি—২। নিজের দোষে আমরা যাহা ঘটাইয়াছি। প্রথমোক্ত কারণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পিতামাতার শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় দন্ত দুর্ব্বল বা অসম্পূর্ণ হয়। ইহার অবশ্য কোন প্রতিকার নাই, তবে বিশেষ সাবধানে নিয়ম পালন করিলে বিপদ-সম্ভাবনা কিছু কম। কখন কখন এমনও হয় যে চোয়াল ছোট হওয়ার দরুণ দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পায় না এবং ঠেসাঠেসিতে পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপ পরিণতি লাভ করিতে দেয় না। এ অবস্থায় কোন উপযুক্ত দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা যে কোন একটা দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ফাঁক ক্রমে আপনা হইতেই বুজিয়া আসে এবং বাকি দন্তগুলি যথেষ্ট স্থান পাইয়া আবশ্যকমত বাড়িতে পারে।

নিজের দোষে অনেক প্রকারে রোগ জন্মিতে পারে। একটা প্রধান কারণ রীতিমত পরিষ্কার না করা। মিলার সাহেবের মতে দন্ত মাজিলেই যে সব সময়ে রীতিমত পরিষ্কার করা হইল তাহা নহে। মুখের মধ্যে কোনরূপ খাদ্যাবশেষের লেশমাত্র উপস্থিত থাকিলে তাহা ক্রমে এক প্রকার জীবাণুর বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। এই জীবাণুগুলি একবার এনামেল-নষ্ট করিয়া ফেলিলে দন্তের স্নায়ব অংশ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বাতাস লাগিলে অতি তীব্র বেদনা অনুভব হয়। একবার এইরূপ অবস্থা হইলে আর সে দন্তকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার কোন উপায় নাই। তবে আজকাল এইরূপ ভগ্ন-দন্তকে কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া সকল প্রকার কার্য্য চালান যাইতে পারে।

কিন্তু পরিষ্কার করিবার প্রকৃত উপায় কি? প্রথমতঃ দন্তের ফাঁকে যেনরূপ বাজে পদার্থ না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গুলিদ্বারা দন্তমার্জ্জন অপেক্ষা দাঁতন করা বা বিলাতী ভৈষাণী বুরুষ * ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে অঙ্গুলি কেবল দন্তের উপরিভাগ দেখিতে পরিষ্কার রাখে, কিন্তু দন্তের ফাঁকে ফাঁকে, যেখানে অপরিষ্কার থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে দাঁতন-কাঠ বা বুরুষের ন্যায় অঙ্গুলির প্রবেশ সম্ভবে না। তাহার পর সহজ উপায়ে যাহা তাড়ান না যায় তাহার নিমিত্ত মিলার সাহেব এক ঔষধ † ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এই ঔষধ এক মিনিটকাল মুখে রাখিয়া ফেলিয়া দিলে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাতে কোনপ্রকার জীবাণু জন্মাইবার সম্ভাবনা একেবারেই দূরীভূত হইল। অজীর্ণ রোগ-জনিত লালায় যে অম্লরসের সঞ্চার হয় তাহা এই জীবাণু বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে এবং কঠিন এনামেলকে কিয়ৎপরিমাণে নরম করিয়া আনিয়া জীবাণুদের আক্রমণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। অতএব আজকাল আপিস ইস্কুল প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার জন্য খাবার সময়ে যেরূপ তাড়াহুড় পড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য, প্রকাশ্যভাবেই হোক বা অম্লরস আকারেই

---

* মিলার সাহেবের মতে Dr Pierreponte's perfect cleansing brushes সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† R. Thymol ... ... 1 gr.
Acid Benzoic ... ... 12 grs.
Tinct. Eucalypt. ... 1 dr.
Eau-de-Cologne ... 1 oz.
Oil of Peppermint ... 10 m.
Water add to ... ... 6 oz. Mix.
One teaspoonful in a wineglass of water.

হোক, যে অজীর্ণতা উপস্থিত হয়, তাহারই প্রভাবে বোধ করি এই নূতন রোগ আমাদের দেশ অল্প অল্প করিয়া অধিকার করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই জীবাণু-বিশিষ্ট লালা বড়ই বিষাক্ত। কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র জন্তুর রক্তের মধ্যে এই লালার কিয়দংশ প্রবেশ করাইয়া দিলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া যায়। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে এই লালা খাদ্যের সহিত মনুষ্যশরীরে প্রবেশ লাভ করিলে নানা প্রকার ঔদরিক গোলযোগ ঘটা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এমনও দুই একবার দেখা গিয়াছে যে, কোন গতিকে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যেরও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

মিলার সাহেবের গ্রন্থ হইতে এই দেখা যাইতেছে যে সাবধানে থাকাই প্রধান উপায়। একবার কোন গতিকে এনামেল নষ্ট হইলে স্বাভাবিক দন্ত আর ফিরিয়া পাইবার যো নাই। তবে সভ্যতার প্রভাবে যেমন স্বাভাবিক দন্ত নষ্ট হইতেছে তেমনি কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত করিবার নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হইতেছে। এখন একটি দন্ত ক্ষয় হইয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত স্নায়ব চেতন অংশটুকু বাহির করিয়া দন্তকে সম্পূর্ণ জড় করিয়া ফেলিয়া স্বর্ণ বা অন্য প্রকার ধাতুর দ্বারা সেই গর্ত্ত পুরাইয়া দিলে দেখিতেও কোন প্রভেদ পাওয়া যায় না কার্য্যও বেশ চলিয়া যায়। এবং সভ্যতার যখন দোষ দেওয়া হইয়াছে তখন এইটুকু প্রশংসাও করা উচিত যে, পূর্ব্বে যেরূপ, বৃদ্ধদের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দন্ত পড়িয়া গেলে, কোন উপায় থাকিত না এখন তাঁহাদের তেমন নিরাশ্বাস হইবার কোন কারণ নাই। কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই পূর্ব্বের দন্ত অপেক্ষা সুগঠিত দুইটি দন্তপাটি যে কেহ অনায়াসে পাইতে পারে।

বাল্যবিবাহ।

সম্প্রতি ডাক্তার ষ্ট্রাহান সাহেব "বিবাহ ও ব্যাধি" নামক গ্রন্থে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

ডাক্তার বলিতেছেন, নাবালক কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে, সেই চুক্তি জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণিত না হইলে আদালত তাহা কোনমতে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু বিবাহ এমন যে গুরুতর চুক্তি, নাবালক কর্ত্তৃক সেই চুক্তি সম্পন্ন হইলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর অন্য উপায় নাই। ইহা কি নিদারুণ বিধি নহে!

পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা অনেক সময়ে পাত্র নির্ব্বাচন করেন সত্য বটে, কিন্তু ইহাঁরা সকল সময়েই যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তাহা স্বীকার করা যায় না। যেখানে আমৃত্যু দৃঢ় বন্ধনে থাকিতে হইবে সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবনের সঙ্গী খুঁজিয়া না লইলে নানা অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবার খুবই সম্ভাবনা।

যাঁহারা বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া সমাজ সতেজ এবং উন্নত হয়। ডাক্তার লিখিতেছেন, বাল্যবিবাহে অত্যাশ্চর্য্য বংশবৃদ্ধি হয় সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে সমাজের কতদূর শোভাবর্দ্ধন হয় সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ রাশি রাশি যে সকল বিকৃতি, বালবৃদ্ধ জীর্ণ মানবসন্তান জন্মগ্রহণ

করে, তাহারা হয় শৈশবেই মানবলীলা সম্বরণ করে, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে যদি টিঁকিয়া যায় ত জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাকেই যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বল, সে স্বতন্ত্র কথা।

বাল্যবিবাহে সমাজে দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতার প্রতিরোধ হয়, এইরূপ মতও আজকাল শুনা যায়। কিন্তু এই দুর্নীতি কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ পাপমূর্ত্তিতে বিরাজ করে। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত মানবসমাজে, না বাল্যবিবাহপ্রসূত অশিক্ষিত হতভাগ্য মানব-কীটের মধ্যে। বাল্যবিবাহ করিয়া অসংযত বংশবৃদ্ধিপূর্ব্বক সমাজকে ব্যাধি-নিলয় করিয়া তোলা কি দুর্নীতি নহে।

ইহার পরে ডাক্তার মহাশয় বাল্যবিবাহে জীবনীশক্তির কিরূপে হ্রাস হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, পিতামাতার জীবনীশক্তি সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এই জীবনীশক্তি রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য দুরাচার প্রভৃতি নানা কারণে হ্রাস হইয়া আসে, অথবা স্বতঃই ইহা ক্ষীণভাবাপন্ন থাকে—যেমন অপূর্ণ বাল্যাবস্থায়। অতএব, বাল্যবিবাহে যে সকল সন্তানসন্ততি জন্মলাভ করে, জীবনীশক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত তাহারা চির-রুগ্ন এবং জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়।

নিম্নশ্রেণীস্থ জন্তুদিগের মধ্যে দেখা যায়, অপূর্ণ অপরিপুষ্ট অবস্থায় যে সকল শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়ই হ্রস্বাকার, নিস্তেজ এবং বিকলাঙ্গ হয়, এইনিমিত্ত যাহারা যৌন-সম্বন্ধে অশ্ব গো প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে, তাহারা উক্ত জন্তুরা যতদিন না পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাদের মধ্যে

মিলন সঙ্ঘটন করায় না। ডাক্তার নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন একটি শূকর অপূর্ণাবস্থায় যে সকল শাবক প্রসব করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই জন্মিবার পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মারা পড়িল। কিন্তু ঐ শূকর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়া আবার যখন প্রসব করিল তখন শাবকেরা বেশ সুস্থ, সবল এবং দেখিতে সুশ্রী হইল। গৃহপালিত কুকুরের সর্ব্বপ্রথম শাবকেরা জীবন্মৃত হইয়া কোন কাজে আসে না বলিয়া অনেক সময়ে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত অপেক্ষা অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততি যে অনেকাংশে হীন হয়, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আরিষ্টট্‌ল্ বলেন, গ্রীসের কোন-কোন বিভাগে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকায় সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত হ্রস্বকায় ছিল। ফ্রান্সে এক সময়ে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ভয়ে অনেকে যখন বাল্যবিবাহ করিল, তখন কীটের ন্যায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানসন্ততিরা সাঙ্ঘাতিক রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৮১২-১৩ খৃষ্টাব্দেও ফ্রান্সে বাল্যবিবাহের শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল।

বাল্যবিবাহপ্রসূত সন্তানসন্ততিরাই যে কেবল অন্ধ, খঞ্জ, উন্মাদ এবং উৎকট রোগাক্রান্ত হয় তাহা নহে, প্রসূতি মাতারও সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে। ডাক্তার ম্যাথিউস্ ডন্‌কান্ বলেন, গর্ভনষ্ট, যমক ও মৃতসন্তানপ্রসব প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের যে সকল বিপদ আছে, বাল্যবিবাহই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাল্যবিবাহ যদি সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কত যে শিশু-জননী অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহা বলা যায় না।

অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তানসন্ততিরা প্রায়ই দুঃসাহসিক হয় না, বিজ্ঞ ম্যারো ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে হত্যাকারী অপেক্ষা চোর প্রতারকের সংখ্যা এত অধিক। জোসেফ করসিও অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে কলকারখানার মজুরদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত। বার চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকা যাহাদের একবেলা অন্ন জুটে না, অজ্ঞানভাবশতঃ তাহারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যে বহু সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করিয়া জীবনকে অসহ্য করিয়া তোলে। বদ্ধবায়ুসেবন, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতিও যে এই রুগ্নসন্তান উৎপাদনের অন্যতম কারণ তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে রেজিষ্ট্রার জেনেরাল সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিবাহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, ষ্ট্র্যাহান সাহেব তাহা হইতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুরুষদিগের মধ্যে ৩৫৭৬ জন উনিশ বৎসর বয়সে, ৭২৮ জন আঠার বৎসর বয়সে, ৫৯ জন সতের বৎসর বয়সে এবং ৩ জন ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ করে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১৪৭২ জন সতের বৎসর বয়সে, ১৬৭ জন ষোল বৎসর বয়সে এবং ২০ জন পনের বৎসর বয়সে বিবাহ করে। ইহারা অধিকাংশই কলকারখানার মজুর। এই সকল বিবাহের ফল কল্পনা করিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পরিশেষে ডাক্তার বলিতেছেন, ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন যখন ষোল বৎসর অপেক্ষা ন্যূনবয়স্কা বালিকা অযথা সংসর্গে সম্মতি প্রদান করিতে অনুপযুক্তা বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে, তখন ঐ

বালিকা বিবাহে সম্মতি দান করিতে উপযুক্তা বলিয়া কিসে স্থির হইল! স্ত্রীজাতি আঠার বৎসর বয়সের নীচে এবং পুরুষজাতি কুড়ি বৎসর বয়সের নীচে বিবাহ না করিতে পারে এইরূপ আইন হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা।

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া সারা, কেহ পিতৃসত্যপালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র।

সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়া ছিল সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে ঘটনারও যেমন অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক, এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষ-পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্রব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বতকুলের বর্ণনা। কোন মহা ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার

অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। এক চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর দান দেখে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি, বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্কাঙ্গীনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ব্বোধ এক সান্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুইধারে কোথাও সান্দনবন্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে দধিভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরিবিলি তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর

সাহরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রামলাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযূথকে নীবার রোমন্থন করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীয় শুভ্র কোমলতা—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন—সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব, বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং সুডৌল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কার রমণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লিমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—কিন্তু নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্রহিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিল। গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া একএকবার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিনীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, আলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমায় চিত্রিত করিয়াছেন; কোথাও উষাকালীন ক্ষীণ পাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে; কোথাও বা পুরাতন পত্রাপগমে সমুদ্ধ-মনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু'একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্যচিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায় ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু'একস্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জ্বল দিন। সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্ত্তৃক ইন্দ্রবিজয় গাথা গাহিতেছে। রাজধানী সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভদিনে

শুভক্ষণে রঘু সেনাদল সহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায় ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘুসেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বূলপত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তীপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণবর্ণনার মধ্যে দু'একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধেশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশবিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দনপ্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংসক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম; সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইহাঁরি পিতামহ দিলীপ যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গ-

যখন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময়পাত্রমাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে ও নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সনগ্ন প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না, কালিদাস স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা চাই, নূপুরনিক্কণের উদ্দীপনা চাই, মদনশরের পরিচালনা চাই।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এসকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"হে দেবি! যে সময়ে আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই, সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্যবর্দ্ধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণদ্বারা জগৎ উপতাপিত এবং পার্থিব রস সমস্ত শোষিত করিয়া প্রেতগণ—

মেদিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলে সদাই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আনন্দিত হইল; বিহগ সকল বৃষ্টিজলে স্নাত ও ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতিকষ্টে, বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, তাদৃশ বৃক্ষ সমুদায় আশ্রয় করিতে লাগিল; মত্ত চাতকগণে সেবিত পর্ব্বত পতিত ও পতনোদ্যত জলে আচ্ছাদিত হইয়া তোয়রাশির ন্যায় প্রকাশমান হইল; এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুসংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায়, বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতি-সুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত ব্যায়ামাভিপ্রায়ে জল-পানার্থে তীরে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু হননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযূ নদীতে গমন করি-লাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্যস্থানে জলমধ্যে গর্জ্জনকারী বারণের শব্দতুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভপূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে গজ-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষতুল্য প্রদীপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।”

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন ফেসান মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণে এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়া-ছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালি-দাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণারস উদ্বেলিত হইয়া উঠে সেখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন; নূপুরনিক্কণসহিত অশোক তরুতে মৃদু পাদতাড়ন; কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী; ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যে শুনিলে সেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; —শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমাল-তালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি, কোথাও বা ওটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত সগরকাহিনী, পুরাতন মন্থনকোলাহল এবং

ইহারই মধ্যে যেখানে অবসর ঘটিয়াছে সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রয়াস। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ অবতরণের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেখানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধমৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই; এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে; আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে চারিদিক আকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সেদিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল; এই পম্পাসরোবরে—অহো!—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এইখানে একদিন স্তবকাভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল; দূরে ঐ পঞ্চাপ্সর বিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষ্ণাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং ব্যাজার্দ্ধসংদর্শিত মেখলা উভয়ই সফল হয় নাই; ঐ সরযূ দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এতদিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া

আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন করিয়া দিয়াছেন। রাম একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযূ পণ্যবাহিনী তরণীপরিপূর্ণা।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না; রাজকার্য্য মন্ত্রীবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নিবর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণপ্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদ্‌শাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ইহলোকের গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদ্‌শাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই উনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।—মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ বর্ষা, বিরহ এবং অভিসারের মায়াবচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুরমূর্ত্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারিদিক হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্যকার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠে নাই—তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি-বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ করিতেছেন,

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নাম্বুরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জন-ভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদ্যপানে অরুণনয়না স্খলিত-বচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয় যে যে-স্থানে আছে, এবং মদনাভাবে এই সকলের নিষ্ফলতা;—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভার যে বিশেষত্ব দেখা গেল শকুন্তলায় ইহার পূর্ণবিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গ সহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ-জনিত দ্রুত যে,

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্ বক্রং তদপি সমবেক্ষ্যং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে-বপুরিবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিক্রান্ত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথীর কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষিকন্যাদের জলসেচন এবং রাজার গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ; কুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভাব দৃশ্য; অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজাব উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান; সিংহশিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি এক একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি খুঁটিনাটি ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থাব মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যতরকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখায় বল্কল আটকিয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর কচি কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদ্‌স্পন্দন, পাণ্ডু মুখ-

কমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই তাহা নহে, বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে, ফিরিয়া দেখেন তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বারবার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নড় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পোরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত, রাজসভা, শার্ঙ্গরব শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনায় বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষি-বালিকার সমাবেশ করিয়াছেন সেখানে এই তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর, একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালিদাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ পথের দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটা দীর্ঘ

প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুইপার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ। প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণ-চাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্যও মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুইপার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনো পাখী, কখনো মেঘ, কখনো লতা, কখনো পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র-পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সম্মুখে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক খুঁটিনাটিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিত্রিতব্য বিষয়

নহে—কারণ বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতি নৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্রসমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।

বুদ্ধচরিত।

যদি বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত এবং বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের ন্যায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে সেই প্রকাণ্ড ধর্ম্মের নামগন্ধ পর্য্যন্ত থাকিত না এবং বৌদ্ধেরা যে কি প্রকার জীব ছিল তাহার পরিচয় আমরা কোন স্থানে বা কোন্ পুস্তকে পাইতাম না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাক্যের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইয়া অবতীর্ণ হয়। ইহার জন্ম ভারতে হয় বটে; কিন্তু ইহা জাতিনির্ব্বিশেষে সকল লোককে পরিত্রাণ দিবার জন্য সৃষ্ট হয়। সেই জন্য ভারত হইতে বহির্ভূত হইলেও আজ সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আমরা নানা দিক হইতে পাইতেছি। শুদ্ধ এদেশে প্রচারিত হইলে আমরা এধর্ম্ম যে কোনকালে জীবিত ছিল তাহা জানিতে পারিতাম না। কিন্তু শাক্য বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই তাঁহার ধর্ম্ম ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং অশো-

কের রাজত্বকালে তাহা এসিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাখণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেও আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদয় বৃত্তান্তই অন্য দেশ হইতে প্রাপ্ত হই।

এই ধর্ম্ম যে কিপ্রকারে এদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়া যায় তাহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা যায় বটে, কিন্তু সে বৃত্তান্ত ঘোর অন্ধকারে আবৃত। হিন্দুরা সে ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র রাখে নাই। তবে ইতিহাস এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা দুই একটা স্থূল কারণ অনুমান করিয়া লইতে পারি। প্রথমতঃ কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল এবং কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছিল। হিন্দুদিগের যত তন্ত্রমন্ত্রের বিষয় আমরা পাঠ করি সে সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্মকেও গ্রাস করিয়াছিল। অবশেষে এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কার এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইত না। সুতরাং সেই পূর্ব্বকার তেজ বল ও বিশ্বাস বৌদ্ধদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। এদিকে হিন্দুদিগের পৌরাণিক ভক্তি এবং একেশ্বরভক্ত দিন দিন গাঢ় এবং বলবান্ হইতে লাগিল। শাক্যের ধর্ম্ম এক হিসাবে নিরীশ্বর ছিল। সুতরাং তাহাতে যখন কুসংস্কার আসিয়া পড়িল তখন তাহার মধ্যে যাহা কিছু সার ছিল তাহাও লোপ পাইয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল যে যদি অনৈসর্গিক ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে হইল এবং তান্ত্রিক ভোজবাজিকে সম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তাহা হইলে এই সকল ব্যাপার ভক্তিমূলক হইলেই মনকে তৃপ্ত করিতে পারে। আর নিরীশ্বর হইয়া সে সকলকে বিশ্বাস করিলে বিশ্বাসের বলও থাকে না এবং মুক্তির কোন উপায়ও থাকে না। এই জন্য প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যেন

মন স্বভাবতঃ ভক্তির দিকে দৌড়াইয়া গেল। নিরীশ্বর ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে করিতে পুরাণাদির পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এধর্ম্মে যদি ঈশ্বরতত্ত্ব থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তাহার প্রাদুর্ভাব এ দেশে থাকিত। কিন্তু ঈশ্বরবাদ না থাকাতে ইহা ভক্তির প্রচণ্ড স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই।

ধর্ম্মপতনের দ্বিতীয় কারণ অদ্বৈতবাদের প্রাদুর্ভাব। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তির প্রচণ্ড উত্তাপে বৌদ্ধ তেজের হ্রাস হয়। সেই সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক উপস্থিত হইলে বৌদ্ধ আচার্য্যকেই পরাস্ত হইয়া মস্তক দান করিতে হইত। তৃতীয় কারণ রাজাদিগের আক্রোশ। মগধ দেশের রাজারা শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় প্রদেশেই হিন্দুধর্ম্মের আধিপত্য ক্রমশঃ স্থাপিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। হিন্দু রাজারা যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিলেন এবং যেখানে বৌদ্ধ বিহার ছিল সেইখানে সেই বিহার নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিবের মন্দির স্থাপন করিতেন। কাশীতে যত মন্দির এখন বর্ত্তমান আছে তাহার কোনটাই বোধ হয় অধিক পুরাতন নহে। প্রায় সকলই বৌদ্ধধর্ম্মের পরে স্থাপিত। ইহাও বলা যাইতে পারে যে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল তাহাদিগের প্রস্তর ও ইষ্টক লইয়াই এখনকার মন্দির সকল নির্ম্মিত। কাশীতে এখনও একটি বাজার আছে তাহার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড বোধ হয় সরনাথ হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ কারণ মুসলমানদিগের দেশ অধিকার। যখন মুসলমানেরা এদেশ জয় করে তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম কাশী এবং মগধ প্রদেশে জীবিত ছিল। তাহাদিগের আগমনে বৌদ্ধ কীর্ত্তি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা একেবারে

ভূমিসাৎ হইয়া যায়। বিহার সকল একে একে মস্‌জিদে পরিণত হইতে লাগিল এবং এতদ্ব্যতীত যত প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহা পুত্তলি বলিয়া এককালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের গৌরবের অন্তর্দ্ধান হয়।

হিন্দুদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ হইয়া যখন বৌদ্ধেরা পরাস্ত হয়, তখন বিজিত দলের সঞ্চিত যত পুস্তক ছিল তাহার অধিকাংশ নেপাল প্রদেশে নিরাপদ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এই ধর্ম্ম চীন তিব্বৎ জাপান ব্রহ্ম এবং সিংহল দেশে আশ্রয় পায় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদয় সেই সেই দেশের ভাষায় অনুবাদিত হয়। আজ সেই অনুবাদিত পুস্তকগুলি ফরাসী জর্ম্মণ এবং ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে। আমরা এই সকল পাঠ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধসমাজের সমুদয় মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি। ললিতবিস্তর বলিয়া যে বুদ্ধের জীবনী সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল তাহা তিব্বৎ এবং ব্রহ্মদেশে অনুবাদিত হয় এবং বিনয়শাস্ত্র সিংহল দেশে পালি ভাষায় সুন্দররূপ জীবিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! যে দেশে বুদ্ধের জন্ম, যেখানে তাঁহার ধর্ম্ম সহস্রবর্ষাধিক রাজত্ব করে সেখানে বৌদ্ধ সমাজের চিহ্নমাত্র নাই! কিন্তু সিংহল তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে যে সকল পুস্তক আছে তাহা হইতে আমরা সেই সমাজের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতেছি। শাক্য দেখিতে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহার মস্তকের কেশবিন্যাস কিপ্রকার ছিল, তাঁহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত কিম্বা ঈষৎ আলম্বিত ছিল, তাঁহার অঙ্গুলির নখগুলি তাম্রবর্ণ কিম্বা শুভ্রবর্ণ, তিনি বিশ্বাসীদিগের গৃহে কি খাইতেন, তাঁহার বস্ত্র কি বর্ণের ছিল—এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনের অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা পর্য্যন্ত আমরা কল্পনা

করিয়া লইতে পারি। আবার তাঁহার শিষ্যেরা কিপ্রকার খাদ্য আহার করিত, কি প্রণালীতে এবং পাতে উচ্ছিষ্ট না রাখিয়া অঙ্গুলি লেহন না করিয়া কিরূপ নিঃশব্দে আহার করিত, কিরূপ ঘরে শয়ন করিত, কি ভাবে পূজা করিত, কি মন্ত্র পাঠ করিত, পরস্পরকে কি ভাষায় সম্বোধন করিত, গুরুকে কেমন করিয়া সম্ভাষণ করিত, তাহাদিগের বিহার সকল কিরূপে নির্ম্মিত, এ সকলই যেন আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে অঙ্কিত আছে।

একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কার্য্য-গুলি বৃক্ষস্বরূপ। কিন্তু পৃথিবীর বৃক্ষের সহিত তাহাদিগের এই প্রভেদ যে, তাহাদিগের মূল জলে থাকে এবং শাখা প্রশাখা সকল জগন্মণ্ডলকে ছায়া দান করে। বাস্তবিক ধর্ম্মবৃক্ষের মূল স্বর্গে। তাহা যদি না হইত তাহা হইলে ইহা কি কখন সম্ভব হইত যে, হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা সকলই কাটিয়া ফেলিয়াছে অথচ সেই বৃক্ষ আজ নব শাখা বিস্তার করিয়া অন্য সকল দেশের লোককে ছায়া দান করিতেছে। মূলে দৈব তেজ না থাকিলে আবার সেই ধর্ম্ম পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারিত না।

এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে যেমন নানাপ্রকার উপকার লাভ করা যায় তেমনি আবার স্বদেশানুরাগ বাড়াইয়া দেয়। ভারত যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন কি ভাবে জাগ্রত হয় তাহা আমরা বুদ্ধের জীবনচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারি। ভারতের হুঙ্কার-রবে পৃথিবী জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সেই শব্দ শুনিয়া মানবজাতির সুষুপ্ত অবস্থা দূর হইয়া যায় এবং নূতন সত্য, নূতন রস, নূতন ভাব এবং বিশ্বাস আসিয়া পৃথিবীকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করে। আমরা সেই বুদ্ধদেবের জীবন বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম অধ্যায়।

শাক্যজাতি এবং কপিলবস্তু।

বুদ্ধের অনেকগুলি নাম ছিল। নামকরণের সময় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। লোকে তাঁহাকে শাক্যগৌতম কিম্বা শাক্য-সিংহ বলিয়া ডাকিত। তিনি সাধনে সিদ্ধ হইলে পর শাক্যমুনি এবং শাক্যবুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে তথাগত এবং সুগত বলিয়াও ডাকিত। শাক্যগৌতম তাঁহার জাতীয় নাম ছিল। ইহার অর্থ এই যে, তিনি শাক্য-জাতির লোক ছিলেন—এবং তাঁহার গৌতমগোত্রে জন্ম। শাক্য কিম্বা শক কিম্বা শাকী এইরূপ নামের এক বা ততোধিক জাতির কথা আমরা মহাভারত এবং গ্রীক পুস্তকেও পাঠ করিয়া থাকি। এই তিনটি এক বা স্বতন্ত্র জাতি ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে শাক্যদিগের কতকগুলি আচার ব্যবহারের বিষয় পড়িলে বোধ হয়, যে তাহারা ভারতের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর যদি মহাভারতে উল্লিখিত শক জাতি শাক্য জাতি হয়, তাহা হইলে এপ্রকার জাতি অনেককাল হইতে এদেশে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহা-দিগের উৎপত্তি নির্ণয় করিবার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

শাক্যেরা সূর্য্যবংশোদ্ভূত এবং তাহাদিগেরও পূর্ব্বপুরুষের নাম ইক্ষ্বাকু। এই জাতি অনেক দিন ধরিয়া সিন্ধুদেশে পটল নামক স্থানে রাজত্ব করিত। পরে তাহাদিগের মধ্যে একজন কাশীর অধিপতি হন। তাঁহার নাম অশ্ব। অশ্বের পাঁচজন মহিষী ছিল, যথা—হস্তা, চিত্রা, জন্তু, জালিনী এবং বিশাখা।

হস্তার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা ছিল। যখন হস্তার কাল হয়, তখন অশ্ব আর একটি দারপরিগ্রহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি সন্তান হয়। যখন এই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তাহার মাতা রাজাকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন যে, তাঁহার সমুদয় রাজ্য এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই সন্তান হইবে। অশ্ব আর কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহার চারি সন্তানকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমাদিগের প্রাপ্য রাজ্য আমি আর একজনকে দিয়াছি। আমি এই কার্য্য স্ত্রীলোকের মোহে পড়িয়া করিয়াছি। তোমরা আর এখানে থাকিও না। তোমাদিগকে যথেষ্ট ধন জন দিতেছি—তাহা লইয়া তোমরা আর একটি নগর প্রতিষ্ঠা কর।" পুত্রেরা যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় তাহাদিগের ভগিনীরা মনে করিল—আমরা বিমাতার কাছে থাকিয়া কি করিব?" সুতরাং তাহারাও ভ্রাতৃগণের সহগামিনী হইল। ইহা দেখিয়া নগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ভাবিল—রাজপুত্রেরা নিশ্চয় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিবে। আমরা সঙ্গে যাইলে ফিরিবার কালে যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইব। তাহা হইলে আমরাও ইহাঁদিগের সমভিব্যাহারে যাই না কেন।

এইরূপে চারিজন রাজকুমার পাঁচ ভগ্না এবং অসংখ্য অনুচর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কাশীর বাহিরে এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনের প্রান্তে এক হ্রদ ছিল এবং সেই হ্রদের এক-পার্শ্বে কপিলমুনির আশ্রম ছিল। তাঁহারা সেই মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপিলমুনি তাঁহাদিগের ইতিহাস আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"তোমরা এইখানে থাকিয়াই একটি নগর স্থাপন কর। আমার ইচ্ছা যে, এই আশ্রম যে স্থানে নির্ম্মিত, ঠিক তাহারই উপর নবনগরের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার ইচ্ছামত

কার্য্য করিলে তোমাদিগের রাজধানী জগদ্বিখ্যাত হইবে। দেখ, এই বনের পশুরা হিংস্রক হইয়াও হিংসা করে না। ব্যাঘ্র হরিণ এখানে কুশলে নিবাস করে। সুতরাং তোমরাও এখানে অবস্থিতি করিলে তোমাদিগের নগরও শান্তিপ্রিয় হইবে।" রাজকুমারেরা মহা উল্লাসের সহিত নগরনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শেষে নগর নির্ম্মিত হইলে তাহার নাম কপিলবস্তু রাখিলেন। তাঁহারাও কপিলের শিষ্য হইলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মুনি প্রসিদ্ধ সাংখ্যপ্রণেতা কপিল কি না? যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যদর্শনের অনুমোদিত একথা অক্লেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি বুদ্ধের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমত শাক্যজাতির রক্তস্রোতে দিয়া চলিয়া আসিতেছে একথা অত্যুক্তি নহে। স্বভাবতঃ বুদ্ধ সেই মতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন একথাও বলা যাইতে পারে।

অশ্রুজল।

(চিত্রদর্শনে)

১

তুষার উপরে বুকটি চাপিয়া
বালিকা কাঁদিছে জলে',
দু'টি আঁখি হ'তে ঝরে অশ্রুবারি
প্রণয় ভেঙ্গেছে বলে'।

২

পৌষরজনী; শিহরে অধর
শীর্ণ শিশির পরে;
শাদা মুখখানি ঝক্ ঝক্ করে
শুক্ল চাঁদের করে।

৩

যে প্রণয়ভরে সঁপেছে পরাণ
যাহার চরণতলে,
এত কে নিঠুর? ভেঙ্গেছে যে জন
প্রণয় সুখের ছলে।

৪

ভাঙ্গিলে হৃদয় পড়িতে পারে না
শীতের চাঁদিমা রাতে;
বসন্ত এ নয়—মলয় বহিয়ে
ফিরাবে আরেক পথে।

৫

জীবনের সখা হারালে যৌবনে
এমনি অদৃষ্ট ওর;
বরফের পরে বুক পাতি' তাই
করিছে তপস্যা ঘোর।

৬

ঝরিছে ঝরুক—ওই অশ্রুধারে
শ্যামল হইবে ধরা,
শীতের তুষারে দেখ সবে চেয়ে
কোমল কুসুমঝরা।

রীতিমত নভেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আল্লা হো আক্‌বর্" শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে, এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্ত্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক, বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল! বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! কাহার বজ্রমন্দ্রিত "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল, কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল!—বলিতে পার, সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্য্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন! বলিতে পার কি পাঠক?

হয়। বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীতমিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

হয়। বিশেষতঃ, বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

হয়। বিশেষতঃ, বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

হয়। বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

হয়। বিশেষতঃ, বঙ্কিমবাবু গবর্মেণ্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই—তিনি গবর্মেণ্টের পুরাতন কর্ম্মচারী—তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে—তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত—অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিম বাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভাল হইয়াছে সন্দেহ নাই। বন্ধু গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সঙ্গীত-মিশ্রিত সৌন্দর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছে।—আদর্শ সমালোচনা। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব "আদর্শ-সমালোচনা"-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সে জন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হই

নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন ত হয় ত কৃতকার্য্য হইতেও পারেন। কালিদাস ও সেক্ষপিয়র লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কি করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোট অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

ইনিই সেই ললিত সিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব? পাঠক জান কি? হর্ম্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? কেবল কি বায়ুভরে, না আনন্দভরে? দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া অনিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি? উনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ললিত সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই, গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন? অধীরচিত্ত ললিত সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে

অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য ললিত সিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মত তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্য্যকে পাষাণদুর্গের মত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে! কিন্তু ছিছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত রাজান্তঃপুরের উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বারীরাও দ্বাররোধ করে না, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব, এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণ-বায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক্—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা

করিলে তোমরাও অনুবর্ত্তী হইতে পার আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখ, বকুলতলে তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মত ঐ রমণী কে? হে পাঠক, হে পাঠিকা তোমরা উঁহাকে জান কি? অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখন বর্ণনা করা যায়? ভাষা কি কখনও কোন মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে! হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ কর! হে রূপসি পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ "ইহাকে কি এমন ভাল দেখিতে ভাই! হোক্ সুন্দরী, কিন্তু ভাই তেমন শ্রী নাই" তাহার মুখ মনে কর, ঐ তরুতলবর্ত্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি? উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা। রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্ এক অতিদূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন? কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল, এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুটি কোমল পুষ্পকোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগ-ভরে কম্পিত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "রাজকুমারি!" রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন "দেবি, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।" একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিত সিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মত লোক এরূপ ঘটনায় কি করিত? নিশ্চয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইত সেখানে আর একটা চাকরীর চেষ্টা দেখিত, কিম্বা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই—সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মত মহৎলোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরীও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন এক নিঃশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে, এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব" বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে; এইরূপ ইংরাজিকাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্ব্বলের রক্ষক, কেবল ধনী, উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্ম্মচারী-দের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য। সূর্য্য অস্তপ্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকাল রাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্য-বসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারী বদ্ধ রহিয়াছে তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, বৃহৎ শীকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারী।" দস্যুপতি কহিলেন "তবে এ শীকার আমার। তোরা এখানেই থাক্!"

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ "মা" বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল "ললিত!"

মুহূর্ত্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া এক চীৎকার শব্দ বাহির হইল "রাজকুমারী!"

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শীকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে ত আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জ্জনা করিয়াছে।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। মেঘনাদবধচিত্র। বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।—রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে, ভারতবর্ষের অনার্য্যজাতীয়েরা কি করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডীর মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ

করিলাম না।—সাকার ও নিরাকার উপাসনা। ইহাতে যে সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল, যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরো দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙ্গিবার এবং স্থলবিশেষে কেবল-মাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।—অনাহারে মরণ। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই এক স্থলে আমাদের খট্‌কা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে "তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভাল স্বদেশপ্রেমিক "better patriots"।" ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙ্গাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। সেই জন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ। মধুচ্ছন্দার সোমযাগ। বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই

আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে "মধুবিদ্যা" নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, "ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।" এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি যে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কি তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। উপাধি-উৎপাত প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্য্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মত মানী লোক জগতে সর্ব্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান্ যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থল-বিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ—কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ-লাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্যপাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্ব্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জ্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে

স্বরলিপি।*

তুমি কি গো তোমারি তরে
—শুধু তোমারি তরে,
ফুটিয়ে উঠেছ,
আছ গরব-ভরে ?
বাসে আপনি বিভোর,
চখে ঘন ঘুম-ঘোর,
ফিরে চাহিতে চাহনা যেন
অমর-নরে !

৪।২

।২´।৩।০।১।

২ ৩ ০
না না॥ র্সা র্সা না র্সর্রা। র্সা ঞা ধা -া। না না না র্সর্রা।
তু মি॥ কি লো তো মা। রি ত রে — । শু ধু তো মা।

১
। র্সা ঞা ধা -া। পা পা মা মা। গা রা পা পা।
। রি ত রে —। ফু টি রে উ। ঠে ছ আ ছ।

। মা গা মা রা। সা -া না না॥ মা গা। মা মা ধা না।
। গ র ব ভ। রে — (তু মি)॥ বা সে। আ প নি বি।

। র্সা -া না র্সা। র্গা র্গা র্রা না। র্সা -া র্সা না।
। ভো র্ চো খে। ঘ ন ঘু ম। ঘো র্ ফি রে।

---

* "সাধনার" জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানের স্বর-লিপি পাঠাইয়াছেন।

। সা গা মা পা। মা গা রা সা। না সরা সা ঞা।
। চা হি তে চা। হ না যে ন। অ ম র ন।

। ধা ন না না ॥
। রে — (তু মি) ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া আহারীর আরম্ভের যুগল ছেদের পর হইতে পুনরাবৃত্তি করিবে। অর্থাৎ আহারীতে ফিরিয়া গিয়া "তুমি" ছাড়িয়া একেবারে "কি লো" হইতে ধরিবে। এবং "কি লো" এইটুকুমাত্র গাহিয়া আবার অন্তরা ধরিবে; তাই, "কি লো" র পরে শিরোদেশে যুগল-ছেদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। এক ছেদ হইতে ছেদান্তর পর্য্যন্ত সুরগুলি এক পদের অর্থাৎ এক তাল-বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রতি-পদ-বিভাগের প্রথম সুরের উপর তালি কিম্বা ফাঁক পড়ে। কাওয়ালি তালে তিন তালি, এক ফাঁক। ১, ২, ৩-এই তিন তালির চিহ্ন ও ০ ফাঁকের চিহ্ন। যে সংখ্যার উপর রেফ্ থাকে সেইটি সম। কাওয়ালি তালে দ্বিতীয় তালিতেই সম পড়ে।—এই গানের আরম্ভ সম হইতে।

সাধনা।

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক একটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের জালায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোণার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম কমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল এমনও বোধ হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন্ কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না। তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, আ সর্ব্বনাশ! আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল রঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল। রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন। রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক-রকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

২

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে মাতার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া

দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!" কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্য-যুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। বশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যূষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ। কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। শেখর একবার অন্তঃপুরের জানালার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

দাঁড়াইয়াছিলেন। কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল—"আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন। পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়াই প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন—যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ

করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের জালায়ন সম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহোল্লাসে শত শতবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে! সকলে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন। এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন

গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভাভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন;—বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনও গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল, দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরি-গোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, কূলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল, এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উতলা হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী

মানসী মূর্ত্তি; কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমল-চরণের নূপুর-ধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহ-ব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি, ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধন্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বহ্নি, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ। এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতদের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে পেথরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন। রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশীর গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল;

যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পরিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪।

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যন্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুত-দত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শার্দ্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না। শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে, দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত

অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষদিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি, শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে?" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং "শেখর" শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক? এবং সঙ্গীতের বিস্তর চর্চ্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফল লাভ করিয়াছে? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল। ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে, কোন্ সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার আপনার হৃদয়ের কোন গভীর প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া

দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোণা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ

জ্বালাইলেন। তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল। কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে?" একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন "কবি, আসিয়াছি।" শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি। মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়-মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

সময়ে এদেশের ভাষা যে হিন্দীসংশ্রবশূন্য বাঙ্গলা ভাষা ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। "শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারে না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে তদ্রূপ মান্য করি।" (শ্রীকৃষ্ণবিজয়—উপক্রমণিকা) এই কাব্যের ভাষা কিরূপ প্রাঞ্জল ও তৎকালোচিত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা তাহার নিদর্শনস্বরূপে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন॥
শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বহে॥
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার।
নবকিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক বাড়িল দিবি চন্দ্রের কিরণে॥
কাম অবতার করি বংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল নারী মুর্চ্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দবংশী বায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে॥"

এক্ষণে অনেকে বঙ্গভাষার আদিকাব্য-রচয়িতা এই অপরিচিত কবির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন। ইতিহাসমাত্রেই লিখিত আছেন, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বাহ্মিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশরথ বসু নামক এক ব্যক্তি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এই কাব্যপ্রণেতা মালাধর বসু উক্ত দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে উৎপন্ন হন। ইনি রাঢ়ির কায়স্থকুলসম্ভূত ভগীরথ বসুর পুত্র, বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ কুলীনগ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। গৌড়েশ্বর ইহাঁকে "গুণরাজখাঁন" উপাধি দিয়াছিলেন, এইজন্য "গুণরাজখাঁন" নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিত হইয়া থাকেন।

যাত্রা-সমাপন।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি।)

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক্ ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুইধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালি-পায়ে রাত-কাপড় পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে' বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে' মেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার

বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

তারপরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতর-ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না—তখন আমরা পুরুষ-গণ নারীসহায়ব্রতে চৌকিউদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকি।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' যাওয়া যায়। ধূম্রসেবীগণ, হয় ধূম্রকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউবা নবেল পড়চে, কেউবা শেলাই করচে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুন্ গুন্ করে' আবার চলে যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে কয়টস্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বাল্‌তি পরস্পর হতে হতি দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই যুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্বস্ব স্থান থেকে কল্‌সীর বিড়ের মত কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্‌তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ কয়তে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে ঊর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠ্‌চে। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে, কেউবা গণনা করচে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বার-মোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের সমাগম হয়েচে। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে' মহিলা-দের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতা-মত ব্যক্ত করা গেল।

নটার ঘণ্টা বাজ্‌ল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারি-সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে' রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ডঘর। মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে তার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্‌চে। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাক্‌গ্যামন্, কিম্বা ড্রাফ্‌ট্ খেল্‌চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্বয়ট্‌স্ খেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্‌চে, এবং কোন শিল্প-কুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করচে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে কটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পান করে' শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদু-মন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু'চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে অনন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্না-রেখা ঝিক্ ঝিক্ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্ব ভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিচ্চে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্বস্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বল্‌চে। গুন্‌গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টাং ঠুং ঠুং শব্দ উঠ্‌চে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতায়াত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গিয়ে গুন্‌গুন্ করচে, কোথাওবা দু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন বুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাওবা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা করে' উচ্চহাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে' তুল্‌চে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে, কেউবা স্মোকিং সেলুনে কেউবা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চার জনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলচে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয় দু'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের

উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁকচে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে' ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌছন গেল!

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সী সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড় বড় চোখ সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতী পোষাক এবং চালচলন ধরেচে। বলে, ইণ্ডিয়া নাইক্ করে না। বলে, তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিনশো চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মুস্কিলে পড়েচে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে! লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়ই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহূত অযাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে' কোন "ফন্" নেই! উপরন্তু কেবল ল্যাঠা! এমন কি শত শত জর্ম্মান ফরাসী ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে "ফ্লার্ট্" করে' এসেচে

কিন্তু তাতে কোন মজা পায়নি! একটা মেয়েকে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা যায়, সে আদর করে' পাখার বাড়ি মারে এই ত ফ্লাটেশন, এতে "ফন্" নেই। লোকটা পৃথিবীতে কিছুতেই যথেষ্ট মজা পাচ্চে না; কিন্তু তার কাছ থেকে অন্য লোকে যে মজা উপভোগ করচে তা বোধ হয় সে স্বপ্নেও জানে না।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেচে; কেউ কর্‌ট্‌স্ খেল্‌চে, কেউ নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে; মুজিক সেলুনে গান চল্‌চে, স্মোকিং সেলুনে তাস্ চল্‌চে, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোন মনান্তর নেই। সংসারটা নোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে' সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে

অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্‌লে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ এক চোট ভৎর্সনা করেচি—সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে' বড় আরাম বোধ হচ্চে। এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে' বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

স্বরবর্ণ 'এ'।

বাঙ্গলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহার হইলে তাহার দুইপ্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর একটি অ্যা। 'এক' এবং 'একুশ' শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কেবল এসম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা হয়।—পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একারের কখনই বিকৃতি হয় না। 'জ্যেঠা' এবং 'জ্যেঠী' 'বেটা' এবং 'বেটী' 'একা' এবং 'একটু' তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ

হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে—অনেকস্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে। যথা 'তেলা' (তৈলাক্ত) এবং 'বেলা' (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক্, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা কেশ বেশ গেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য 'ন'য়ের পূর্ব্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা ফেন (ভাতের), সেন (পদবী), কেন, যেন, হেন। মূর্দ্ধন্য 'ণ'য়ের পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ এই নিয়ম খাটে কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গলায় তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ "দিন-ক্ষণ"কে 'দিন-ক্ষ্যাণ' বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি 'ন' অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে—বন, মন, ধন, জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট, মঠ, জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্ত্তী 'চ' অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড় বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে—

প্যাঁচ্। কিন্তু সেটা যে 'পেঁচ' শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। আর একটা বলা যায়, ট্যাঁচ্। 'ট্যাঁচ্' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্ব্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন চয়ের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ একার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এইখানে বলা আবশ্যক আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্ব্বনিয়মের দুটো একটা ব্যতিক্রম আছে। কোন পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন ত বাধিত হইব। এদিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোন গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর একটা ব্যতিক্রম 'লেজ' (লাঙ্গুল)। 'তেজ' শব্দের একার বিশুদ্ধ, 'লেজ' শব্দের একার বিকৃত।

বাঙ্গলায় দুই শ্রেণীর শব্দ-দ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে।

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। যথা, বড়-বড়, ছোট-ছোট, বাঁকাবাঁকা, নেচে-নেচে, গেয়ে-গেয়ে, হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাট্‌প্যাট, টাঁটাঁ, খিট্‌খিট্ ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ, গোঁ-গোঁ, চাঁচাঁ, চ্যাচ্যা, টুক্‌টুক্ পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংশ্রব পাওয়া যায়, যথা

ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি—যথা, ফ্যাস্‌ফ্যাস্, খ্যাকখ্যাক, স্যাঁৎস্যাঁৎ, ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্ত্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা, স্যাঁৎসেঁতে, ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎসেঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্ব্বে এ উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখ 'খেলা' এবং 'গেলা' (গলাধঃকরণ) ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্ত্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূল শব্দের ইকারের অপভ্রংশে বাঙ্গালার যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা—এই জন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল। যেমন মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা, ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচ্যা), সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা); চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, 'চ' অক্ষরের পূর্ব্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এই জন্যই চয়ের পূর্ব্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক্, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্ব্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে—যে সকল

অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্য রূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকরূপে যে সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে এ সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে।

যথা—

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে—	বিশেষ্য রূপে।
কিনিয়া।	কেনা।
বেচিয়া।	ব্যাচা।
মিলিয়া।	মেলা।
ঠেলিয়া।	ঠ্যালা।
লিখিয়া।	লেখা।
দেখিয়া।	দ্যাখা।
হেলিয়া।	হ্যালা।
গিলিয়া।	গেলা।

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এই জন্য আমাদের অঞ্চলে আকারের পূর্ব্ববর্ত্তী একার প্রায়ই "অ্যা" নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

এই উচ্চারণের নিয়ম সম্বন্ধে পাঠকদিগের যদি কোন বক্তব্য থাকে লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব।

তুমি।

সংসার তোমায় দিল অন্তিম বিদায়
তবু তুমি ঘুরে মর সংসার মায়ায়!
এত প্রেম, এত স্নেহ, প্রিয়জন-গেহ
নারিলে ভুলিতে; তাই ছাড়ি তব দেহ
আসিয়াছ জীবনের পরপার হ'তে।
ভালবাসো যারে, তার নয়নের পরে
স্বপ্নসম ঘিরে থাক, না দাও ধরিতে।
পরশের তরে যবে চিত্ত কেঁদে মরে
চোখে বহে নীর, প্রাণ চাহেগো মরিতে,
শূন্য হ'তে শুনি তব আশ্বাস-বচন।
তাই এ হৃদয়ে সদা আশা জেগে রয়,
তোমায় আমায় পুন হইবে মিলন;
যে প্রেমে চঞ্চল তুমি করিলে হৃদয়
সেই প্রেমে আরবার হব নিমগন।

বোম্বাই সমাজসংস্কার।

৮ই—

সেদিন এখানকার ইউনিয়ন্ ক্লবের অধিবেশনে আমাদের সবজজ চিন্তামণ রাও ভট বিবাহসংস্করণ বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। পুণায় পার্টি লইয়া কতক-দিন হইতে সংবাদপত্রে যে ভয়ানক তুফান বহিতেছে তাহা দেখিয়া এ দেশীয় সমাজসংস্কারকদের উপর আমার এমন অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে, তাহাদের বক্তৃতা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে, তথাপি নিমন্ত্রণের উপরোধ আর কৌতূহলও ছিল ভটজী কি বলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই:—সমাজসংস্কার সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমা-দের মতের মিল থাকিলেও কাজের বেলায় অগ্রসর হইতে সাহস করি না। এরূপ ধর্ম্মভীরুতা নিন্দনীয়। এই সকল ভীরুদিগকে যদি উভয় কূল রক্ষা করিয়া চলিবার কোন সদুপায় দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহাতেও লাভ আছে। তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটী বিষয়ের অবতারণা করিলেন।

বাল্যবিবাহ।

বিবাহে ব্যয়বাহুল্য।

এক বর্ণের ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ।

আমাদের মধ্যে বিবাহে অনেকে বিস্তর ব্যয় করিয়া পরিশেষে সন্তাপ কিনিয়া লন—এই প্রথা অতীব অনিষ্টকর। সকল কার্য্যেই আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করা কর্ত্তব্য। যে জাতিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক তাহাদের মধ্যে বরপক্ষীয়েরা অনেক হাঁকিয়া বসেন, কন্যাকর্ত্তাদের দায়ে পাইয়া পণ অঙ্গীকার করিতে

হয়। তা ছাড়াও অনেক গরীব লোক ধার কর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। ইহার প্রতিবিধান সহজসাধ্য। গুজরাত রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়, এদেশেও ইহার সূত্রপাত করা উচিত।

এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন বাধা হইতে পারে না। যাহাদের মধ্যে পরস্পর পান-ভোজনের নিয়ম আছে তাহাদের বিবাহে আদান প্রদান চলিবে না কেন? আমাদের দেশের হাওয়ার গুণে জাতিগত পার্থক্য আসিয়া পড়ে; যাহাতে জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক দেশহিতৈষী জনের লক্ষ্য যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা আবদার করিতে ছাড়ি না, কিন্তু সামাজিক ঐক্যবন্ধন সে উন্নতির প্রথম সোপান। যে সকল কারণে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য উৎপাদন করিতেছে তাহা সাধ্যমত পরিহার কর, আপনা হইতেই জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইবে। এক জাতির ভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের বাধা কি তাহার কোন সমীচীন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। গুজরাতে নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যাহারা সহরে বাস করে তাহারা পল্লীগ্রামস্থ নাগরদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া কন্যা দিতে নারাজ। আমাদের মধ্যে যেমন রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধ, এদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কতকটা সেইরূপ দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের তিনশ্রেণী—দেশস্থ, কোঙ্কনস্থ, কর্হাড়। তাহারা মূলে একজাতি কিন্তু বাসস্থানের পার্থক্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পরস্পর পানভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ নাই। এই পার্থক্য দূর হইয়া যাহাতে ঐক্যবন্ধন হয়

চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক নাই। অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা বড় এগোতে চান না। ভটজী ইহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন বাগ্দান হইয়া থাক্, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। তিনি নিজের পরিবারে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার বারো বৎসরের কন্যার একটী আঠার বৎসরের বালকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বালকটী নাগপুর কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে, কন্যা পুণা স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহাদের মধ্যে এক্ষণে কেবল বাক্-নিশ্চয় হইয়াছে, কতক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। এখন বিবাহ দিলে কন্যাটির লেখাপড়া বন্ধ হয়—তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক হয়—উল্লিখিত উপায়ে দু' দিক বজায় রহিল। কিন্তু এ উপায় কতদূর ফলোপধায়ী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাক্-নিশ্চয় কতদূর বন্ধনকারী? মনে কর বিবাহের আগে ভাবী বরের মৃত্যু হইল, তাহার ফল কি হইবে? মেয়ে বিধবা গণ্য হইবে অথবা পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার থাকিবে! বিবাহ না করিয়াই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা সামান্য কষ্টকর নহে। আমার মতে এরূপ অর্দ্ধ পদক্ষেপের কোন ফল নাই—একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়া ডিঙ্গান' আবশ্যক। কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে—সে বাধা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহই বল আর কোন সামাজিক কুপ্রথাই বল—তাহা নিবারণের প্রধান উপায় হচ্চে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, অল্পে অল্পে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উপায় একদেশব্যাপী ও নিষ্ফল।

চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক নাই। অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা বড় এগোতে চান না। ভটজী ইহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন বাগ্দান হইয়া থাকু, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। তিনি নিজের পরিবারে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার বারো বৎসরের কন্যার একটী আঠার বৎসরের বালকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বালকটী নাগপুর কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে, কন্যা পুণা স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহাদের মধ্যে এক্ষণে কেবল বাক্-নিশ্চয় হইয়াছে, কতক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। এখন বিবাহ দিলে কন্যাটির লেখাপড়া বন্ধ হয়—তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক হয়—উল্লিখিত উপায়ে দু' দিক বজায় রহিল। কিন্তু এ-উপায় কতদূর ফলোপধায়ী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাক্-নিশ্চয় কতদূর বন্ধনকারী? মনে কর বিবাহের আগে ভাবী বরের মৃত্যু হইল, তাহার ফল কি হইবে? মেয়ে বিধবা গণ্য হইবে অথবা পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার থাকিবে! বিবাহ না করিয়াই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা সামান্য কষ্টকর নহে। আমার মতে এরূপ অর্দ্ধ পদক্ষেপের কোন ফল নাই—একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়া ডিঙ্গান' আবশ্যক। কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে—সে বাধা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহই বল আর কোন সামাজিক কুপ্রথাই বল—তাহা নিবারণের প্রধান উপায় হচ্চে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, অল্পে অল্পে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উপায় একদেশব্যাপী ও নিষ্ফল।

চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক নাই। অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় তাঁহারা বড় এগোতে চান না। ভটজী ইহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন বাগ্দান হইয়া থাক্, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। তিনি নিজের পরিবারে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার বারো বৎসরের কন্যার একটী আঠার বৎসরের বালকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বালকটী নাগপুর কালেজে অধ্যয়ন করিতেছে, কন্যা পুণা স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাহাদের মধ্যে একণে কেবল বাক্ নিশ্চয় হইয়াছে, কতক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। এখন বিবাহে দিলে কন্যাটির লেখাপড়া বন্ধ হয়—তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক হয়—উল্লিখিত উপায়ে দু দিক বজায় রহিল। কিন্তু এ উপায় কতদূর ফলোপধায়ী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বাক্-নিশ্চয় কতদূর বন্ধনকারী? মনে কর বিবাহের আগে ভাবী বরের মৃত্যু হইল, তাহার ফল কি হইবে? মেয়ে বিধবা গণ্য হইবে অথবা পুনর্ব্বিবাহে তাহার অধিকার থাকিবে! বিবাহ না করিয়াই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করা সামান্য কষ্টকর নহে। আমার মতে এরূপ অর্দ্ধ পদক্ষেপের কোন ফল নাই—একেবারে লম্ফ প্রদান করিয়া বেড়া ডিঙ্গান আবশ্যক। কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে—সে বাধা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহই বল আর কোন সামাজিক কুপ্রথাই বল—তাহা নিবারণের প্রধান উপায় হচ্চে স্ত্রীশিক্ষা। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর, অল্পে অল্পে সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য উপায় একদেশব্যাপী ও নিষ্ফল।

এদেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধন বঙ্গদেশ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার এক কারণ এদেশে অবরোধপ্রথা নাই। এখানে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই—অন্তঃপুরও নাই। ইহা হইতেই বোধ হয় অবরোধপ্রথা আসল হিন্দু প্রথা নয়—যে সকল দেশ বহুদিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল সেই সকল দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। যে যাহা হউক অবরোধপ্রথা নাই বলিয়া এদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা বঙ্গনারীদের অপেক্ষা যে অধিক উন্নত তাহা বোধ হয় না। যদিও অন্তঃপুরবাসের কড়াকড় নিয়ম নাই তথাপি ভদ্র মেয়েরা সেই পিঞ্জরের পাখী—জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা কৈ ত এখানে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? আমি যতদূর দেখিতেছি এখানে পরদা ভাঙ্গা কিছুই দুষ্কর নহে—কেবল একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক। বোম্বাই পুণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক প্রসারিত দেখা যায়। এ দেশীয় রাজাদের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। গোণ্ডলের রাজা, বরদার গাইকওয়াড় সস্ত্রীক ইউরোপে গিয়া ইহার পথ অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল আর এখনই বা কি? এ বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন! আমরা নিজ নিজ পরিবারমধ্যেই কত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি—রাজা রাণীও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—ক্রমে সেই ঘুরা ঘুরা রাণীর জেনানাবদ্ধ পরিবারের মধ্যেও আলোক বাতাস প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিলাপ করেন তাঁহারা জানেন না স্ত্রীলোকের বিনয় লজ্জা স্বাভাবিক ভূষণ, অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নাই—ধর্ম্মরক্ষার জন্য অন্তঃপুর-জেলখানার আবশ্যক নাই—মুক্ত সংসারেই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মবোধ—

এদেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধন বঙ্গদেশ অপেক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার এক কারণ এদেশে অবরোধপ্রথা নাই। এখানে আমাদের দেশের মত অবগুণ্ঠনও নাই—অন্তঃপুরও নাই। ইহা হইতেই বোধ হয় অবরোধপ্রথা আসল হিন্দু প্রথা নয়—যে সকল দেশ বহুদিন মুসলমানদিগের অধীনে ছিল সেই সকল দেশে এই কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সে যাহা হউক অবরোধপ্রথা নাই বলিয়া এদেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা বঙ্গনারীদের অপেক্ষা যে অধিক উন্নত তা ত বোধ হয় না। যদিও অন্তঃপুরবাসের কড়াকড় নিয়ম নাই তথাপি ভদ্র মেয়েরা সেই পিঞ্জরের পাখী—জনসমাজে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা কৈ ত এখানে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? আমি যতদূর দেখিতেছি এখানে পরদা ভাঙ্গা কিছুই দুষ্কর নহে—কেবল একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক। বোম্বাই পুণা প্রভৃতি বড় বড় সহরে স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক প্রসারিত দেখা যায়। এ দেশীয় রাজাদের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। গোণ্ডলের রাজা, বরদার গাইকওয়াড় সস্ত্রীক ইউরোপে গিয়া ইহার পথ অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কি ছিল আর এখনই বা কি? এ বিষয়ে কত পরিবর্ত্তন! আমরা নিজ নিজ পরিবারমধ্যেই কত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতেছি—রাজা রাণীও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—ক্রমে সেই দুয়া সুয়া রাণীর জেনানাবদ্ধ পরিবারের মধ্যেও আলোক বাতাস প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিলাপ করেন তাঁহারা জানেন না স্ত্রীলোকের বিনয় লজ্জা স্বাভাবিক ভূষণ, অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন নাই—ধর্ম্মরক্ষার জন্য অন্তঃপুর-জেলখানার আবশ্যক নাই—মুক্ত সংসারই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মক্ষেত্র—

বিবাহ। কলে এই দাঁড়ায়, ৩৫১ জনের দুই স্ত্রী আর ১১৮ জনের দুয়ের অধিক স্ত্রী। এই ২৭৩ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৩৯ এর ৩ স্ত্রী—৩১এর ৪, ৮ জনের ৫, ৯ জনের ৬, ৫ জনের ৭, ৫ জনের ৮, ১ ১২, ১৩ করিয়া দুই দুই জনের বিবাহ। ৩ জনের ১৪, এক জনের ৩৮ একজন ১৫ বৎসরের বালকের দুই স্ত্রী। একজন ৩৫ বর্ষীয় যুবকের ৩৫ পত্নী বর্ত্তমান। কি ভয়ানক! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তালিকা প্রস্তুত করেন তাহাতে যে সকল বিবাহের উল্লেখ আছে তাহার পরে ইহার অধিকাংশ বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে বহুবিবাহ প্রথা নিতান্ত সতেজ। যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা কেবল কতকগুলি গ্রামের মধ্যে বদ্ধ, সমুদায় বঙ্গভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই অনিষ্টময় প্রথা কতদূর ব্যাপী তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। যাঁহারা হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিশোধিত দেখিতে চান তাঁহারা এই কুপ্রথা উন্মূলনে কায়মনে যত্নবান্ হউন।

লোক-চেনা।

শিরোলক্ষণ।

কোষ্ঠি ও প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া কি রূপে লোক চিনিতে হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। এক্ষণে, মস্তকের গঠন দেখিয়া কিরূপে চরিত্র নির্ণয় করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। আমাদের মনোবৃত্তি কতগুলি, তাহাদের কি

কি কার্য্য, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশে তাহাদের স্থান, ইত্যাদি তথ্যগুলি প্রথমতঃ মোটামুটি জানা আবশ্যক।

মনোবৃত্তির দুই প্রকাণ্ড বিভাগ—জ্ঞান ও ভাব। তন্মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হচ্চে কপাল—মস্তকের বাকি অংশ যাহা কেশে আবৃত তৎসমস্তই ভাবের স্থান। ভাব দুই ভাগে বিভক্ত;—নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। মস্তকের নিম্নপার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্থান। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিক্য হইলে কানের উপরে ও পশ্চাতে মাথার গঠন চওড়া ও ভরপুর দেখায়। যাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্ষীণতর তাহাদের ঐ অংশ অর্থাৎ মাথার দুই পার্শ্ব পাত্‌লা ও সংকীর্ণ। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপ্রবৃত্তি। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তি চারিটি;—ত্রৈপুরুষিক আসক্তি, বাৎসল্য, সখ্য, ও বাস্তুনিষ্ঠা অর্থাৎ নিজ বাসস্থানের উপর মায়া। গার্হস্থ্যপ্রবৃত্তির আধিক্য হইলে মাথার পিছন দিক্‌টা লম্বাটে ও ভরপুর দেখায়। এবং উহার লাঘব হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও বসা দেখায়। স্বার্থ-প্রবৃত্তি এইগুলি যথা;—(১) প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ বাধা অতিক্রমের ইচ্ছা—যুঝাযুঝি করিবার ইচ্ছা—সাহস; (২) জিঘাংসা অর্থাৎ ধ্বংশ করিবার—হানি করিবার ইচ্ছা—ক্রোধ; (৩) বুভুক্ষা অর্থাৎ আহারের ইচ্ছা; (৪) অর্জ্জন-স্পৃহা; (৫) জুগোপিষা অর্থাৎ মনের ভাব গোপন করিবার ইচ্ছা। মস্তকের পার্শ্বদেশে ও কানের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল প্রবৃত্তির স্থান। উহাদের আধিক্য হইলে মাথায় ঐ অংশ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার দেখায়—কিন্তু উহাদের স্বল্পতা হইলে ঐ অংশ চ্যাপ্‌টা ও সংকীর্ণ দেখায়। উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি তিনভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) উচ্চতর স্বার্থভাব (২) ধর্ম্মভাব ও (৩) বুদ্ধি-মিশ্র ভাব। উচ্চতর স্বার্থভাব এই গুলি যথা;—সাব-

মানতা, জ্ঞেয়াবধারণশক্তি, আত্মসংযম ও দৃঢ়তা—প্রধান তেরোটি শেষাংশ ও সেই শেষাংশের পার্শ্বদেশে এই সকল গুণের স্থান। মাথার তেরোর বাকি অংশে ধর্মভাবের স্থান। ধর্ম-ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরনির্ভর, আশা, বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া। মাথার তেরোর পরোভাগে এই সকল ধর্মভাবের স্থান—ধর্মভাবের আধিক্য হইলে ঐ অংশ দীর্ঘ ও উচ্চ হইয়া থাকে; এবং উহার অল্পতা হইলে ঐ অংশ নীচু হয় ও কপালের মাঝখানে হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। বাক্-শক্তি ভাব এইগুলি;—ভাষা, নির্ঘিংসা অর্থাৎ নির্ঘৃণ করিবার প্রবৃত্তি—হস্তনৈপুণ্য ইত্যাদি; ভাবুকতা বা সৌন্দর্যানুরাগ; অনুচিকীর্ষা অর্থাৎ অনুসরণ করিবার ইচ্ছা এবং জিগীষা অর্থাৎ হানপ্রিয়তা। ইহার কিয়দংশ কপালের পার্শ্বদেশে ও কিয়দংশ নাসমেকার মাথার তেরোর পার্শ্বদেশে অব-স্থিত।

এই সকল বৃত্তির আধিক্য হইলে মস্তকের ঐ অংশ চওড়া ও পরিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়—এবং উহাদের অল্পতা হইলে ঐ অংশ চাপটা ও সংকীর্ণ দেখায়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান এইগুলি যথা:—বস্তুবোধ, আকার-বোধ, পরিমাণ-বোধ, ভার-বোধ, বর্ণ-বোধ, শৃঙ্খলা-বোধ, কাল-বোধ ও স্থান-বোধ। এই সকল বৃত্তির দ্বারা জগতের সকল বিষয়ের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান আমাদের উপলব্ধি হয়। কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই সকল জ্ঞান দ্বারাই আমাদের সহায়তা করে। এই সমস্ত জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের নিম্নাংশ অর্থাৎ যেখানে ভুরু থাকে সেই স্থান বলিষ্ঠ-রূপ ও নিম্নাভিমুখী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ-

[illegible]—[illegible]তীত জ্ঞান এক শ্রেণীর জ্ঞান আছে যাহাকে পেশিক প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান এইগুলি;—ঘণা, ঘটনা-বোধ বা স্মৃতি, স্থান-বোধ, সুর-বোধ, ভাষা-জ্ঞান অর্থাৎ কথার দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জ্ঞানের আধিক্য হইলে কপালের মধ্যভাগ ফুলিয়া উঠে—এবং লক্ষ্য করিলে ঐ স্থান বসা-বসা দেখায়। বুদ্ধিবৃত্তি দুইভাগে বিভক্ত। যথা অনুধিভি অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ অনুমান করিবার শক্তি ও উপমিতি অর্থাৎ বিবিধ পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করিবার শক্তি। বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্য হইলে কপালের উপরাংশ উচ্চ, প্রশস্ত, ও খাড়িকমুখ হইয়া থাকে।

মাথার পশ্চাদ্ভাগে সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তলদেশে স্বার্থ-প্রবৃত্তির স্থান; মাথার তেলোদেশে ধর্ম্মবৃত্তির স্থান এবং কপালে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান। এই সকল বৃত্তির বিভিন্ন মাত্রা ও সংযোগফলে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়। যাহার মস্তকের পুরোভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ বড়, মোটামুটি বলিতে হইলে, জ্ঞান অপেক্ষা তাহার ভাবাংশ সমধিক প্রবল। যাহার মস্তকের তেলোদেশ অপেক্ষা তলদেশ ও পার্শ্বদেশ বড়, তাহার স্বার্থ প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল ও ধর্ম্মবৃত্তি হীনভাবাপন্ন। কার্য্যে তাহার খুব উদ্যম, উৎসাহ কিন্তু তাহা সৎপথে নিয়োজিত না হইতে পারে। ইহার বিপরীতে, যাহার মস্তকের তলদেশ অপেক্ষা তেলোদেশ বড়, তাহার ধর্ম্মভাব প্রবল কিন্তু কার্য্যে উদ্যম, উৎসাহ কম অর্থাৎ তাহার চালকবৃত্তি অপেক্ষা বাধকবৃত্তি প্রবল।

যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উভয়ই খুব প্রবল কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ততটা প্রবল নহে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বটে, কিন্তু সংগ্রামে সে অনেক সময়েই পরাভূত হয়; তাহার জীবনে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়; কখন মনে হইবে লোকটা বড়ই প্রবৃত্তির বশীভূত, কখন মনে হইবে বেশ ধর্ম্মিষ্ঠ; কিন্তু ঐ সঙ্গে যাহার বুদ্ধিবৃত্তিও বলবতী, তাহার জীবনে এরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। যাহার স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল অথচ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল, তাহার মানসিক শক্তিসমূহ কার্য্যকরী ও উদ্যমবিশিষ্ট হইলেও তাহার নৈতিক চরিত্র জঘন্য—তাহার সমস্ত বুদ্ধি উদ্যম কুপথে চালিত হয়।

যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা প্রত্যক্ষবৃত্তি অধিক প্রবল তাহার মনভাণ্ডার বিবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ—তাহার জ্ঞানস্পৃহা অতীব বলবতী—সহজেই সে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, খুটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার বিলক্ষণ থাকে—কাজকর্ম্মের ব্যবহারিক বুদ্ধি তাহার মানসিক প্রবল কিন্তু তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, গভীরতা, ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব। কাজকর্ম্মে বেশ দক্ষ কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে সে সহজে পারে না এবং যে সকল কার্য্যে বহুলতা ও জটিলতা আছে সে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানতা তাহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। লোকটা গুণী হইতে পারে, পণ্ডিত হইতে পারে কিন্তু কোন বিষয়ের গভীর চিন্তা তাহার দ্বারা হইয়া উঠে না—কোন বিষয়ের মূলতত্ত্ব সে ভাল বুঝিতে পারে না। যাহার কপালের নিম্নাংশ অপেক্ষা উর্দ্ধাংশ বড় অর্থাৎ যাহার প্রত্যক্ষবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল তাহার দর্শনশক্তি অপেক্ষা চিন্তাশক্তি বলবতী—

তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বের দিকে তাহার অধিক টান্। কোন বিষয়ের খুটি-নাটি দেখিতে তাহার ভাল লাগে না—সকল বিষয়ের মূলতত্ত্ব জানিয়াই সে সন্তুষ্ট; পদার্থের গুণাগুণ অপেক্ষা পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাহার অধিক অনুরাগ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপেক্ষা যে-রকম বিজ্ঞান বিশ্লেষণ ও প্রমাণ সাপেক্ষ তাহারই অনুশীলনে তাহার অধিক প্রীতি। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি উভয়ই বলবতী এবং দৈহিক প্রকৃতিও সতেজ তাহার বিষয়গামিনী চৌকোষ বুদ্ধি এবং তাহার মন ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েই সমলঙ্কৃত। যাহার মাথার চারিদিক বেশ সমান, যাহার সকল বৃত্তিই সমান পরিপুষ্ট, তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব বড় উপলব্ধি হয় না—তাহার কোন বিষয়ে আধিক্যও নাই ন্যূনতাও নাই; সে বেশ একরকম কাজ কর্ম্ম চালাইতে পারে; বেশও চারিদিককার অবস্থা অনুসারে তাহার চরিত্র গঠিত হয় এবং সে নিঃশব্দে ও শান্তভাবে জীবন-পথ অতিবাহিত করে; কিন্তু যদি ঐ সঙ্গে তাহার মস্তিষ্ক বৃহদায়তন ও সক্রিয় হয় এবং অবস্থাও যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখ হয়—সকল বিষয়েই সে যথেষ্ট লাভ করিতে পারে। যাহার মাথার সবদিক সমান নহে—কোন দিক বেশি, কোন দিক কম তাহার চরিত্রের খুব বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। যাহার আত্মসম্ভ্রম প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি প্রবলতর এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল নহে, তাহার চরিত্রে সম্ভ্রান্ত ভাব, পুরুষোচিত আত্ম-নির্ভর, উদারতা, উন্নত মহৎভাবের প্রকাশ দেখা যায়—সকল প্রকার নীচতা, ইতরামি, তাহার নিকট অতীব হেয়। কিন্তু এইরূপ প্রবল আত্মসম্ভ্রমের সহিত যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির লাঘব হয় এবং স্বার্থ প্রবৃত্তির অধিক্য থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তির

চরিত্রে অহংকার, উদ্ধতভাব, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অনধিকার চর্চ্চা প্রভৃতি অপ্রীতিকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রবল বৃত্তিগুলি অপ্রবল বৃত্তির উপর আধিপত্য করে—চরিত্রের নেতারূপে অবস্থিতি করে। যথা;—যাহার জিঘাংসা প্রতিবিধিৎসা সমধিক, এবং তাহার সঙ্গে আত্মসম্ভ্রমও প্রবল, সে অপমানিত হইলে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে, নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইবে—অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে ইত্যাদি; কিন্তু তাহার যদি আত্মসম্ভ্রম প্রবল না হয় এবং দয়া ও কর্ত্তব্য-পরতা প্রবল হয় তাহা হইলে সে নিজের জন্য প্রতিশোধ লইতে বিরত হইবে—কিন্তু পরের স্বার্থরক্ষার্থ, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সে বদ্ধপরিকর হইবে। এইরূপ বিবিধ বৃত্তির প্রবলতা ও অপ্রবলতা হইতে চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

স্বরলিপি।

(শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত)

হিন্দুস্থানী গান।

গৌর সারঙ্গ—তাল কাওয়ালী।

সজনি, মন-মোহন মুরলী মনমোহে,
স্থলিয়া রহে না শকতু পলছন রে।
চলরি সখিয়া, বিতি যাতি রাতিয়া,
যাওয়ে বোহি ননদিয়া মোরা,
বলহর গিহ্ যোয়া চোরা রে।

৭

।০।১২´৩।

১ ২
। । মা গা ধা পা। মা গা মা রসা। সা সা গা ধা।
ষ ' ক নি, ম ন। মো হ ন, মু। র লী, ' ন।

৩ ১
। ধ ধ -। পা। মা গা মা -। মা মা গা রা।
। মো হে -- ধ। ক নি য়া --। ব হে না, শ।

১ ২
। মা গা প' গা। পা মা ধা পা॥ পা ধা পা সা।
। ক ন্থ, ' ল। ভ ম, রে ধ॥ চ ল রি, ম।

সা সা সা সা। ধা -না র্সা র্সা। র্সা না ধা পা।
। খি ম, বি ভি। ঘ -- ঙ্গি, রা। তি মা, আও মে।

। পা -। -। ধা। পা গা গা মা। রা -গা -রগা -মা।
। মো -- হি। ম ন দি য়া। মো -- -- --।

। পা -। শ -। সা সা গা রা। মা গা পা গা।
। রা -- -- -। ম ন হ র। কি ন্থ, মো রা।

। পা না ধা পা॥
। মো র্ রে, ' ॥

(যাত্রার খেলা হইতে)

ঝিঁঝিট ভূপালী—যৎ একতালা।

আমি, যাহে গেলে বেলা,
সহ হাসিখেলা,
তাকে আর ডাক কেন?

আকুল তিয়াষ,
প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে তার হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হতাশে মধুর দহন
নিত নব অনুরাগে।
তরল কোমল
নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে
নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিঃশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা-নিরাশায় পরাণ টুটিবে
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম অরুণ রাগে॥

৩৩

॥
সসা ॥ সগা -া মা। গা ` গা গা । গমা পমপা মগমা।
সখি ॥ বহে,— গে। ল, বে লা । শুধু, — হা ।

। গা ` মং গমগা। গরা রা রা। -া ` রা। রা। গা -মগমপা।
। সি, সে লা । এ কি আ। ব, ভাব। লা — — ।

। মগা রগাঃ -রসনঃ। সা গা রা। গমপা -মপমঃ গঃগা।
। গে, সখি — । ব হে গো ল — — বেলা।

। গা মপা পা। পক্ষা পা পমগা। গপা -া পা।
। আ কু ল। ভি য়া ন। প্রেমে — ন্ত।

। ঋা গধনা নধপা। পা ধা গধঞা। ঞধা পক্ষা পমগা।
। পি য়া স। প্রাণে, কে। ন, না হি।

। গঃমগঃ -রা -গমপা। মগা রা গরা॥ পা গপা পা।
। আ — — । গে, স খি॥ ক বে, আ।

। ক্ষপধা ধপা ধা। ধর্সা -া নর্সর্রা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা নর্সনা।
। ম, হ বে। থাকি—তে। জী ব ন্। আঁ খি তে।

। ধা ধনা পা। ধা ধনর্সা র্সনা। ধনঃধঃ ক্ষপধা -পঃক্ষপঃ।
। আঁ খি তে। ম দি র। নি ল ন্।

। গপা পা পা। পক্ষা পা পক্ষপা। গা পা পা। ধা গধনা -নধপা।
। ম ধু র। ল তা শে মে ধু র। দ হ ন।

। পা ধা ধঞা। ধঞধা পক্ষা পমা। গঃমগঃ -রা -গমপা।
। নি ত, ন। ব, অ নু। রা — —।

। মগা রা গরা॥ ধা রা রা। রা গা গমা।
। গে, স খি॥ তে র ল। বো ম ল।

। রা গা গমপা। মপমা পা -া। গপা পা পা।
। ন য় নে। র জ ল্। ন য় নে।

। ধা পধনা নধা। পা -া -মপধপা। (মগা রা গরা)।
। উ ঠি বে। তা — — । (নি স খি)।

। সগা ধা রা। গমা পা পা। পা -। পধপা। গা পা গা।
। সি ন খি। তে, বি পা ৩, নী রে । নি হে, যা

। মা পধনা নধা। পা মা গজ্ঞমা। পধা ক্ষপধা পঞ্চগ।
। বে, ধী রে। প্র খ র। ত প ন।

। গমা-মা-গমপা। মগা মা গরা। পা গা পপা। পা পা-ধা।
হা -- --। নি ন খি। ই দা ন। নিঃ শা ন।

। পা র্সা নর্সর্রা। র্রর্সা র্সা র্সা। নর্সা র্সা না। ধা-ধঃধধঃ-পা।
। আ কু লি। উ ঠি বে। আ শা, নি রা শা য়।

। পা ধনর্সা র্সনা। ধনা ধপা পঞ্চপা। গপা পা পা।
। প রা ণ। টু টি বে। ম র মে।

। না পা পধপা। ঞ্চা পা পা। মা পধনা নধা। পা ধা-ঞ্চধা।
। র, আ লো। ক পো লে। ঘু চি বে। স ব না

। পঞ্চা পঞ্চধা পপা। গমগা -রা গমপা। মধা মা গরা।
। অ ন্ধ ন। রা — —। কে, স খি।

ব্যাখ্যা।

(১) বিসর্গ ঃ অর্দ্ধমাত্রায় চিহ্ন।

(২) { } = পুনরাবৃত্তির চিহ্ন।

( ) = পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিবার চিহ্ন।

(৩) পার্শ্ববর্ত্তী যুগল ছেদ স্থায়ীভে ফিরিবার চিহ্ন ; দ্বিরো-দেশস্থ যুগল ছেদ স্থায়ীভে ফিরিয়া আসিবার চিহ্ন।

আমাদের পুতুলের বিয়ে।

আফিমের ঘোরে সারা রাতটা ঝিমাইয়া ভোরের দিকে একটু গাঢ় নিদ্রা হয়। বুড়া বয়সে আফিম ধরিয়া শরীরের কিছু উপকার হোক্ আর না হোক্—বহুকালের অভ্যাস প্রাতে শয্যাত্যাগ আর এখন নাই। বেলা আটটার সময় প্রখর সূর্য্যের আলোকে এখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। আজ সবেমাত্র নিদ্রাটা একটু গাঢ় হইয়াছে, এমন সময় সহসা আনন্দ-কোলাহলে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম ভৈরবী রাগিণীতে বাঁশীও বাজিতেছে। বহুকাল পরে আজ প্রভাত দেখিলাম, বাঁশী শুনিয়া বহুকালের একটী স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। সেই একদিন এমনি প্রভাতে, এমনি বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিয়া আমার পাশে যে একখানি ঘুমন্ত আধ-ঘোমটা-দেওয়া কচি মুখ দেখিয়াছিলাম, সেই মুখখানি মনে পড়িল। সহসা নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যময় ভাবে তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব আকাশের দিকে চাহিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমাদেরই বাটী হইতে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। আমারই নাতিনাতিনীর হাস্যধ্বনিতে, আমার মত পাড়ার লোকও জাগিতেছে। কিন্তু কিসের এত হাসি? কই আমাদের বাড়িতে তো আজকালের মধ্যে বিবাহ-উৎসব অথবা কোন মঙ্গলকার্য্য উপস্থিত নাই। আমার পুত্রকন্যাগুলির তো সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর হইল সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিয়া, আমি ইহকালের কায হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই অজানিত প্রবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যদিও আমি নির্লিপ্ত থাকিতে চাহি বটে, কিন্তু

আমার সন্তানেরা তবুও আমাকে না জানাইয়া তো কোন কাজ করে না। আমার জ্যেষ্ঠা কৌত্রীটি সবে আট বৎসরের, তাহার বিবাহের এখনো বিলম্ব আছে। তাহার বিবাহের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না—ততদিনে আমার ডাক পড়িবে—অথবা কি জানি? সকলি সেই মহামায়ার ইচ্ছা!—তবে আমার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। এখানে আমার থাকার কোন আবশ্যকও নাই। যাহাদের সংসারে আনিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াছি—তবে হে মা প্রকৃতি, আর এ অকর্ম্ম জীবনে তোমার আবশ্যক কি?

কতবৎসর পরে আজ অরুণোদয় দেখিলাম—সেই পুরাতন আজন্মপরিচিত লাল গোলাকার সূর্য্য সহসা দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশী বাজিতেছে, সেই বালকবালিকার পরিচিত হাস্যধ্বনি—এ সমস্ত ছাড়িয়া কি অনিশ্চিত, অপরিচিত অজানিত স্থানে যাইতে যথার্থই আমি ব্যগ্র হইয়াছি—না নিশ্চয় যাইতে হইবে এবং দিনও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া মনকে প্রস্তুত করিতেছি?

"আরও কত ঘুমোবে—দাদামশায় ওঠো না—এমন ঘুমও তো কখনো দেখি নাই বাপু—এত গোলমালেও তোমার ঘুম ভাঙলো না!" "দাদামশায় শিগ্‌গির ওঠো শিগ্‌গির ওঠো।" "আপনারা চেঁচামিচি করচিস্ কর্, বাবাকে কেন এত সকালে জ্বালাতন করতে যাচ্ছিস্!" দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকারা আমার খাটের চারিপাশে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পরে আমার কন্যাপুত্রেরা, তৎপরে বারান্দায় পুত্রেরাও উপস্থিত দেখিলাম। সকলেই উৎসাহপ্রফুল্লমুখে

আলাকে আনন্দের সংবাদ জানাইতে ব্যগ্র। আমি উঠিয়া বসিতেই সর্ব্বকনিষ্ঠ খোকা বলিল "দাদামহায় আদ্ আমাদেল্ পুতুলেল্ বিয়ে।" তাড়াতাড়ি মধ্যমা গৌরী বলা কহিল, "দাদামশায়, দাদামশায়, আজ দিদির মেয়ের বিয়ে।"

খোকা। দাদামহায় ছুত্তির বিয়ে নয়, দিদির পুতুলেল্ বিয়ে।

তখন অষ্টমবর্ষীয়া দিদি আমার গলা ধরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ দাদামশায়, আজ বাড়িতে কায, আর তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছো?"

আমি। ওরে বুড়ি আমার অপরাধ হোয়েছে তা মানলুম, কিন্তু কিসের কায তা তো আমি এখনো কিছু জানতেই পারি নি—ব্যাপারখানা কি রে?

দেখিলাম দরজার পাশ হইতে ঘোমটা-দেওয়া হাস্যমাখা মুখে, শঙ্খহস্তে বধূমাতা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন—মঙ্গলখানা, আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই তিনি একবার শাঁখটা বাজান্। তখন ঘম্‌ঘম্ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা "বাবা তোমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন এসেছি গো" বলিয়া এক প্রণাম করিল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কোপকটাক্ষে নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এত বল্লুম বাবাকে এত সকালে জাগাস্‌নে—তা কেউ শুন্‌লে না—আগেভাগে বাবাকে জ্বালাতন করতে এসেছে। শোন না বাবা! নলির মেয়ের বিয়ের গল্পটা শোন না।"

আমি। শুন্‌ছি বই কি, সব শুনছি—তা কাল তো কিছু বলি নাই, আজ হঠাৎ এত সকালে, এত মোগাড় হোল কখন্ বে নন্দি?

নন্দি। ও দাদামশায়, এসব পরামর্শ অনেকদিন থেকে

হোচ্ছে—কাল বাবাকে জেদ করে' বল্লুম যে আজ আমার সেতোর বিয়ে হবেই হবে, তাই আজ হোল। পিসিমা, কাকিমা, কাল রাত্রে সবাই এসেছেন—আজ সকালে তোমাকে জব্দ কোরবো, তোমাকে একেবারে চোমকে দেবো বলে' কাল দাদা আর কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বালা। দাদামশায়, বাবা বল্লেন—এত করছিস্ তবে একটা বাজনা আনা, সকালে বেশ মজা হবে—বাবা ভাববেন আমাদের বাড়ি আবার কার বিয়ে। পিসিমারা জোর করে' তোমায় বল্তে দিলে না—নইলে আমি কালই সব তোমায় বলে' দিতুম।

বিনয়। দাদামশায় কেমন বাসর সাজান' হোয়েছে দেখ্তে চল—দেখ্লে তোমার আবার বিয়ে করতে সাধ হবে।

আমি। তা বেশ তো ভাই, একলা পড়ে থাকি, অমনি নলির মেয়ের বিয়ের খরচে, আমারও একটী হোয়ে যাক্ না। আর কনেরও তো ভাবনা নেই—এমন সুন্দর নলি আছে—তাই তবে হোক্—কি বলগো মা জননি, জামাই করবে কি ?

আমার বাক্যের উত্তরস্বরূপে বধূমাতা সজোরে তিনবার শঙ্খধ্বনি করিলেন। "তা চল্ সব বারান্দায় চল্—তামাক খেতে খেতে, তোদের মেয়ের কোথায় বিয়ে হোল কি বৃত্তান্ত, সব শুনি।" তখন কাহাকেও কোলে লইয়া, কাহারও হাত ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। জোরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—বাজনদারেরা জয় হোক্ বলিয়া, মাথা নাড়িয়া মহা উৎসাহে ঢোল বাজাইতে লাগিল।

বিনয় বড় ব্যস্ত—সে তাহার ছোটকাকাকে বলিল—"চল কাকা আমরা সভা সাজাইগে, এখানে মিছিমিছি থেকে কি হবে—আমাদের হাতে এখনো কত কায—আলো সব ঠিক

করতে হবে—মালা টাঙ্গাতে হবে, চল আমরা যাই।" তাহারা চলিয়া গেল।

নলি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে—মেয়ের বিয়ের আনন্দ তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—সে আনন্দের ভাগী দাদামশায়কে না করিলে তার আর সোয়াস্তি নাই—এ বৃদ্ধ কাহাকেও উচ্ছ্বসিত করিতে পারুক না পারুক, কাহারও মুখে হাসি ফোটাইতে পারুক না পারুক, এখনো ঐ নলক-পরা কোঁকড়া-চুলে-ঘেরা ক্ষুদ্র মুখের ঈষৎ হাসিতে আপনি হাসিতে পারে। ঐ মুখখানি দেখিলেই জানিতে পারি যে এখনো আমি বাঁচিয়া আছি—আমি যে একটা জড়-পদার্থ নহি—আমাতেও যে এখনো মানুষের সুখদুঃখের রেশ আছে, তাহা কেবল ঐ দুটো বড় বড় চোখ দেখিলেই অনুভব করিতে পারি। এই বৃদ্ধের জড়-ভাব পাছে বৎসদের আমোদ-উচ্ছ্বাস উৎসাহ ও চঞ্চলতায় ব্যাঘাত করে তাই আমার একটু ভাবনা হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম, আমিও হাসিয়া হাসিয়া গান ধরিলাম

এত ফুল কে ফোটালে!
হাসি-তরঙ্গ, মরি, কে ওঠালে!

নলির গলা ধরিয়া যখন এই গান গাহিতেছিলাম তখন দেখিলাম জয়ন্ত ছলছল নেত্রে নলির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—মুখ ঈষৎ ম্লান। গান সমাপনান্তে মেয়ের বর-বর কেমন হইল নলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন নলি মুখখানা ভারি গম্ভীর করিয়া বলিল "সে কথা আর কি বলিব দাদামশায়, মেয়ের কি বিয়ে হয়—যে কাল পড়েছে—ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হোয়ে যাচ্ছিল—তা দাদামশায় কত খুঁজে খুঁজে সইএর ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছি। সইএর ছেলেটী এম এ পড়ছে। তা দাদামশায়

পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর এই মেয়েকে দুশো ভরি সোণা, খাট বিছানা, রূপোর বাসনসামগ্রী, ফুলশয্যায় সোণার সেকার্ব গেলাস দিতে হবে। সই বলে ত্রে, আমার চার পাঁচ কন্যা ছেলে, আমি কি অত অল্প টাকায় রাজী হতুম, তবে তোমার সঙ্গে ছেলে-বেলা থেকে সই পাতান্ত্র—আর মেয়েটীও সুন্দর, জানা ঘর, তাই করলুম! তুমি আমার ছেলেকে নিয়ে আদর যত্ন করবে আর মেয়েকে দেওয়া তো একবারে দিলেই ফুরোয় না পাঁচবারে তখন পাঁচরকম করে দিও। সইও গায়ে হলুদ ভাল করে দেবে। মেয়েকে জড়োয়া গহনা পাঠাবে পাঁচজন এয়োর পাঁচটা রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দেবে। তা আমাদের আবার ফুলশয্যাতে রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দিতে হবে। বাপ্‌রে! সেকালে বাপু এত ছিল না—দিন দিনই ফন্দি বাড়ছে। না জানি আরও কত হবে।"

বালা পাশে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দিদির কথার উপর কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু দিদির একটানা স্রোতে সে থই পায় নাই—দিদি থামিবামাত্রই "শোন দাদামহাশয় ওদের মিছিমিছি টাকা—পাই পয়সায় পারা মাধিরে টাকা করেছে। আর পুঁথির গয়নাকে জড়োয়া বল্‌ছে।"

নলি হাসিয়া বলিল, "তা দাদামশায় এ ত আর সত্যিয় বিয়ে নয়—তবু দাদামশায় আমি সত্যিকার রূপোর দান নেব, তবে সত্যিকার সব নেমন্তন্ন হবে—সত্যিকার লুচিটুচি সব তো হচ্ছে, কেমন দাদামশায়?"

জয়ন্ত। বাবা দেখেছ নলি আমাদের আজকাল বিয়ের পদ্ধতি, লেনাদেনা কেমন মাথার ভিতর ঠিক করে' নিয়েছে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে ও কি করে' কথাগুলো ঠিক ঠিক বলেছে, ও কোথায় এত শুনলে!

বাস্তবিক আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। নলি-জন্য বালিকা হইতে কতকটা বুদ্ধিমতী ও অনুকরণক্ষম তা আমি জানিতাম। কিন্তু ও যে এত সংগ্রহ করিতে পারে তা জানিতাম না। "কেমনরে নলি তুই এত বিয়ের কথা জানলি কেমন করে রে।"

"কেন দাদামহাশয় বৈশাখ মাসে যখন দিদির বিয়ে হোল তখন যে বড়পিসিমা তোমাকে কত কথা বল্লেন ?"

আমার মনে পড়িল সত্য সম্প্রতি আমার দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বটে। এমন সময় ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ বড়পিসিমা এসেছে, ঐ দিদি এল, বৌনা এল, পুঁটী এল, কলরব পড়ে'গেল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অভয়া আসিয়াই "হ্যাঁরে জয়, টাকা রাখতে বুঝি জায়গা পাসনি তাই মিছিমিছি গুচ্ছির টাকা খরচ করতে বসেছিস্। এতই যদি সাধ তো দেখ্, মেয়ের বে দে না, হলোও তো সাত আট বৎসরের, তোর বিয়ের সাধও মিটুক আর একটা কাজও হোক্—মিছিমিছি এত টাকা নষ্ট—আজও তোর ছেলেবুদ্ধি গেল না—যেমন তুই তেমনি বৌও উড়নচণ্ডি হোয়েছে।"

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন দিদি বেশ তো হোচ্ছে, এ মাসে কি আর আমাকে পাঠাতো—ভাগ্যি নলির মেয়ের বিয়ে হোল তাই তো আসতে পেলুম। বৌ কেমন ঠিক সত্যিকার মতন বরণডালা সাজিয়েছে কেমন সব গোছগাছ করেছে—ওবাড়ির সব আসরে কেমন আমোদ হ'চ্ছে—দিদির সবতাতেই বকুনি।

অভয়া। না তা বক্‌বো কেন, তোরা পয়সাগুলো খোলাকুচি করে' ওড়াবি আমি চুপ করে' থাক্‌বো।

অন্য। দিদি যেমন করে' হোক্ আমোদ হোলেই হোল। দিদি খুকুলের বিয়েতে ভাবনা কিছু নেই—খাটি কেবল আমোদ টুকু পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু আজ যদি নলির বিয়ে হোত দিদি তা হোলে কি এত হাসি হাসতে পারতুম—তাহোত আমোদ কোথায় ভাই—মনে ক'রে দেখ দিখি দিদি এত আদরের আমাদের নলি কার হাতে দিচ্ছি তা আমরা কিছুই জানতে পারবো না—তাই শুধুদুঃখে নলির সুখদুঃখু, তার পরে আরও কত ভাবনা—দেখ এই এখন আমরা সবাই আছি—নলির বিয়ের সময় যে সকলেই এমনি একত্রে আমোদ ক'রতে পারবো তারি বা ঠিক কি—কার কখন ডাক পড়বে দিদি তা তো আর আমরা জানিনে আর আমাদের হাতও নয়।

সভদ্রা। যা যা গিছে বকিস্‌নে—তোর সব কথাতেই পোড়া কথা আসে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তা দিদি সত্যিই আমরা তো আর আকেলের ডাল মুড়ি দিয়ে আসি নি—মরতে তো সবাইকেই হবে—তার কেউ আগে কেউ পরে—তাও আর পোড়া কথা কি।

আমি। ওরে বাছা আজ নলির মেয়ের বিয়ে, আজ কি অমন অমঙ্গলের কথা বল্‌তে আছে—ওরে বাজনা বাজাতে বল্ না—বাজনা বুঝি চুপ করে' থাকতে এসেছে।

বাজনা বাজিয়া উঠিল—নলির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বেচারী বাবা পিসিমার গম্ভীর তর্কবিতর্ক শুনিয়া ম্লানমুখে একবার ওর মুখ একবার ওর মুখ চাহিতেছিল।

অভয়া। মা, আমার জামাইষষ্ঠীতে নেমন্তন্ন ক'রেছিস্ তো, আর জামাইটিকেও আনতে পাঠাও, সে ছেলেমানুষ আমোদ আহ্লাদ করবে।

জয়। আ দিদি তা জামাই আমার বইকি, ছেলেরা কতদিন ধরে পড়ুলের বিয়ে বিয়ে করছে, তুই আর শুনতে পাস্ নি, বলে আমাই হবে—তাই তো এতদিন কাউকে বলা হয় নি।

অতসী। তা ভাই জামাইবাড়ি থাকতে পাঠাও, মতন পড়ুয়া ভাল করে ঘর করতে হবে। তা হোলে আমি মলির মেয়ের বিয়ের আহ্লাদে জামাইটি দেখতে পাব।

সরমমঙ্গলা। আঃ এতক্ষণে দিদির মুখে হাসি দেখা গেল—জামাই জামাই করেই দিদি মায়া হরে গেল—পরের ছেলেকে অত স্নেহ কি?

অতসী। ওর তোর স্থল হবে তখন বুঝবি। এখনো মেয়ে খানি তার জামাই।

সর্ব্বমঙ্গলা। আমার মেয়ের আমি বিয়ে দেবই না—মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ঘরে ছেলের মত রাখবো।—বাবা! মেয়ের বিয়ে দিতে যে খোসামোদ করতে হয়—আমি তা পারবো না।

অতসী। তা হঁল আমিও অমন এককালে কত কি বলতুম ছোট বয়সে যাই হউক কাজের সময় এস—তখন দে-কে-দেই।

সরোজ। দিদি, মলি কেমন গিন্নিপনা করে বাবাকে বিয়ের সব খবর দিলে যদি শুনতে তো অবাক হোতে! সমতামরীর বিয়ের সময় আমরা সব কথাবার্ত্তা কইলুম, সেই সব শুনে কেমন শুছিয়ে মনে রেখেছে।

"সে কিরে, আমরা তো কই কখনো দেখি নি যে মলি আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে! ওর বড় বুদ্ধি—বেঁচে থাকেন তো বার ঘরে যাবেন তার ঘর উজ্জ্বল হবে।"

"দিদি এই চন্দ্র বৌদিদি ভাল্লুকের—কেমন কালো মুখখানা

সাজান হোয়েছে, দেখ্‌বে এস। চল নলি, বাবাকে সব শুদ্ধ আমরা নেথাই।"

আমি। তোর সব মা, মুখটুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নেমে আয়—আমিও আফিনটা খেয়ে গায়ে বল করে' নিই। আজ বড় খাটুনি মাথার উপর।

"ওগো কনের দাদা, আজ দু'দের দুধে হবে না—আজ দু'হাঁড়িতে ক্ষীর চাই।"

"তা বাবা আমায় বলা কেন—কনের মা ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বল।"

"হাঁ হাঁ ওঁর কাছে দু'হাঁড়ীতে হবে না—ওঁর কাছে, পাঁচ হাঁড়ী।"

নলি। বল কি দাদামশায় তা হ'লে কেমন করে' কুলোবে, বাবা যে সবেমাত্র আট হাঁড়ি দই ক্ষীর ফরমাস্ দেন নি—তা হ'লে কেমন করে' হবে দাদামশায়—তুমি আর একদিন বেশি করে' খেও; আজ দাদামশায় বেশি খেও না।

জয়ন্ত। এইবার নলি জব্দ হোয়েছে, মা তোর আর ভাবতে হবে না—যাতে কুলোয় তাই হবে এখন। * * *

মহা সমারোহ। জামাই, নাতজামাই ভ্রাতৃবধূ সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিলেন, সকলেরই হাসিমুখ সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। বরণের সময় বধূমাতা নলির পাশে আমাকে দাঁড় করাইয়া আমাদের দুই জনকে বরণ করিলেন। কন্যাসম্প্রদানের সময় আমার দৌহিত্রী অমরাবতী আমাকে কন্যার পিতাস্বরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইল—কারণ নলির মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়ের বাপের সম্পর্ক ত আর

তাহে বড় হাসি। দেখিলাম জয়ন্ত হাসিয়া হাসিয়া বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে—নানারূপ হাস্যপরিহাসও চলিতেছে। বাসর-ঘরে গানবাজনাও হইতেছে—বিনয় দু'একটী গান জানে।

অনেক রাত্রে উৎসব শেষ হইলে আলোগুলি একে একে নিভিয়া আসিল, জনকোলাহল ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, আমিও শ্রান্তভাবে বিছানায় পড়িলাম—আমাকে যে কাজ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে—আমাকে যে আগ্রহ দেখাইতে হইয়াছিল, আমাকে যে হাস্যপরিহাস করিতে হইয়াছিল, আমাকে যে নিয়মিতাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছিল—তাহাতেই আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি প্রতিদিন এক নিয়মেই কাটাই। নিয়মিত স্নানাহারের পর নলিন হাতে মাথাটী সমর্পণ করিয়া দুপুরবেলা একটু নিদ্রা দিই। বৈকালে উঠানে ছেলেরা খেলা করে, চাহিয়া চাহিয়া দেখি—সন্ধ্যায় তাহারা ক খ গ ঘ পড়ে, নানারূপ ঝগড়াঝাঁটি করে; পাশের ঘর হইতে তাহা শুনি—পুত্রেরা আসিয়া দেশের সংবাদ কহেন তাহার দু'একটী উত্তর প্রত্যুত্তর করি। রাত্রে বধূমাতারা যখন তাঁহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া আহার করাইতে আসেন তখন তাঁহাদের খবরাখবর লই ও তাঁহাদের পিতামাতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্তানসন্ততিদের লইয়া কিঞ্চিৎ রহস্যালাপ করিতে করিতে আহার শেষ করিয়া প্রশান্তচিত্তে ঘুমাইতে যাই। ইহার অধিক মনের উচ্ছ্বাস বা শরীরের বল আমার নাই।—ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক আজ যদি নলিনীর বিবাহ হইত তো কত ভাবনা হইত। মনে আছে নিজের এক একটী

মেয়ের বিবাহ দিতাম তার তাহার পূর্ব্বে ও পরে কত ভাবনা হইত। এক্ষণে মন জড় হইয়া গিয়াছে এবং হাতে ক্ষমতা না থাকিলে মনের সকল ভাবই শমিত হইয়া আসে তাই আর সে সকল ভাবনা তত তীব্রভাবে নাই। হায়, আমার যখন কন্যা যখন স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ম্লানমুখে বেড়াইত তখন আমার কি করিতে না ইচ্ছা করিত? যত ভালবাসা দিলে সেই মুখে হাসি ফুটে আমি তাহাকে যে সকলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পিতার স্নেহে যে সে ম্লানমুখে হাসি ফুটিবার যো নাই। সে যে ক্রমে প্রস্তরবৎ হইয়া আসিল—আমি দেখিলাম আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। মাগো মহামায়া যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন মা! বুড়া হইয়া মরিতে চলিলাম তবু তোর রহস্য বুঝিতে পারিলাম না!

পরদিন দুপুর বেলা পাকাচুল তোলাইবার সময় নলির খোঁজ করিলাম—বালা আসিয়া বলিল "দিদির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে তাই দিদি কাঁদছে,দিদি আসবে না।" শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না—নলির চক্ষে জল পড়িতেছে হায় কেন!—গিয়া দেখিলাম নলি কাঁদিতেছে—জয়ন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বুঝাইতেছে "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি আছে—পুতুলের জন্য এত কান্না! তোমার অত পুতুল আছে একটা গেলই বা, অমনি পুতুল আবার হবে।"

কিন্তু নলির চক্ষের জল থামে না। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে, তাই কাঁদছিস্ নলি?" সে মুখ ফুলাইয়া কহিল 'হুঁ'। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রিজাগরণে কাতরা নলি ঘুমাইয়া পড়িল। উৎসব-কোলাহলান্তে বাটী নিস্তব্ধ হইয়াছে—সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

মেয়ের বিবাহ দিতাম তার তাহার পূর্ব্বে ও পরে কত ভাবনা হইত। এক্ষণে মন জড় হইয়া গিয়াছে এবং হাতে ক্ষমতা না থাকিলে মনের সকল ভাবই শমিত হইয়া আসে তাই আর সে সকল ভাবনা তত তীব্রভাবে নাই। হায়, আমার মধ্যমা কন্যা যখন স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ম্লানমুখে বেড়াইত তখন আমার কি করিতে না ইচ্ছা করিত? যত ভালবাসা দিলে সেই মুখে হাসি ফুটে আমি তাহাকে যে সকলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পিতার স্নেহে যে সে ম্লানমুখে হাসি ফুটিবার সো নাই। সে যে ক্রমে প্রস্তরবৎ হইয়া আসিল—আমি দেখিলাম আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। মাগো মহামায়া যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন মা! বুড়া হইয়া মরিতে চলিলাম তবু তোর রহস্য বুঝিতে পারিলাম না!

পরদিন দুপুর বেলা পাকাচুল তোলাইবার সময় নলির খোঁজ করিলাম—বালা আসিয়া বলিল "দিদির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে তাই দিদি কাঁদছে,দিদি আসবে না।" শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না—নলির চক্ষে জল পড়িতেছে হায় কেন!—গিয়া দেখিলাম নলি কাঁদিতেছে—জয়ন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বুঝাইতেছে "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি আছে—পুতুলের জন্য এত কান্না! তোমার অত পুতুল আছে একটা গেলই বা, অমনি পুতুল আবার হবে।"

কিন্তু নলির চক্ষের জল থামে না। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছে, তাই কাঁদছিস্ নলি?" সে মুখ ফুলাইয়া কহিল 'হুঁ'। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রিজাগরণে কাতরা নলি ঘুমাইয়া পড়িল। উৎসব-কোলাহলান্তে বাটী নিস্তব্ধ হইয়াছে—সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

আমারও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে- কিন্তু আর বিশ্রাম নাই।

নলির পুতুলের বিবাহ দিয়াছে, বলিতেছে, মিছামিছি মেয়ে— বলিতেছে মিছামিছি বিবাহ দিলাম। কিন্তু কাঁদিতেছে সত্য। কিন্তু সত্য কোথায়? ওই যে আমরা মানুষ বলিয়া নিজেরা অহঙ্কার করিয়া থাকি আমাদের মানুষত্ব কোথায়? নলির পুতুলকে লইয়া যেমন খেলিয়া নাড়েচাড়ে, যথা-ইচ্ছা তাহার প্রতি অত্যাচার করে, তেমনি আমরাও কি এক আমাদের অজ্ঞাতসারে কাহারও পুতুলখেলামাত্র নহি? সেই কন্যা কি তাঁহারই ইচ্ছামত আমাদের পরিচালিত করিতেছেন না? নলিও কি একটা বস্তু নয়? কে নলিকে হারাও, সে কাঁদায়? মা, কে তুমি এই অনন্তকাল ধরিয়া এই সকল পুত্তলিকা লইয়া অনন্ত খেলা খেলিতেছ—কবে তোর খেলাকাল ফুরাইবে, কবে তোর এ খেলা সাঙ্গ হইবে! ভাল, এই আমরা যে তোর পুতুল, আমাদের জন্যে কি কখনো তোর প্রাণ কাঁদে? নলির পুতুল ভাঙিলে নলি কাঁদে, নলির মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল, নলি কাঁদিতেছে। কিন্তু তোর যে প্রতিদিন শত শত পুতুল ভাঙিয়া যাইতেছে তাহাতে কি তোর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়ে? যখন তুই তোর শত শত পুত্তলিকাকে পুত্রশোকে কাতরা করিয়া কাঁদাইয়া আকুল করিয়া তুলিস তখন যে খেলায় তোর কি সুখ হয় একবার আমায় বল্ দেখি। তোকে জানি না, তোকে ত দেখিতে পাই না—কিন্তু তোর খেলা দেখিতে পাই। কোথায় তুই কি সুখে থাকিস্ তাই এই নিদারুণ খেলা খেলিস্ একবার আমায় বল্। না গো না, বলিতে হইবে না, তোর খেলা দেখিয়াই বুঝিতেছি। না গো, দেখিয়া বুঝিতেছি এও কথাটি বলিস্ এই আশা পুতুলটি

নিয়ে আর খেলিসনে—এই প্রেমহীন রাজমাহীন জীর্ণ শীর্ণ পুতুল-টাকে ফেলে দে—ভাঙ্গাপুতুল আর জেদ্ধেজেদ্ধে খেলা করিসনে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

মধ্য আসিয়ায় রুষ।

কিছু দিন হইল সংবাদ আসিয়াছে রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল্ বেন্থসামন্ত লইয়া অক্ষসভীর হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে আফগানিস্থানের আমীর ভীত হইয়াছেন, ইংরাজও নিশ্চিন্ত নহেন। এইসময়ে মধ্য আসিয়ায় রুষের গতিবিধি সম্বন্ধে দুই এক কথা বোধ হয় পাঠকদের অপ্রীতিকর হইবে না।

রুষ মধ্য আসিয়ায় রাজ্যবিস্তারণ ও সৈন্যসঞ্চালনে এত ব্যস্ত কেন? উদ্দেশ্য কি? রুষ নিজে বলেন, বাণিজ্যস্থাপন এবং অনধিকৃত স্থানসমূহের আবিষ্কার ব্যতীত আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌দিগের মধ্যে দুইদল লক্ষিত হয়। একশ্রেণীর ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাস যে রুষের ভারত আক্রমণে কোন অভিপ্রায় নাই; আর একশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ রুষের অর্থাভাব, আমীরের পরিত ইংরাজের বন্ধুত্ব এবং ভারতবাসীর অকপট রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর এক শ্রেণী রুষকে একান্ত ভীত। সময়ে অসময়ে ইঁহারা কৈশপুরুষিত গল্পের বাঘের মত "ঐ রুষ, ঐ রুষ" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এই

ওলেনবরার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সমভাবে সমস্বরে আপনাদের ভীতিগ্রস্ত মনের পরিচয় দিতেছেন। বলা বাহুল্য ভারতে এই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞের প্রাধান্য কিছু বেশী। এই শ্রেণী অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছেন—নিষ্ফল আফগান যুদ্ধের মূল ইঁহারাই; ভারতে সৈন্যবৃদ্ধি ইঁহাদেরই জন্য; ইঁহাদেরই উত্তেজনায় আজিও গবর্মেণ্টকে উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অনাবশ্যক দুর্গাদি নির্ম্মাণার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। ইঁহাদের উৎপাত না থাকিলে আজ বাটার দায়ে গবর্মেণ্টকে এতটা বিব্রত হইতে হইত না।

গত জুলাইমাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরিতে আরমিনিয়স্ ভ্যামবরি সাহেব মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যে তিন শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্‌দিগের কথা বলিয়াছি, প্রবন্ধলেখককে ঠিক তাহার কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাঁহাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধলেখক রুষের বাক্যে আদবেই বিশ্বাস করেন না; বরং ১৮৮৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মধ্য আসিয়ায় রুষের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, ভারত আক্রমণ ব্যতীত রুষের আর দ্বিতীয় অভিপ্রায় নাই। ১৮৮৭ সালে সীমা-কমিশন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে রুষসম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কোন ক্রমেই রাজ্যের সীমারেখা অতিক্রম করিবেন না। ভ্যামবরি সাহেব বলেন যে যদিও সম্রাট স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই, তথাপি জেনারেল কোমারফের পরিবর্ত্তে জেনারল কুরোপাতকিন্‌কে ট্রেনস্‌কাস্পিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের

উপায় করিয়া দিয়াছেন। নূতন শাসনকর্ত্তা কুরোপাতকিন্ ইংরাজের চিরশত্রু। ইনি ১৮৭৬ সালে কাশ্গরে আসিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। খুলিখাতুন হইতে আক্সু পর্য্যন্ত যে সীমারেখা আছে, ইনি সেই সীমারেখা অতিক্রম করিয়া কর্ত্তাধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছেন। খোরাসন প্রদেশ হইতে ভারত আক্রমণের সুবিধা হয়, এই জন্য কুরোপাতকিন্ রুষসীমার নিকটস্থিত পারস্যপ্রদেশসমূহ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আফগানদিগের মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিবার ইচ্ছা ইঁহার হৃদয়ে বলবতী।

পাঠক দেখিবেন, ভ্যামবরি সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, রুষসম্রাট প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কোন কার্য্য আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। কুরোপাতকিনের মনে যাহাই থাকুক রুষসম্রাটের অসম্মতিমতে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। কুরোপাতকিন্ কার্য্যতঃ আমীরের বা পারস্যসম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করিলে অবশ্যই তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতেন। সার পিটর ল্যামস্‌ডান প্রমুখ সীমা-কমিশনের নির্দ্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিবার চেষ্টা দেখিয়া ইংরাজও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না।

ভ্যামবরি সাহেব বলিতেছেন, রুষ কেবল উত্তরদিক হইতে ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন এমন নহে, পূর্ব্বদিক হইতে রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল গ্রানফ্ এইরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। পামীর হইতে গিল্‌গিট হইয়া কাশ্মীরে পৌঁছিবার এক সহজ পথ আবিষ্কার জন্য ইনি বড়ই ব্যস্ত। পামীরে ইংরাজের অবস্থিতি ইঁহার সহ্য হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডে গেলে ইয়ংহস্‌ব্যাণ্ড ও ডেভিডসনকে পামীর হইতে বাহি-

ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণেল য়ানফ্ সৈন্যসামন্ত লইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধ লিখিবার সময় সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হয় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিতেন। সম্প্রতি কিন্তু সংবাদ আসিয়াছে রুষসম্রাট কর্ণেল য়ানফের এই হঠকারিতার জন্য বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। রুষসম্রাট তারযোগে কর্ণেল য়ানফ্‌কে ভৎর্সনা করিয়াছেন এবং শান্তিভঙ্গের কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইংরাজ যে রুষের বন্ধু, সম্রাট য়ানফ্‌কে এই কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এই নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়া সম্রাট যে আপনার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন ভ্যামবরি সাহেবকেও বোধ হয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এই সময়ে আমীরের সহিত ইংরাজের সদ্ভাব বজায় রাখা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করেন। বর্ত্তমান আমীর আব্‌দুর রহমন্ ইংরাজের নিকট বিশেষ উপকৃত এবং তিনি ইংরাজের বিশেষ বন্ধু বলিয়াও পরিচিত। ভ্যামবরি সাহেবের আমীরের উপর তাদৃশ বিশ্বাস নাই; আমীর যে ইংরাজের আন্তরিক বন্ধু একথা তিনি স্বীকার করেন না। ভ্যামবরি সাহেব যে ভারত গবর্মেণ্টের আফগান-নীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন, সেই ভারত গবর্মেণ্টের আমীরের উপর কতকটা বিশ্বাস আছে বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাসের অভাব হইলে ভারত গবর্মেণ্ট আমীরকে সন্তুষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেন না। আমীরের বন্ধুত্ব বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় আমীরের স্বরাজ্য শাসননীতির উপর কোন্ প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।

মহামতি গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞদিগের এই মত। ভ্যাম্বরি সাহেবের উপদেশ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত।

গত বৎসর ধরিয়া ভারত গবর্মেণ্ট উত্তরপশ্চিম সীমা রক্ষার্থে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, ভ্যাম্বরি সাহেব সেই সকল কার্য্যের কেবলমাত্র সুখ্যাতি করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তিনি ইংরাজকে ইংরাজ রাজ্যের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রুষ যেমন পশ্চিমে পারস্য-প্রত্যন্তভুক্ত খোরাসন বা তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দখল করিবার অভিপ্রায়ে রহিয়াছেন, ইংরাজ তেমনি পারস্যপ্রদেশস্থ সিস্তান দখল করুন। সিস্তান ইংরাজের হস্তগত হইলে রুষ কোন ক্রমেই খোরাসন হইতে ভারতসীমায় আসিতে পারিবেন না। রুষ পামীর দখল করিয়াছেন; গিলগিটের মধ্য দিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করা রুষের অন্য এক উদ্দেশ্য। ভ্যাম্বরি সাহেব বলেন, কাশ্মীরের উত্তরস্থ হানজা ও নাগর প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিলেই রুষের এ পথও বন্ধ হইবে।

ভ্যাম্বরি সাহেব রুষ সৈন্যাধ্যক্ষ কুরোপাট্‌কিনকে রুষ সীমারেখা অতিক্রমের চেষ্টা করিবার অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া ইংরাজকে ঠিক সেই অপরাধ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস ইংরাজ যতদিন ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ততদিন ভ্যাম্বরি সাহেবের এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে না।

প্রবন্ধের উপসংহারে ভ্যাম্বরি সাহেব ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে রুষের ভারতগ্রাসের আশা একান্ত দুরাশা। আমরা ভ্যাম্বরি সাহেবের এই কথার

সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। দুঃখের বিষয় আমাদের রাজপুরুষগণ ভারতবাসীর রাজভক্তির উপর তেমন বিশ্বাস করেন না—নহিলে অস্ত্র-আইনের আবশ্যক কি এবং বাঙ্গালীকে ভলণ্টিয়ার করিতে এত অনিচ্ছা কেন?

কি রূপে গল্প তৈরি হয়।

"মনথ্‌লি প্যাকেট্" নামক বিলাতী মাসিক পত্রের জুলাই সংখ্যায় "কিরূপে গল্প তৈরি হয়" এই নামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১৫ জন খ্যাতনামা উপন্যাস-লেখকের মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান, তাঁহারা সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই উত্তরগুলিই ঐ প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন;—"গল্পের বীজাণু অথবা গল্পের মূল-বীজটি কি? কোন গল্প যখন লেখা হয়, তখন সেই গল্প ছবির আকারে, না অবস্থার আকারে, না সমস্যার আকারে, না অন্য কোন আকারে মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয়?"

ইহার উত্তরে ৫জন উপন্যাস-লেখক বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সংকটাবস্থায় পতিত একটি কিম্বা কতকগুলি কাল্পনিক নায়ক তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রথমে উদয় হয়—এই সংকট-সমস্যাটি কিরূপে পূরণ করা যাইবে প্রসঙ্গক্রমে আপনা-আপনিই তাহার উপায় মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর চার পাঁচ জন উপন্যাস-লেখক বলেন, প্রথমে একটি সমস্যা তাঁহাদের মনে উদয় হয় এবং এই সমস্যা হইতে প্রসঙ্গক্রমে পরে বিবিধ চরিত্র-নায়ক তাঁহাদের মনে

করেন। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, এই কাল্পনিক ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র, অথবা কোন সমস্যা বিশেষ, তাহাদের কোনও কথা শুনিয়া, বা কাহারও মুখ দেখিয়া, কোন কবিতা বা প্রবচন পাঠ করিয়া মনে স্বতঃ উদয় হয়। তিনজন স্পষ্টরূপে উক্ত করেন যে, কোন বাস্তবিক স্থান-বিশেষ বা দৃশ্য-বিশেষ দেখিয়া গল্পের বিষয় তাঁহাদের মনে আপনা-আপনি উদয় হয়। একজন বলেন, হঠাৎ কোন কল্পিত দৃশ্য মনোমধ্যে উদয় হয়—কেন উদয় হইল তাহার কোন কারণ আপাততঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হয়তো কিছু কাল পরে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন;—"গল্পের আরম্ভটা আপনা আপনি সহজে যোগায়, না চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়?"

প্রায় সব জনই উত্তরে বলিয়াছেন—"হাঁ"। এই উত্তর হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে কখন বা চেষ্টা করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, কখন বা আরম্ভটা সহজে আপনা হইতে আইসে।

তৃতীয় প্রশ্ন;—"গল্পটি লিখিবার আগে মনে মনে সমস্তটাই কি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়—না, লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ উহা বিকশিত হইয়া উঠে?" চারিজন বলিয়াছেন, সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া মনে মনে ঠিক করিয়া লওয়া হয়—কিন্তু আর কয়েক জন বিভিন্নরূপ উত্তর দিয়াছেন। একজন লেখক বলেন, গল্পের কল্পিত নায়ক-নায়িকাই গল্পটি পূরণ করে। কখন কখন কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত দৃশ্য তাহাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, কখন বা সমস্ত গল্পটাই আগাগোড়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করা হয়। আর একজন লেখক বলেন, ত্রিভাষী অঙ্কের ন্যায় সমস্ত গল্পটি আপনি পূরণ হইয়া আইসে। গল্পের প্রধান নায়ক-নায়িকা এবং গল্পের সাধারণ ও পরিণাম যদি পূর্ব্ব হইতে স্থির থাকে, তাহা

হইলে অন্তর্বর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও উপনায়কগুলির চরিত্র আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ প্রশ্ন;—"যে রচনা চেষ্টা করিয়া করিতে হয় এবং যে রচনা আপনা-আপনি সহজে হয় এই উভয়ের মধ্যে রচনার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন্ প্রভেদ উপলব্ধি হয় কি না?"—এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে অনিচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া গল্প লিখিতে বসিলে তেমন সুবিধা হয় না।

"গল্পের চরিত্র বর্ণনা দেখিয়া লেখকের চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় কি না?" এই প্রশ্নের উত্তরে একজন এইরূপ বলিয়াছেন;—যে চরিত্র হৃদয়ের সহিত অঙ্কিত করা হয়, যে চরিত্রে লেখকের মমতা প্রকাশ পায় সে চরিত্র লেখকের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

"বাস্তবিক লোক-সমাজ হইতে তাঁহাদের গল্পের নায়ক সকল গৃহীত হয় কি না?" অনেকেই এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেন নাই—একটু রঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন। একজন এই বলিয়াছেন যে, বাস্তব ঘটনারাশি হইতে কোন নায়ক নির্ব্বাচন করিয়া কল্পিত ঘটনার মধ্যে যদি তাহাকে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই পাত্রের চরিত্র তেমন স্বাভাবিক হয় না।

যাহা হউক, ১৫ জন উপন্যাস-লেখকের উত্তর হইতে এইটুকু সারসংগ্রহ করা যাইতে পারে যে, গল্প লিখিবার দুইটি প্রধান উপাদান—প্রথমতঃ—বিবিধ কল্পিত চিত্র মনোমধ্যে সহজে উদয় হয় এরূপ কল্পনা-শক্তি লেখকের থাকা চাই—দ্বিতীয়তঃ সেই কল্পিত চিত্রগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া বেশ পরিপাটিরূপে কারিগুরি সহকারে প্রকাশ করিবার শক্তি থাকা চাই।

বুদ্ধচরিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কপিলবস্তুর স্থান নির্ণয় এবং শাক্যবংশাবলী।

কপিলবস্তু অনেককাল হইল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন কেবল ভূমি খনন করিলে পাওয়া যায়। চীন দেশের পর্য্যটকেরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁহারা এই নগরের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। তাহার পর সহস্রাধিক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন সেইস্থানে পূর্ব্বকালের শাক্যমহিমার একটি চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কার্লাইল সাহেব ফাইজাবাদ হইতে যাত্রা করিতে করিতে হঠাৎ কপিলবস্তুর পূর্ব্বস্থান আবিষ্কার করিলেন। তৎসম্বন্ধে তিনি যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে একটি অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। উক্ত নগর যে স্থানে স্থাপিত ছিল তাহাকে এখন ভুইলা গ্রাম বলে। ভুইলা একটি হ্রদের উপর স্থিত, তাহাকে ভুইলাতাল বলে। উহার অনতিদূরে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে এখনও দেখা যায়। বুদ্ধের সময়ে তাহাকে রোহিণী নদী বলিত। ভুইলার চতুর্দ্দিকে খনন করিতে করিতে চীন-পর্য্যটক হিউন সাঙ যে সকল স্তূপ, বিহার এবং অট্টালিকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তৎসমূহের ভগ্নাবশেষ ঠিক সেই সেই স্থানে লক্ষিত হয়। এই ভুইলা অর্থাৎ কপিলবস্তু ফাইজাবাদ অর্থাৎ অযোধ্যার ১২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে, বস্তি হইতে ৭।০ ক্রোশ উত্তর এবং কাশী হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তরে। ইহা উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলের বস্তিবিভাগের মনজুরনগর পরগণার মধ্যে স্থিত। কুশিনগর হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত যতটা বিস্তৃত দেশ দেখিতে পাওয়া যাইত শাক্যজাতি দ্বারা তখন তাহা পূর্ণ ছিল। শাক্যেরা অনেক কাল ধরিয়া এদেশের ক্ষত্রিয়জাতি ছিল। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে মগধরাজ নন্দ পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের তেজ এবং বীর্য্য হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং যখন ক্ষত্রিয়েরা পরাস্ত হয় তখন দেশ রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় শাক্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরে শাক্যজাতিও হীনপ্রভ হয়। খ্রীঃ অব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া "শকারি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর রাজপুতজাতিরা ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতে গণ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রেরা নিকৃষ্ট কার্য্য, বৈশ্যেরা কৃষিকার্য্য এবং ব্যবসা, ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা করে। কিন্তু ইহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকিলে দেশকে শত্রুর হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে! সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির প্রয়োজন হইল, এবং যখন ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংশ হইল তখনও কোন প্রকারের ক্ষত্রিয়জাতির আবশ্যক রহিল। যুদ্ধের পর শাক্যেরা সেই ক্ষত্রিয়জাতির পদ অধিকার করিয়াছিল, এবং শাক্যেরা পরাস্ত হইলে তাহাদিগের স্থানে রাজপুতেরা আসিয়া বসিল। পূর্ব্বকার ক্ষত্রিয়জাতি যে আর ভারতে নাই তাহার অতি অল্পমাত্র সন্দেহ আছে।

শাক্যেরা অনেককাল ধরিয়া কপিলবস্তুতে রাজত্ব করিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকদিগের বিবেচনায় দুইলক্ষ রাজা ক্রমান্বয়ে

সেই দেশের সিংহাসনে বসিয়াছিল। ইহা যে অত্যুক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। কালক্রমে অবশেষে জয়দেব নামে একজন রাজা হইলেন। জয়দেবের পুত্র সিংহহনু। তাঁহার পঞ্চদশ সিংহের ন্যায় হনু বলিয়া তাঁহার সিংহহনু নাম হইয়াছিল। এই রাজার চারিপুত্র এবং চারি কন্যা ছিল।* পুত্রদিগের নাম শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন এবং অমৃতোদন, এবং কন্যাদিগের নাম, শুক্লা, শুক্লা, দ্রোণা এবং অমৃতা। তন্মধ্যে শুক্লোদনের দুইপুত্র আয়ুষ্মৎ জিত এবং শাক্যরাজ ভদ্রক; দ্রোণোদনের দুইপুত্র যশোমান এবং আয়ুষ্মৎ অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের দুই পুত্র আনন্দ এবং দেবদত্ত। এতদ্ব্যতীত শুক্লার পুত্র সুপ্রবুদ্ধ, শুক্লার পুত্র মাণব, দ্রোণার পুত্র সুলভ এবং অমৃতার পুত্র কল্যাণবর্দ্ধন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অম্বরাজার চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা কপিলবস্তু স্থাপন করিয়াছিলেন। কন্যাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়া বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি বৃক্ষতলায় বুভুক্ষিত থাকিতেন। একদিন রাজদর্শনে ভীতা হইয়া চীৎকারস্বরে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠিক সেইসময় কাশীর অধিপতি রাজা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বনমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি অম্বরাজার দুহিতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। অবশেষে উভয়ে কোন বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিলে তাঁহাদিগের ব্যাধি দূর হইল। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কাশীতে প্রত্যাগমন করিলেন না। কোশী বলিয়া একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়া তাঁহারা তথায় সুখে রাজত্ব করিতে লাগি-

* কেহ কেহ বলেন পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।

গেল। ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী ভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া এই নগরকে লোকে ব্যাঘ্রপুর বলিয়াও ডাকিত। কিছুদিন পরে কপিলবস্তুর রাজারা জানিতে পারিলেন যে কোলিনগরের রাণী তাঁহাদিগের ভগ্নী। শাক্যেরা অন্য বংশে বিবাহ করিলে পাছে তাঁহাদিগের কোন কলঙ্ক আসে এই আশঙ্কায় তাঁহারা আপনাদিগের বংশের ভিতর বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে কপিলবস্তুর রাজবংশের কেবল ব্যাঘ্রপুরের রাজবংশের সহিত বিবাহ চলিতে লাগিল। তাঁহারা অন্য কোন বংশে পাত্র কিম্বা পাত্রী সমর্পণ করিত না।

ব্যাঘ্রপুর এখনকার রুহ্মানা নদীর তটে স্থিত। রুহ্মানা এবং রোহিণী একত্র হইয়া এখনকার ঘাঘরা নদীতে মিলিত হইয়াছে। কপিলবস্তু হইতে ৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে ব্যাঘ্রপুর। ব্যাঘ্রপুরে বরাহ অধিক হইয়াছিল বলিয়া এই নগর বরাহক্ষেত্র বলিয়াও বিখ্যাত আছে।

সিংহহনুর ভগ্নী ব্যাঘ্রপুরের রাজা অঞ্জনশাক্যের সহিত বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম শুদ্ধোদন এবং শুক্লোদন, দুই কন্যার নাম মহানামা এবং মহাপ্রজাপতি। সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন ক্রমান্বয়ে এই দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। মহাপ্রজাপতির গর্ভে নন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং মহামায়াদেবীর পুত্র প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদেশ সম্বন্ধের অবতারণা।

বুদ্ধের জন্ম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তৎকালীন দেশবিদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা একবার আলোচনা করা উচিত।

কেননা মহাপুরুষেরা যখন তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। কোন বিশেষ অভাব হইলে কিম্বা পৃথিবী ঘোর পাপভারে আক্রান্ত হইলে সেই ভার মোচন করিবার জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য কোন ধর্মসংস্থাপকের জীবন বর্ণনা করিতে গেলে তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, দেশের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল এবং লোকদিগের আচার ব্যবহার কি রকম ছিল, এ সকল বিষয় আমাদিগের জানা উচিত।

ভারতের কোন ইতিহাস নাই। সুতরাং এই সকল বিষয়ের পরিষ্কার বন্দোবস্ত কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বৌদ্ধদিগের ধর্মসাহিত্য সুপ্রচুর আছে। তাহা এক মন্থন করিলে যতবার তাহাতে মগ্ন হই না কেন, কোন-না-কোন রত্নমূল্য রত্ন পাইবই পাইব। এইরূপে পরিশ্রম করিয়া, বহু আয়াসে, বুদ্ধের সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ আহরণ করা যায়।

বুদ্ধের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ অভ্রান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। এ বিষয়ে সিংহলে এক মত, তিব্বতে অন্যরূপ মত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে আর এক মত এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মত। তন্মধ্যে সিংহলদেশের মতটা অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপীয়দিগের মতই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের একটি দোষ আছে। এবং সেই দোষে তাঁহাদিগের সমুদয় গণনা দূষিত বলিয়া বোধ হয়। সে দোষটি এই যে তাঁহারা বিধিমতে ভারতের ঘটনাগুলিকে খ্রীঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কিম্বা যথেষ্ট পরে ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। যাহাতে অদেশের প্রাচীনত্বের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় ইহাই

তাহাদিগের চেষ্টা; সেই জন্য তাঁহাদিগের গণনাগুলি আমাদিগের অবলম্বন করিতে হইলেও আমরা সে সমুদয়ে একেবারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চৌদ্দটি তারিখ বৌদ্ধ পুস্তক মধ্যে পাওয়া যায়। যথা, খ্রীঃ অব্দের ২৪২২, ২১৪৮, ২১০৫, ২১০৯, ১৩১০, ৭৫২, ৬৫৩, ৫৪৩, ৮৮০, ৮৩৭, ৫৭৬, ৮৮৪, ১০৬০, ৮৮২ বৎসর পূর্ব্বে। ইহাদিগের মধ্যে অতিশয় পূর্ব্বতম তারিখগুলি আমরা নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করিতে পারি। খ্রীঃ অব্দের ছয় শত কিম্বা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তারিখ কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে আপাততঃ কোন দোষ নাই। সিংহলদেশের গণনা অনুসারে বুদ্ধের নির্ব্বাণ খ্রীঃ পূর্ব্ব অব্দ ৫৪৩ বৎসরে হয়। বুদ্ধ ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। সুতরাং এই মতে তিনি ৬২৩ পূর্ব্ব খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক প্রকার স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১। একেশ্বরবাদী ইহুদিরা নানা পাপে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সকল বিষয়ে তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদবস্থায় ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের দেবনগর জেরুসালেমকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারা বন্দী হইয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করে। সেই পর্য্যন্ত ইহুদিরা আর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। এক রাজার হস্ত হইতে আর এক রাজার হস্তে পড়িয়া পরাধীন অবস্থাতে দিনপাত করিতে হইয়াছে। পারসীক, গ্রীক এবং রোমকরাজারা আসিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে

হয়, এবং অবশেষে রোমকরাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে দেশচ্যুত হইয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতে হয়; আজপর্য্যন্ত তাহাদিগের স্বদেশ বলিয়া একটি স্থান নাই। যে ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া ঈশার জন্ম এবং মৃত্যু হয় এবং যে যে কারণে ঈশার ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম হইতে পারিয়াছিল, সেই ঘটনা সকলের সূত্রপাত বুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিম্বা পরে হইয়াছিল।

২। পারস্যদেশের ধর্ম্মসংস্কারক জোরোয়াস্তার এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবে ইরাণ আবার পুনর্জ্জীবিত হয় এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আমরা আজও বোম্বাই প্রদেশস্থ পারসীদিগের মধ্যে দেখিতে পাই।

৩। চীনদেশে মহাজ্ঞানী কনফ্যুসিয়াস্ এই সময়ে লোকদিগকে নূতন ধর্ম্ম এবং নূতন শাসনপ্রণালী প্রদান করেন।

এই ঘটনাগুলি সামান্য ঘটনা নহে। আমরা দেখিতেছি যে খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর পক্ষে এক প্রকার নবযুগ হইয়াছিল। কেবল ভারতে নহে, সকল দেশে নবজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। মনুষ্যসমাজের নিয়মই এইরূপ। কখন নিদ্রাবস্থা, কখন জাগ্রত ভাব। ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া যখন নূতন সত্যসূর্য্য প্রকাশিত হয় তখনই পৃথিবীতে নব তত্ত্ব, নব শাস্ত্র, নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখনই মানুষ মানুষকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিতে পারে, তখনই পরমেশ্বরের মুখ মানুষ প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায় এবং তখনই পৃথিবীর নূতন শ্রী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্বদেশের অবস্থা।

বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিয়া দেখি যে এখানেও নবজীবনের আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত। সে সময়কার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে তখন বৈদিক ধর্ম্মের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল। পৌরাণিক ধর্ম্ম আসিতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু পুরাণের দেবদেবীদিগের তখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। লোকেরা ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবের পূজা করিত। কিন্তু দুর্গা, কালী, কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী তখনও লোকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কৃষ্ণপূজার আরম্ভ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজার তখন সৃষ্টি হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা তখনও ভারতের গগনে উদয় হয় নাই। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক আচারব্যবহার তখন পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঋষিমুনিরা বনের মধ্যে, পর্ব্বতের মধ্যে তপস্যা করিতেন। তন্মধ্যে এক একজন অসাধারণ ধীসম্পন্ন যোগী অগণ্য শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া দেশেদেশে ভ্রমণ করিতেন। সাধনের কঠোর নিয়ম সকলই বর্ত্তমান ছিল। যাগ, যজ্ঞ, নিত্যনৈমিত্তিক বেদের মতে সম্পাদিত হইত। তবে পূর্ব্বের মত রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন এমন কোন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন না যিনি অন্য রাজাদিগকে অধীনস্থ করিতে সাহস করিতেন। তখনকার ধর্ম্ম কার্য্যকলাপেই বদ্ধ ছিল। নীতিসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্ম তখন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূজা করিলে, মন্ত্র পাঠ

করিলে, অনাহারে যাগযজ্ঞ করিলে মুক্তি হয় এই বিশ্বাস সকলেরই ছিল। কিন্তু মন ভাল করা উচিত, পাপ থাকিলে মুক্তি হয় না, পুণ্যই স্বর্গের সোপান এ প্রকার মত তখন প্রচার হয় নাই।

ভারতে মূর্ত্তিপূজা কখন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে বুদ্ধের সময় দেবদেবীগণের প্রতিমূর্ত্তি-পূজা হইত ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাই। এদেশে বিশুদ্ধ একেশ্বরতত্ত্ব (Theism) কখন প্রচলিত ছিল কিনা বলিতে পারি না। তবে পূর্ণব্রহ্ম লইয়া অনেক চর্চ্চা হইত এবং পণ্ডিতেরা ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মসাধন লইয়া অনেক বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মূর্খদিগের অনেক কাল হইতে বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব পণ্ডিতদিগের জন্য ছিল এবং দেশীয় ধর্ম্ম, লৌকিক আচার সকল সামান্য লোকদিগের জন্য হইল। প্রতিমূর্ত্তিপূজার সৃষ্টি এই কারণেই হয়। শাক্যমুনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তৈত্তিরীয় ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের পর বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। এদিকে যেমন উপনিষদ সকল ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া নিযুক্ত ছিল, আর এক দিকে দর্শনশাস্ত্র সকল জগতের উৎপত্তি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ, জড়বাদ ও প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বেই যোগ, মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায় এবং সাংখ্য দর্শন সকল রচিত হইয়াছিল। সুতরাং যখন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নই এক প্রকার উত্থাপিত হইয়াছিল। দর্শনসম্বন্ধে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন সেই সময়েই উত্থাপিত হয় এবং তাহাদিগের মীমাংসা সেই সময়েই হয়।

তাহার পর আজপর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে একটি নূতন কথা কেহ বলিতে পারেন নাই এবং দার্শনিক উন্নতি এক পদ মাত্র অগ্রসর হয় নাই। সেই তখন যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর টীকা, ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রভৃতি ব্যতীত আর অন্য কোন কথা নাই। গ্রীসদেশে আরিষ্টটল্ এবং প্লেটো দর্শনসম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার পর যেমন আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে কেহ একটি নূতন কথা বলিতে পারেন নাই, ভারতে কপিল, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার উপর একটি নূতন কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। বুদ্ধও তাঁহার ধর্ম্মদর্শন সম্বন্ধে একটি নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে পারেন নাই। পুনর্জ্জন্ম এবং কর্ম্মফলতত্ত্ব এ দুইটি ভারতের নূতন কথা। এ দুইটি কথাই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সার্কিলনিয়স সত্য বলিয়াই তিনি দেবদেবী, জাতিভেদ, স্বর্গ নরক প্রভৃতি ব্যাপার মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের এ সকল কথা কিছুই নূতন নহে। ইহাতে নূতন কি ছিল তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। তবে এখন এইমাত্র বক্তব্য যে বুদ্ধকে দর্শনসম্বন্ধে নূতন মত কিছুই সৃষ্টি করিতে হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে বিশ্বের মূলতত্ত্বগুলি দর্শনসমূহে আলোচিত হইয়া গিয়াছিল। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি-পূজা সম্পূর্ণরূপ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে মহাভারতও রচিত হইয়া গিয়াছে, যেহেতু মহাভারতের দু' একটি শ্লোক আমরা ললিতবিস্তরে উদ্ধৃত দেখিতে পাই।

বুদ্ধের সময় ভারতে কোন বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল না। সমস্ত দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। একটি নগর—কতিপয় গ্রাম লইয়া একজন রাজার রাজত্ব ছিল। যুধিষ্ঠিরের পর আর

কোন দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে একছত্রের অধীন করিতে পারিলাছিলেন তাহা বোধ হয় না। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় আর্য্যাবর্ত্তই সিদ্ধমান ছিল। তখন পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, কোশল এবং বিদেহ রাজ্য বর্ত্তমান ছিল এবং এতদ্ব্যতীত বৈশালি মথুরা এবং মিথিলা দেশে বহু পুরাতন রাজবংশ সকল জীবিত ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের তখন পর্য্যন্ত পূর্ণ আধিপত্য ছিল। পুরাতন আর্য্যদেশ, অর্থাৎ মানারণ এবং মহাভারতের আর্য্যদেশ তখন সশরীরে বর্ত্তমান। বুদ্ধের পর নূতন সময় আসিয়া পুরা সেকে বিনাশ করিল। কিন্তু তাঁহার জন্মকালে এদেশের লোকেরা সেই পুরাতন বায়ু সেবন করিতেছিল। সেই ধূপধুনার গন্ধ, সেই মন্ত্রপাঠের আড়ম্বর সেই পর্ব্ব সকলের প্রাদুর্ভাব বুদ্ধ আসিয়া সমস্তই দেখিলেন। তাঁহার সময়ে দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। কিন্তু তাঁহার পরে একেবারে কি পরিবর্ত্তন হইল!

আর সে পাণ্ডবেরা রহিল না। পুরাতন রাজবংশ সকল লুপ্ত হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে শূদ্রেরা রাজত্ব করিতে লাগিল। মদ্যপানপ্রথা পূর্ব্বে অতিশয় প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বন্ধ হইল এবং জীবহত্যা দিয়া নিরামিষ ভোজন দেশের নূতন আচার হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হীনপ্রভ হইলে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অর্হতেরা আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসীদিগের আর তেমন আদর রহিল না, তাহাদিগের স্থান ভিক্ষু ভিক্ষুনীরা অধিকার করিল। আর পুরাতন প্রথা মতে কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহিত না—এখন নূতন ভাবে স্তূপ ও বিহার সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেবদেবীদিগের প্রতিমূর্ত্তির আর সে আদর রহিল না, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের

প্রতিমূর্ত্তি চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। নূতন প্রকারে গৃহনির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত হইল এবং নূতন ভাস্করবিদ্যা আবিষ্কৃত হইয়া দেশকে নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিল। জাতি-ভেদ প্রথা কিছু কালের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আর্য্যধর্ম্ম যেমন দেশীয় ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি মানবধর্ম্ম হইল। এদেশে কোন কালে ধর্ম্মপ্রচার প্রথা ছিল না—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকেরা দেশ বিদেশে গিয়া তাহার মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞারা বেদ উচ্চারণ না করিয়া বৌদ্ধসূত্র এবং বিনয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পুরাতন পর্ব্ব গিয়া বুদ্ধের রথযাত্রার সৃষ্টি হইল। এই রথযাত্রা এখন জগন্নাথ দেবেরই আছে। কিন্তু ইহার আরম্ভ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে হয়।

যখন মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহারা পৃথিবীকে একভাবে দেখেন, তাহার পর ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহারা সেই পৃথিবীকে নূতন বেশে সজ্জিত দেখিয়া যান। বুদ্ধদেবের জন্ম হইবার সময়ে ভারতের অবস্থা কি ছিল তাহা বর্ণিত হইল। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এমন কি শক্তি আসিল যাহার প্রভাবে ভারতকে আবার নূতন আকার ধরিতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দানে আমরা এখন নিযুক্ত হইলাম।

শিশুর আবদার।

কে চায় মলিন দুর্ব্বাদলী ?
কে চায় কুমুদ শালুকী ?
সাগর গহ্বর কনের মত
বরণ বালের বধূর মত।

কে চায় অশোক, আম্রমোড়া,
রাঙ্গা জামলোধ্রের বোড়া ?
লাল পাগ্‌ড়ি, লাল ঘোগা,
পুলিস চৌকির দারোগা !

কে চায় বদন ? যায় উড়ে
আঁচ-বাঘাটি সুদূরে !
মন ভেঙ্গে, পায় তবু
অহা দেখীন্ ভুল বাঁ ;

(আমি) চাই মালতি, বকুল-জাতি ;
চাই অতসী, রাঙ্গের ভাঁতি !
খোকার মত !
খুকির মত !

(আমি) চাই সিউলি, টুকটুকে ;
দোউড়ি দুই, দুইদুটে ;
বাদুর মত !
খোলার মত ;

পূজার ছুটি।

গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে আমার গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি নামিয়া পড়িলাম।

রাত্রি তখন আটটা। ষ্টেশনের বাহিরে আমাদের গ্রামস্থ তিনটী স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল; একজন কিশোরবয়স্ক,অপর দুইটী বালক। তাঁহারা তিন জনেই এক পরিবারভুক্ত। কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন, সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন।

আমরা চারিজনে একখানি গাড়ী ভাড়া করিব স্থির হইল। বহুত গ্রাহক, এদিকে গাড়ী কম, গাড়োয়ানদের সুতরাং পোহা-বারো। অন্য সময় তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হাতের ব্যাগ বহিয়া গাড়ীতে লইয়া যায়, আজ আর তাহাদের মাটীতে পা পড়ে না; তারা কোচবাক্সে গম্ভীরভাবে অমনি বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই, আমরা নিজের দায়ে অগত্যা মহম্মদের সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলাম। গাড়োয়ানেরা অগ্রসর হয় না দেখিয়া, আমরাই শেষ গাড়ীর কাছে হাজির হইলাম। অন্য সময় দুই টাকার মধ্যেই গাড়ী মিলে কিন্তু আজ আর কেহ পাঁচ টাকার কমে যাইতে স্বীকার হইল না। আমরা তাই স্বীকার করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম,গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—পক্ষীরাজ-দ্বয় গজেন্দ্রগতিতে ছুটিলেন। তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে একটা গভীর ঔদাস্য ও নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়, আগে বুঝি নাই এই অশ্বিনীকুমারযুগলেরও গাড়োয়ানদের মত পায়াভারি হইয়াছে। গাড়োয়ানের পায়াভারি গ্রাহক দেখিয়া, আর ইহাদের ক্ষেপ বহিয়া বহিয়া।

যাইহোক কোনরূপে আমরা রাত্রি এগারটার সময় যথাস্থানে

যাইলাম। এইবার নৌকায় যাইতে হইবে। এখান হইতে আমাদের বাড়ী সাত ক্রোশ, জলে জলপথে সিন্ধু ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সে দিন চতুর্দ্দশী। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ফুটিয়া গিয়াছে; রাত্রি কিছু অন্ধকার তবে ঘোর নহে। সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকারাজি আর অল্প কিরণ দিতেছিল। আমরা তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। অনুকূল বাতাস বহিতেছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল। সেই নিশীথরাত্রে, অনন্ত আকাশতলে, প্রশান্ত ভাগীরথীবক্ষে পালভরা নৌকা তরতর বেগে মুক্ত-পক্ষ কলহংসীর মত হেলিতে দুলিতে চলিল। আজিকে বর্ষার সে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কূলে কূলে পূর্ণ। যৌবনের সে মত্ততা গিয়াছে কিন্তু যৌবন আজিও আছে। গঙ্গার উভয় কূলের দূরস্থ গ্রামগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই ছায়া-ছায়া যেন চিত্রার্পিত। কোথাও বা অদূরে দুই একটা সৌধশ্রেণী পড়িয়া আছে; কোনটির বা মুক্ত বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝিরা সারি গাহিয়া চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষ ভাগ বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। আর আমার মনে যে সঙ্গীত বাজিতেছিল, তা আরও মধুর!—ক্রমে আমারও তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্ন যে কি-ময় এবং কে-ময় তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন প্রভাত হইয়াছিল জানি না। বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় মাঝিদের ডাকে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝিরা বলিতেছে—"বাবু ঘাটে এসেছি উঠুন।" কথাটা—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে যে বালক দুইটী ছিল তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছিল—আমরা তীরে উঠিতে না উঠিতে তারা কতদূর চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে আমাদের বাড়ী একপোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিছু ঘুরিয়া সেই বিল-পথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। আমরা ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

বালক দুইটী চলিয়া গেলে আমি সেই কিশোরটীকে বলিলাম, "কই উপেন, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলেনা?" সে কোন উত্তর দিল না, কেবল আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্যের। আমি সে ঔদাস্যের কারণ বুঝিলাম। তাহার মত বয়সে আমারও একদিন এইরূপ উদাস ভাব আসিয়াছিল। বাল্যকালে পূজা বলিয়া গৃহ বলিয়া যে একটা দুর্দ্দমনীয় টান থাকে আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহা কমিয়া আসে। কমিতে কমিতে এই কিশোর অবস্থায় যেন একান্তই কমিয়া যায়; তখন কেমন একটা উদাস ভাবে হৃদয় ছাইয়া ফেলে—বাল্যকালের সে সকল আমোদে মন আর মাতে না, সে সব বাঁধনে তেমন টান থাকে না। যেন কি একটা অভাবে কি একটা শূন্যতায় হৃদয় সর্ব্বদা খাঁ খাঁ করিয়া বেড়ায়, পুরাতনের কিছুই আর তাহা পূর্ণ করিতে পারে না। শেষ আর এক নূতন বন্ধন হয়, সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার স্নেহময় হইয়া উঠে—শীতের পর বসন্তের উদয় হয়।

উপেনের বয়স সতের আঠার বৎসরের মধ্যে। বলা বাহুল্য সে অবিবাহিত।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া মাঝির মাথায় দিয়া আমরা দু'জনে নৌকা

হইতে উঠিলাম। তীর হইতে গ্রাম নজরে পড়িতেছিল। কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড শস্যক্ষেত্র। সেখান হইতে সেই ফুলবিশিষ্ট, বায়ুহিল্লোলদিগ্ধ শ্যামল শস্যরাশি দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল। আমরা সেই শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ ধরিয়া চলিলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। বর্ষার অবসানে অশথ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায় পাতার মাঝে মাঝে ঝিঙ্গা যৌবন উদ্ভাসিত। মাঝেমাঝে তরুকে ধরে "ঝিঙ্গাপটোলা" পরের লোহিত আভা শ্যামল পত্রের অবকাশপথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছিল। পুষ্করিণীগুলি কানায় কানায় পূর্ণ। কোনটীর বা উভয়পার্শ্বে কদলীবৃক্ষের শ্রেণী বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা নানাবর্ণের করবী, দোপাটী এবং গোলাপিক ফুটিয়া দিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাটীতে প্রবেশ করিয়াই পিতৃদেবের দর্শন মিলিল, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলাম—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পর বাটীর ভিতর গেলাম। সেখানে মা, দিদী, পিসিমা, ঠাকুরমাতা প্রভৃতি সকলে আমায় ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। একজনের যথারীতি প্রণাম করিলে পর, ভগ্নী একটী মাদুর বিছাইয়া দিলেন—আমি সেখানে বসিলাম। বালকবালিকারা সব ছুটিয়া আসিল; কেহ কোলে, কেহ পাশে বসিল। মা আহার আনিতে গেলেন, আর সকলে কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। অনেকদিনের পর, স্নেহের পুতলি ও ভক্তির প্রতিমা-ভাল দেখিয়া হৃদয় আনন্দে উছসিয়া উঠিল। কিন্তু সত্য, কথা ফুরাইল না—কথা কহিতে কহিতে মাঝেমাঝে অন্যমনস্কও হইতেছিলাম। আমার চঞ্চল চক্ষু কোন একটি নেপথ্যবর্ত্তিনীর উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আর এক একটি উৎসুক দৃষ্টি যে অদূরে

অন্তরালের ছিদ্রপথে ঘনপল্লবচ্ছায়াতলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি তাহা আমার অন্তর জানিত।

জল খাওয়ার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। পূজায় অনেকেই বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রত্যেক উপস্থিত সকলের সঙ্গেই দেখা করিলাম।

বাল্যকালের সেই বাঁধাঘাট, সেই বটগাছ সেই বকুলতলা সকলই দেখিলাম। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল—হায়, আজ সে সব দিন কোথায়! আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী, তারাই বা আজ কোথায়! কেহ দেশান্তরে, বহুকাল দেখি নাই—কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে দেখিবার আশা নাই।

দেখাসাক্ষাতে, আহারে, নিদ্রায়, গল্প গানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি নয়টার পর আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে গেলাম। আজ এ পর্য্যন্ত আমার সেই নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পাই নাই। বালিকা বা যুবতী বধূর শ্বশুর-গৃহে দিবসে স্বামী-সন্দর্শন বড় কঠিন কথা। গৃহে আসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা শুইয়া রহিলাম। পাতাটী নড়িলে, বায়ু একটু সশব্দে বহিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠি, কিন্তু বৃথা আশা। মনে হইতে লাগিল—

"জানে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে
রমণী নিদয়!"

কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া তাঁর আসিতে এ বিলম্বটুকু হইতেছে তাহা বুঝিয়াও অবুঝ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আমার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। কি কোমল স্পর্শ!

আমাদের বাটীতে পূজা হয়। আমরা সকল জ্ঞাতি মিলিয়া

...করে পূজা করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের ব্যয়বাহুল্য হয় না। বিশেষ এই পূজার জন্য পৃথক জমীর বন্দোবস্ত আছে।

আজ সপ্তমী পূজা। পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। অল্পবয়স্কা বালিকা "আদ্দা কাপড়" পরিয়া পূজা দেখিতে ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আরতি। পুরোহিত ঠাকুর যথা সময়ে পঞ্চ প্রদীপ লইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্তের সেই কৌশলময় ব্যায়াসন দেখিবার জিনিস বটে। প্রতিমার নিকটে মনোহর বাদ্যধ্বনি আনান হইতেছিল—উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া চামর ব্যজন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল নীল আলোয় চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কাঁসরঘণ্টার রবে দিক্ পূরিয়া উঠিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল সানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নরনারী ভক্তিভরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব আসিল, ভক্তিভরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরদিন অষ্টমী পূজা। অন্যবার সন্ধিপূজা গভীর রাত্রে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজার আরম্ভ হইল। আজ পূজার জম-জমাটা আরও কিছু বেশী রকমের।

নবমীর দিন লোকজন খাওয়াইতেই কাটিয়া গেল। তারপর বিজয়া দশমী; বৈকালে প্রতিমা বরণ হইল। আজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে।

আমাদের গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত। তিনখানি প্রতিমা একত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া একসঙ্গে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। গ্রামের প্রান্তেই বিল; সেই বিলে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। বিল এখনও জলে পূর্ণ, সুতরাং প্রতিমা লইয়া "নাচখেলায়" বড় সুবিধা। আমরাও নৌকাবিহারের লোভ সম-

ঘন করিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বিল, বিলের এক ধার হইতে অন্য ধার স্পষ্ট নজর হয় না। চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, মাঝে মাঝে নিমোজ্জনোন্মুখ গুল্মবৃক্ষাদির শাখা জাগিয়াছে মাত্র। সেই সব শাখায় শাখায় শ্যামল পত্রের অন্তরালে বক সারস বসিয়া আছে। কোথাও বা কলহংসী, কারণ্ডব, চক্রবাকমিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছিল—সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায় উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিসর্জ্জন দিয়া—আমরা নৌকা ফিরাইলাম। কূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কৌমুদী-কিরণ-সম্পাতি জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা উপরে উঠিলাম। তখন সানায়ে পূরবী রাগিণীতে বিসর্জ্জনের গান গাহিতেছিল—সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। তার পর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ চলিতে লাগিল। শেষ, গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটুম্ব আত্মীয় সকলের বাটীতে বিজয়ার প্রণাম উদ্দেশে বাহির হইলাম। আজ আর শত্রু-মিত্র ভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া মহাশত্রুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আজ সকলের মন যেন শান্তি ও ক্ষমায় পূর্ণ।

আহারাদির পর শয়ন-গৃহে বসিয়া আছি, সহসা গৃহিণী আসিয়া টিপ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। নূতন নিয়মে, গৃহিণীকুলের নিকট আর বড় একটা প্রণাম পাওয়া যায় না, তাই প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে প্রতিদানে আমিও আমার কর্ত্তব্য সাধন করিলাম।

আজ পূর্ণিমা; রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। সুতরাংই আমি এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তুত

কিন্তু কি করি, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে ও বিজ্ঞাপন পড়িয়া গা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি আরটা পর্যন্ত থাকিয়া শেষ ল কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম। অধর-গৃহের দ্বারে আসিয়া ন নাড়িলাম; দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন। টু রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না। ঘরে গিয়া দেখি পুঁটিনী ন্তর্হিতা। বুঝিলাম, কয়েক দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া ন এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। এতক্ষণ ঠাকুর ন তাঁর কাছে ছিলেন, শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর ঘুম াঙ্গিয়াছিল; তিনি আর ইঁহার ঘুম না ভাঙ্গাইয়া দুয়ার খুলিয়া দয়াছিলেন।

মুক্ত বাতায়ন-পথে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শুভ্রজ্যোৎস্নায় সহিত মাদের গৃহ-জ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলাম।

ছুটির দিন ফুরাইল। আজ রাত্রি দশটার পর আমাকে কলিকাতা রওনা হইতে হইবে।

সমস্ত দিন কোথাও বড় একটা বাহির হইলাম না—মা, সিমা, ভগ্নী ইহাদের কাছে কাছেই রহিলাম। সন্ধ্যার পরই হার করিয়া শয়ন করিতে গেলাম।

আমি যাওয়ার একটু পরেই পুঁটিনী উপস্থিত হইলেন। সেই বপ্রফুল্ল সুখখানি বড় বিষণ্ণ।

অন্য দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন দু'চারি ঘণ্টা পূর্বে জিল। বিদায়কালীন মিলন যখন নিবিড়তম তখন কে ডাকিল,

"মাণি এসেছে।"

একে একে সকলের কাছে বিদায় লইলাম। নৌকায় উঠিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল।